হোজা নাসিরুদ্দীন

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

সেবা প্রকাশনী

হোজা নাসিরুদ্দীন

ভ্রাম্যমাণ এক দার্শনিকের
বিচিত্র অভিজ্ঞতার সরস কাহিনী

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 5019 3

প্রকাশক:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৮৭
দ্বিতীয় মুদ্রণঃ মে, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা সিরাজুল হক

মুদ্রাকর:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

HOJA NASIRUDDIN
By: A. T. M. Shamsuddin

সেবা প্রকাশনী

তেইশ টাকা

দুটি কথা

হোজা নাসিরুদ্দীনের নামে বা তাঁর নামকে জড়িয়ে প্রাচ্যের নানা দেশে—বিশেষ করে তুর্কীস্তানে, ইরান-আফগানিস্তান আর আরব দেশগুলোতে, অসংখ্য গল্প কৌতুক উপকথা ও কাহিনী ছড়িয়ে আছে। তার কিছু ছিটেফোঁটা চুটকি আমরা এ দেশেও আশৈশব শুনে আসছি।

হোজা নাসিরুদ্দীন সম্পর্কে কৌতূহলেরও অন্ত নেই। কে ছিলেন এই মানুষটি? কোথায় জন্মেছিলেন তিনি? ওই নামে সত্যি কি কেউ কোনদিন বিচরণ করেছেন প্রাচ্য দুনিয়ার পথেপ্রান্তরে, নাকি সব কিছুই কল্পনার সৃষ্টি? দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে আট জায়গায় তাঁর কবর আছে। আট কবরের কোন্‌টাতে তিনি শুয়ে আছেন? নাকি কোনটাতেই নেই? আছেন কোন সাগর তলে বা পর্বত কন্দরে? ইরান-তুরান-আরবের অনেকেই তাঁকে নিজ নিজ দেশের লোক বলে দাবি করলেও এসব প্রশ্নের নির্ভুল জবাব মিলে না কোথাও। ফলে কৌতূহল বাড়ে।

এই কৌতূহলের দ্বারা তাড়িত হয়ে রুশ প্রাচ্যবিদ ও লেখক এল. সলোভিয়ভ বহু বছর ধরে হোজা নাসিরুদ্দীন সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান এবং এই বিষয়ে একাধিক বই প্রকাশ করেন। তাঁর বহু প্রশংসিত 'দ্য ইনচান্টেড প্রিন্স'ও সেই সাধনারই একটি রসসিক্ত ফসল।

কিংবদন্তী-নির্ভর উক্ত বইটি আমার মনে এ ধারণাই সৃষ্টি করেছে যে হোজা নাসিরুদ্দীনের জন্ম, দেশ বা পরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর নির্ভুল জবাব তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওই নামের কোন লোকের জন্ম যদি কোনদিন না-ও হয়ে থাকে, তবু তিনি জাগ্রত ছিলেন মধ্য এশিয়া ও আরবের নিপীড়িত গণ-মানুষের হৃদয় জুড়ে—তাদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, ক্রোধ আর বেদনার প্রতীক হয়ে। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অতি পরিচিত পোষা দরবারী বিদূষক বা সস্তা বাজারী ভাঁড় তিনি ছিলেন না। গণ-মানুষের বুক ভরা ভালবাসা আর কল্পনা তাঁকে গড়ে তুলেছিল স্বৈরাচারী দুঃশাসন, ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুঃসাহসী অভিব্যক্তি রূপে। তাঁর প্রতিটি ব্যঙ্গ, প্রতিটি কৌতুক শানিত দামেস্ক তলোয়ারের মত আঘাত হেনেছে দুর্নীতিবাজ ও অন্যায়কারীর পাঁজরে।

হোজা নাসিরুদ্দীন আজকের যুগেও অপ্রাসঙ্গিক হননি, বিশেষত আমাদের দেশে। এই কারণে এল. সলোভিয়ভের বইটি ঈষৎ পরিবর্তিত ও সংক্ষেপিত রূপান্তর 'বিমুগ্ধ-আত্মা হোজা নাসিরুদ্দীন' বাংলাদেশের পাঠকদের সামনে সবিনয়ে পেশ করলাম। আশা করি তাঁরা অনুগ্রহ করে এটি গ্রহণ করবেন এবং সম্ভাব্য ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জনা করবেন।

বিনীত

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

সূচনা

'অতীতের জ্ঞানীরা অনেক মূল্যবান গ্রন্থ-কেতাব রেখে গেছেন যাতে তাঁদের জ্ঞানের আলোকে আমাদের জীবনের আঁকাবাঁকা বিপজ্জনক পথ উদ্ভাসিত হয়। আমরা সব কিছু জানতে পারি এসব গ্রন্থ-কেতাব থেকে। জানতে পারি যুদ্ধবিগ্রহ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, প্রাচীনকালের সপ্তাশ্চর্য, নবী-পয়গম্বর ও তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী। কত দরবেশ, খলিফা, দিগ্বিজয়ী বীর, রাজপুরুষ আর বিদ্বানের কাহিনী। কিন্তু একটি মানুষ সম্পর্কে তারা কিছুই বলে না। অথচ তখনকার যুগে সেই মানুষটির ছিল দুনিয়াজোড়া নাম—হোজা নাসিরুদ্দীন।

'অতীতের জ্ঞানীরা যে তাঁর সম্পর্কে কিছুই লেখেননি এতে আশ্চর্যের কি আছে? সত্য প্রকাশের অপরাধে জ্ঞানী গুণীদের লাঞ্ছনা তখনকার দিনে প্রায়ই ঘটত। তাই তাঁরা খুব হুঁশিয়ার ছিলেন যাতে ক্ষমতাবানদের অপ্রিয় সত্য তাঁদের লেখায় স্থান না পায়। যাতে, তাঁদের স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। যাতে নিজের কাটা মাথাটা হাতে নিয়ে তাঁদেরকে পরলোকের সেতু পার হতে না হয়।

'এই কারণে প্রাচীন পুঁথি-কেতাব হোজা নাসিরুদ্দীনের ব্যাপারে নীরব। ক্ষমতাশালীদের দাপটে তাঁর নাম চাপা থাকে নীরবতার পাথরের নিচে। রাজা-বাদশাহ, সুলতান, শাহ্‌রা আশা করেছিলেন এইভাবে তিনি অজ্ঞাত থেকে যাবে পরবর্তী কালেও। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে একটি বই বা কেতাব আছে যার ওপর তাঁদের কোন ক্ষমতাই নেই। সেই বইটি হল জনগণের স্মৃতি। হোজা নাসিরুদ্দীনের নামকে অমরত্ব দিয়েছে সেই মহাগ্রন্থ,' (সলোভিয়ভ)।

খোজেন্ত শহরের পাশে সির-দরিয়ার তীরে এক বিশাল বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ডালপালা মেলে। প্রতি বছর পানির প্রবল স্রোতের টানে তীর ক্ষয়ে ক্ষয়ে নদী এগিয়ে আসছে গাছটার কাছে। অদূরে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো ছোট ছোট শীর্ণ গাছের সারি তৃষ্ণায় কাতর। সূর্যের খরতাপে দগ্ধ বিবর্ণ পাতা কাঁপিয়ে ঈর্ষাকাতর ক্ষুদ্রচেতা মানুষের মত তাকাচ্ছে ওই বিশাল সতেজ বট গাছের দিকে। ভাবছে, 'রসো, নদীটা আরেকটু এগিয়ে আসুক। তুমি যেখানে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছ, তীরের সেই অংশটাও গ্রাস করুক। তারপর তুমি ঢলে পড়বে নদীর জলে। ভেসে যাবে

তীব্র স্রোতে। কোন চড়ায় আটকে পড়ে থাকবে। পচে-গলে নিঃশেষ হবে চরম অগৌরবে। আর আমরা? আমরা ভাগ্যক্রমে নদী থেকে দূরে আছি। আগের মতই বেঁচে থাকব। দেহ আমাদের ছোট, ছায়া প্রায় নেই, পাতা-পল্লব রোদে পোড়া, ধুলোর আস্তরণে ঢাকা, শেকড় কুঁকড়ে গেছে শুকনো কঠিন মাটির চাপে। তবু বেঁচে তো আছি এবং থাকব।'

ওরা ভ্রান্ত। বটগাছটি নদীতে পড়ে ভেসে যাবে না। নদী এগিয়ে আসলেও থেমে যাবে। ওর বলিষ্ঠ শেকড়জালে নতুন করে জমবে পলিমাটির স্তর। শেকড়গুলো আঁকড়ে ধরে রাখবে তীরের মাটি, চলে যাবে নদীর গভীর তলদেশ পর্যন্ত। তীরের ক্ষয় রোধ করবে। আগের মতই সে দাঁড়িয়ে থাকবে আকাশে অসংখ্য ডালপালা মেলে, সগৌরবে শীতল ছায়া বিস্তার করে।

আর, যদি মরেও যায় একদিন, যদি শুকিয়ে যায় ওর বল্কল, ঝরে পড়ে পত্র-পল্লব, জীবনরসের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ওর শিরা-উপশিরায়, তবুও গাছটাকে কাটবে না কেউ। কুঠারের আঘাত হানবে না ওর গায়ে। চারদিকে খুঁটি পুঁতে লোকে ঘিরে দেবে ওকে। কৌতূহলী পথিকদের জানাবে, 'এই গাছটি লাগিয়েছিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন!'

পথিক আরও জানবে, খোজেন্ত-এর উপকণ্ঠে 'রাজ্জাক' (রিজিক বা রুটি-দানকারী) নামে রুটিঅলাদের যে মহল্লাটি রয়েছে তার আরেকটি নাম আছে— হোজা নাসিরুদ্দীন মহল্লা। প্রচলিত কাহিনী মতে, ওখানে দূর অতীতের কোন এক কালে হোজা নাসিরুদ্দীন বাস করতেন।

খোজেন্তের লোকেরা পথিককে বলবে আরেকটু এগিয়ে যেতে। ওই পাহাড়গুলো পেরিয়ে আকাত-এর দিকে। সেখানে রয়েছে সেই পাহাড়ী হ্রদ, ছোট্ট গ্রাম চোরাক, হোজা নাসিরুদ্দীনের চা-খানা, চা-খানার ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে হোজা নাসিরুদ্দীনের বিখ্যাত চড়ুইদের অসংখ্য বংশধর। পথিক সেখানে একটা গুহাও দেখবেন। গুহাটির নাম—'পুণ্যবান চোরের গুহা।' অদ্ভুতই বটে নামটা!

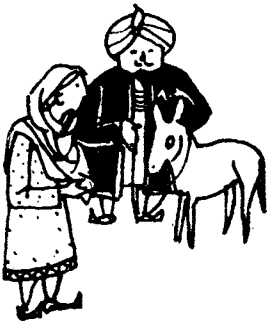

এক

দরবেশের কাহিনী

হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর স্ত্রী গুলজান বিবিকে নিয়ে বোখারা ছেড়ে প্রথমে গেলেন ইস্তাম্বুল। সেখান থেকে গেলেন আরবে। তিনি শান্তি ভঙ্গ করলেন একের পর এক বোগদাদ, মদীনা, বৈরুত ও বস্‌রা নগরীতে। হট্টগোল বাধালেন দামেস্কে এবং তারপরে হাজির হলেন কায়রোতে। এখানে কিছুদিন তিনি প্রধান বিচারপতিরূপে কাজ করেন। কার বিচার করেন এবং কিভাবে বিচার করেন সেটা জানা যায়নি। তবে এটা জানা গেছে যে এরপর পুরো দুবছর ধরে মিশরের সর্বত্র তাঁকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কিন্তু তিনি তখন ভিন্ দেশে, অন্য পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

তিনি ছিলেন এক চির পথিক, এক জায়গায় বেশি দিন থাকতেন না। সকালে দেখা যেত তিনি গাধার পিঠে জিন চাপাচ্ছেন। সাদাটা গুলজান বিবির, ধূসরটা তাঁর নিজের। জিন পরানো শেষ হলেই তিনি নেমে পড়তেন পথে। তারপর শুধু এগিয়ে চলা। রাত হলে নতুন নতুন জায়গায় যাত্রাবিরতি। ভোরের হিমে জমে যেতেন, বরফে ঢাকা গিরিপথে তুষার-ঝড়ে আক্রান্ত হতেন, দুপুরে পর্বতের পাথুরে খাদের মধ্যে বদ্ধ গরমে পুড়ে যেত তাঁর মুখ-চোখ। বিকেলে সমতল উপত্যকার স্নিগ্ধ সুগন্ধী বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিতেন তিনি। আর পান করতেন পাহাড়ী ঝরনার সফেন শীতল জল।

যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনতা থাকলে তিনি কখনও পর্যটন বন্ধ করতেন না। কিন্তু যার বউ আছে তার বাচ্চা-কাচ্চাও থাকতেই হবে। হোজা নাসিরুদ্দীন কর্তব্য পালনে অবহেলা করেননি। বিয়ের চতুর্থ বছরে গুলজান বিবি তাঁকে চতুর্থ সন্তান উপহার দিলেন। উল্লসিত হলেন গর্বিত পিতা, আনন্দিত হলেন গুলজান বিবি। আহ্লাদে হৈ-চৈ করল, হাততালি দিল নবজাতকের তিন ভাই। সাদা রঙের গাধাটি ফুর্তিতে চিৎকার করে সকল দ্বিপদ, চতষ্পদ. পালকযুক্ত, পালকহীন, ভূচর-

খেচর-জলচর প্রাণীকুলের নিকট এক নতুন মালিকের আগমন বার্তা ঘোষণা করল। কেবল ধূসর রঙের গাধাটির মধ্যে ফুর্তির কোন চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। সে মুখ ভার করে নীরবে মাটির দিকে চেয়ে রইল। এটা লক্ষ করে হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'আমার গাধাটি কদিন ধরে মনমরা হয়ে আছে। ওর কোন অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? সেরকম বিপদ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।'

'সামনের বাজার থেকে ভাল দেখে একটা বেত কিনে নাও, দেখবে চট করে ওর মেজাজ চাঙ্গা হয়ে যাবে,' জবাব দিলেন গুলজান বিবি।

এই নির্মম কথাগুলো শুনে গাধাটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এবং মনে মনে মনিবের বিরুদ্ধে গজরাতে লাগল।

একটি বছর কেটে গেল। ফিরে এল বসন্ত। দখিনা বাতাসের স্পর্শে খোবানির কুঁড়িগুলো ফুটল। নানা বর্ণের ফুলে ফলে বাগানগুলো হেসে উঠল। পাখপাখালির কলতানে দশদিক মুখরিত হল। নদীনালা কানায় কানায় ভরে উঠল। একদিন বিশ্রামের সময় বসন্তের কচি ঘাস চিবোতে চিবোতে ধূসর গাধার নজর পড়ল গুলজান বিবির ওপর। সে লক্ষ করল, গুলজান বিবির দেহটা আবার গোলগাল হয়ে উঠেছে। সে যা আশঙ্কা করেছিল তাই সত্যে পরিণত হতে চলেছে দেখে গাধাটা হতাশার স্বরে কানফাটা ডাক ছাড়ল এবং হঠাৎ এক হেঁচকা টানে দড়ি ছিঁড়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তখনি হোজা নাসিরুদ্দীন বুঝতে পারলেন তাঁর লম্বকর্ণ বাহনটি কেন ইদানীং মনমরা হয়ে ছিল। স্ত্রীকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'ওগো আমার রূপবতী গুলজান বিবি, এবার থেকে শেষের বাচ্চা দু'টিকে তোমার সঙ্গে সাদা গাধার পিঠে নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে।'

সেদিন থেকে সাদা রঙের গাধাটির মুখ ভার। আর, ধূসর রঙেরটি দুই কান উঁচিয়ে লেজ নাচিয়ে গটগট করে চলতে লাগল।

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও দুটি বছর। এখন দুই গাধারই মন ভার।

গুলজান বিবি প্রস্তাব দিলেন, 'আমাদের আরেকটি গাধা কেনা উচিত।'

'ওগো আমার গোলাপরানী, বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটা এমনি করে চলতে থাকলে আমাদের পেছনে শিগ্‌গিরই গাধার মিছিল দেখতে পাবে। আহা, আমার ঘোরাঘুরির দিন বুঝি এবার শেষ হয়ে এল, এসে পড়ল ভাবনা চিন্তা আর ধ্যানের দিন।' জবাব দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'মাশা আল্লাহ!' বলে উঠলেন গুলজান, 'তোমার বয়সী একজন মানুষের এতবড় একটা পরিবার নিয়ে ছিন্নমূল ভবঘুরের মত যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো যে কি বেমানান সেটা তাহলে এতদিনে তুমি বুঝতে পেরেছ। ভাল কথা, চল, আমরা বোখারায় গিয়ে আমার বাবার সঙ্গে থাকি।'

স্ত্রীর কথায় বাধা দিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'আরে রাখো, রাখো। তুমি

বোধহয় ভুলে গেছ, সেই একই স্বনামধন্য আমীর এখনও বোখারায় বহাল তবিয়তে রাজত্ব করছেন এবং তিনি তাঁর দরবারের জ্যোতিষী হুসেইন হাসলিয়াকে মোটেও ভুলে যাননি। তার চাইতে চল, আমরা এদিকে কোথাও, কোকন্দ কিংবা খোজেন্ত-এ গিয়ে ঘর বাঁধি। চল, কোকন্দেই যাই।'

বেঁকে বসলেন গুলজান, 'না, আমরা বরং খোজেন্তেই যাব। বড় বড় শহর আর বাজারের হৈ-চৈ-এর ওপর আমার বিরক্তি ধরে গেছে। আমি বিশ্রাম চাই, নির্জনতা চাই।'

হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর ভুলটা বুঝতে পারলেন একটু দেরিতে। কোকন্দ যাওয়ার যখন ইচ্ছা এবং বিবির মেজাজমর্জিও যখন জানা, তখন প্রথমেই তাঁর বলা উচিত ছিল, 'চল, খোজেন্ত-এই যাই।' তক্ষুণি জবাব আসত, 'কি! ওরকম একটা নির্জন জায়গায়!' তাহলে পরদিনই তাঁরা রওনা হতে পারতেন কোকন্দের পথে। কিন্তু সেই ভুল সংশোধন করা এখন আর সম্ভব নয়। তর্ক করাও বিপজ্জনক। প্রাচীন প্রবাদে আছে, 'স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করে আয়ুক্ষয় ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।' অগত্যা হোজা নাসিরুদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমি একবার খোজেন্তে গিয়েছি। ওখানকার আঙুরের স্বাদ আমি আজও ভুলিনি। ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।'

তাঁরা আস্তানা পাতলেন খোজেন্তে, রুটিওয়ালাদের মহল্লায়, সির দরিয়ার তীরে।

আমরা যে কালের কথা বলছি সেই সময় খোজেন্ত-এর অতীত গৌরব ও ঐশ্বর্যের চিহ্ন মাত্রও নেই। খোজেন্ত তখন ছোট দোকানদার, মালি, এক দঙ্গল পাগড়ীওয়ালা বুড়ো-হাবড়া—অবসর প্রাপ্ত মোল্লা, মুদাররিস, উলেমা ও কাজীর নিবাস এক নিদ্রালু শহর। সর্বত্র কেবল বুড়ো আর বুড়ো। মসজিদে বুড়ো, চাখানায় বুড়ো, রাস্তায়, গলিতে, চৌমাথায়, বাগানে থুথুরে বুড়োরা হাঁটছে, হাঁপাচ্ছে, কাশছে। এত বুড়োর এক জায়গায় সমাবেশ বিস্ময়কর। ওরা যেন খোজেন্ত-এর মাটিতে দেহরক্ষার ষড়যন্ত্র করেই সারা মুসলিম জগত থেকে ছুটে এসেছে। খোজেন্ত-এর চারদিকে কানায় কানায় ভরা খাল-নালার মালা। পর্বত তাকে রক্ষা করে হিমেল হাওয়ার দাপট থেকে। এ ছাড়া আছে তার নানা উদ্যান আর অগুণতি আঙুরবিথি। এসব মিলে খোজেন্ত জীবনের ঝঞ্ঝাঘাতে জর্জরিত বয়স্ক মানুষের কাছে প্রায় বেহেস্তের মত হয়ে উঠছে। এবং এই কারণে খোজেন্তবাসীরা প্রাণভরে আল্লাহ্‌র গুণগান করে।

গোটা শহরে একটি মাত্র মানুষের মনটা ছিল অন্য রকম।

লোকটার নাম উজাক-বাই। এক অদ্ভুত বদ্‌মেজাজী লোক। সারাক্ষণ মস্ত এক কালো চশমা পরে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে রাখে, কারও সাথে কথা বলে না। কারও সাথে বন্ধুত্ব করে না। কারও বাড়িতে যায় না। কাউকে আপ্যায়ন করে না। তার

এই অসামাজিক ব্যবহারের জন্য প্রতিবেশীরা মনে করে, লোকটার মনে কোন পাপ আছে। রাস্তার বখাটে ছেলেরা তাকে দেখলেই চেঁচায়, 'পেঁচা, চশমাওয়ালা পেঁচা।' কিন্তু লোকটা এতে কিছুই বলে না, কেবল মাথা ঝাঁকিয়ে মুচকি হাসে।

হ্যাঁ, উজাক-বাই-এর ছদ্মবেশে এই লোকটি হোজা নাসিরুদ্দীন। তিনি জানেন যে এই ছোট্ট শহরে সবাই সবাইকে চেনে, জানে। এখানে তাঁর একটি বেফাঁস কথা বা ভুল পদক্ষেপ তাঁর পরিবারের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই তিনি কালো চশমার আড়ালে মুখের অর্ধেকটা লুকিয়ে রাখেন, কল্পিত নাম গ্রহণ করেছেন এবং পড়শীদের এড়িয়ে চলেন। কিন্তু এ জীবন তাঁর অসহ্য হয়ে উঠল। খোজেন্তকে তাঁর মনে হল কারাগারের মত।

তাঁর মধ্যে ভবঘুরেপনার অদম্য বাসনা ও পরিবারের প্রতি গভীর মমতা—এই দুই পরস্পর বিরোধী ও সংঘাতরত উপাদান সৃষ্টি করার জন্যে আল্লাহকে দায়ী করলেন তিনি। দুই বিরোধী শক্তির সংঘাতে তিনি আরও বেশি কাহিল হয়ে পড়লেন এই কারণে যে তাঁর দুঃখের ভাগী হবার মত কেউ নেই। স্ত্রী গুলজান সেই পরস্পর বিরোধী শক্তির একটির প্রতীক। তাঁর কাছে কোন সহানুভূতিই পাওয়া যাবে না। অপর শক্তির প্রতীক গাধা। তার কাছে সহানুভূতি লাভের সম্ভাবনা থাকলেও সে তো মানুষের ভাষায় সেটা প্রকাশ করতে পারে না।

বিষণ্ন হোজা নাসিরুদ্দীন সকালে বাজারে যান। বাজার থেকে ফিরে সংসারের টুকটাক কাজকর্ম করেন। বিকেলটা একেবারে ফাঁকা। বিকেলে তিনি চলে যান নদী তীরের সবচেয়ে নোংরা চা-খানায়। সেখানে এসে জোটে রাজ্যের যতসব ভিখারী, চোর-ছ্যাঁচোড়, ভবঘুরে বাউণ্ডুলের দল। কিন্তু হোজা নাসিরুদ্দীন সেখানে নিরাপদ বোধ করেন। মাঝে মাঝে বিষণ্ন মনে তিনি ভাবেন, 'বিশাল ও সুন্দর পৃথিবীতে আমার জন্য এ জায়গাটুকুই অবশিষ্ট আছে।'

খোজেন্ত ছাড়ার জন্য মন তাঁর তৈরি হয়ে গেল। অপেক্ষা শুধু একটি উপলক্ষের।

অবশেষে ভাগ্য তাঁর প্রতি সদয় হল।

হোজা নাসিরুদ্দীন প্রতিদিন যে-পথে চা-খানায় যাওয়া আসা করতেন তার পাশে একটা ঝোপের কাছে গহর শাদ-এর ভাঙা মসজিদের সামনে বসে থাকতেন এক কালা-বোবা ফকির। দেখতে তিনি আর সব সাধারণ ফকিরের মতই ছিলেন। কিন্তু এই ফকিরটি সম্বন্ধে যে ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকত তা হচ্ছে এই যে তিনি বসার জন্য এমন একটা মসজিদ বেছে নিয়েছেন যেটা বহুদিন আগে থেকেই বন্ধ ও পরিত্যক্ত। সেখানে কেউ যায় না এবং কাজেই, ভাল মত দান-খয়রাত পাওয়ার জন্য জায়গাটা মোটেই সুবিধার নয়। হোজা নাসিরুদ্দীন প্রতিদিন ফকিরের পাত্রে এক টাকা দান করেন। ফকির নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে দানটি স্বীকার করে নেন। তাঁর বৃদ্ধ চোখে ফুটে ওঠে শিশুর সরল কোমল দৃষ্টি। তারপর ছেঁড়া মাদুরটি গুটিয়ে

তিনি চলে যান ভাঙা মস্‌জিদের মধ্যে তাঁর নির্জন আস্তানায়।

একদিন হঠাৎ এই কালা-বোবা ফকির কথা বললেন। তখন শীতকাল শেষ হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার আকাশ ছেয়ে গেছে ঘন কালো মেঘে। পাতলা বৃষ্টির ধারা ঝরছে তেরছা হয়ে। ঝড়ো হাওয়ায় দুলছে গাছপালার শাখা প্রশাখা। এমন সময় হোজা নাসিরুদ্দীন এসে দাঁড়ালেন সেখানে এবং যথারীতি পকেটে হাত দিলেন। কিন্তু হাতটি পকেট থেকে বের করার আগেই ফকির শীর্ণ হাত সামনে বাড়িয়ে বললেন, 'দুঃখ কোরো না, হোজা নাসিরুদ্দীন! আর ক'দিন পরেই তুমি তোমার কালো চশমা ফেলে দেবে।'

হকচকিয়ে গেলেন হোজা। ফকিরদের সব কায়দা কৌশল জানেন বলে কালা-বোবা ফকিরের মুখে কথা শুনে তিনি বিস্মিত হলেন না। কিন্তু বুড়োটা তাঁর নাম জানল কি করে?

তিনি কি ভাবছেন তা বুঝতে পেরে ফকির বললেন, 'আমাকে ভয় কোরো না, হোজা নাসিরুদ্দীন! তোমার সাহায্য লাভের আশায়, তোমার সাথে কথা বলব বলে, আমি বহু বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি। কিন্তু এর আগে কোন দিন সে সুযোগ পাইনি। তোমাকে আমি আগেও দেখেছি বহুবার। বোখারায় দেখেছি, দেখেছি সমরখন্দে।'

'থামুন,' বাধা দিয়ে বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন। 'আমি যে এখানে রয়েছি সেটা আপনি কেমন করে জানলেন? আপনি আমাকে মহা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলেন দেখছি।'

'তোমার হৃদয় থেকে ভয়কে দূর করো। আমি ছাড়া এই অঞ্চলের অন্য কেউ তোমার এখানে অবস্থানের কথা জানে না। নির্বাক ও জ্ঞানী সংঘ ওরফে তারকাবিহারী নামে পরিচিত আমাদের গোপন দলের একজন আমাকে খবরটা দিয়েছেন। শীতের প্রথম দিকে বাজারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তোমাকে হঠাৎ দেখে ফেলেন। তখন এক বেখেয়াল মুটের ধাক্কায় তোমার কালো চশমাটা খসে পড়েছিল।'

হোজা নাসিরুদ্দীন জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আমার মনে পড়েছে। কিন্তু এক লহমার মধ্যে আমাকে চিনে ফেলার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি আপনার যে তারকাবিহারী ভাইটির, তিনি যে গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না সে বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত?'

'গুনাহ করো না। তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান লোক, তাঁর স্মৃতি আমার কাছে পবিত্র। ইতিমধ্যেই এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে তিনি অন্য এক উচ্চতর জগতে প্রবেশ করেছেন,' জবাব দিলেন ফকির।

হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'আমাকে মাফ করুন, হে মাননীয় দরবেশ। এখন বলুন আপনি আজকে আমার সঙ্গে কেন কথা বললেন, আগেই বা কেন বলেননি?'

বুড়ো ফকির জবাব দিলেন, 'আমাদের নিয়ম অনুসারে আমাকে বছরের ৩৬৩ দিন কালা-বোবা হয়ে থাকতে হয়। এক বছর নির্বাক থাকার পর তুমিই প্রথম ব্যক্তি যার সঙ্গে আজ আমি কথা বললাম। বছরের যে দুটি দিন আমি কথা বলতে পারি তার প্রথম দিন হচ্ছে আজ। আগে যখনই তোমার দেখা পেয়েছি তখন ছিল আমার নির্বাক থাকার পর্ব। কাজেই বাধ্য হয়েই নির্বাক ছিলাম, যদিও মনটা আমার আকুলি-বিকুলি করত কথা বলার জন্যে।'

হোজা নাসিরুদ্দীন আগ্রহের সুরে বললেন, 'বলুন, আপনার দুঃখ কি, কী সাহায্য আপনি আমার কাছে চান। আপনার কি, হুজুর, টাকা-পয়সার দরকার? আমার বিবির অজান্তে এক গোপন জায়গায় লুকানো দেড়শ' টাকা আছে।'

বুড়ো ফকির গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, 'আমি একজন দরবেশ, আধ্যাত্মিক লাভ ছাড়া আর কোন পার্থিব লাভের কাঙ্গাল নই। না, তোমার কাছে টাকাকড়ি চাই না। যাক, এখানে এই রাস্তায় ঠাণ্ডা হাওয়া আর বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে এসব কথা চলে না। এস আমার সঙ্গে।'

ভূমিকম্পে ধসে পড়া মসজিদের একটি কোনা তখনও অক্ষত ছিল। ফকির হোজা নাসিরুদ্দীনকে সেখানে নিয়ে গেলেন। চকমকি পাথর ঠুকে বাতি জ্বালালেন। সেই ক্ষীণ আলোকে হোজা নাসিরুদ্দীন দেখলেন ফকিরের ছোট্ট কুঠুরিটার এক কোনায় একটি খড়ের বিছানা। পানির একটা কলসী। একটা বাসি নানরুটি দিয়ে ঢাকা ভাঙা পাত্র। রুটির চারদিকটা ইঁদুরে ঠুকরে খেয়েছে। আর কিছু তাঁর চোখে পড়ল না। সত্যি, বুড়ো ফকির দরবেশী শিক্ষার সকল দিক আয়ত্ত করেছেন, আর কিছুর দরকার তাঁর নাই।

ফকির রুটিটার ইঁদুরে ঠোকরানো অংশগুলো সাবধানে ভেঙে হাতের তালুতে রাখলেন এবং এক কোনায় গর্তের সামনে একখানি ন্যাকড়া বিছিয়ে তার ওপর ওগুলো ছিটিয়ে দিলেন। এরপরে রুটির অবশিষ্ট অংশটাকে দু'ভাগ করে একভাগ মেহমানের হাতে দিয়ে বললেন, 'এস এবার আমরা খেতে খেতে কথা বলি।'

বাইরে তখন ঝড়ো হাওয়ার তুমুল মাতন। তার ঝাপটা নানা ছিদ্রপথে এসে ক্ষীণ দীপ শিখাটিকে বার বার বাঁকাচ্ছে, কাঁপাচ্ছে। সাথে সাথে ছায়ারা নামছে দেয়ালের ছাদে, বুড়ো ফকিরের বাঁকা নাক একেকবার অদৃশ্য হচ্ছে ছায়ার আড়ালে।

সেই হত-দরিদ্র জীর্ণ কুঠুরিতে ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ গর্জন, বৃষ্টির বিরামহীন পিটপিট, খড়ের তলায় ইঁদুরের কিচিরমিচির ও হুটোপুটির মধ্যে শুরু হল তঁদের আলাপ। খড়ের নিচ থেকে একটা থলে হাতড়ে বের করে ওটার মুখ খুললেন ফকির। তারপর পাথুরে মেঝের ওপর থলেটাকে উপুড় করে ধরলেন। একরাশ রূপোর টাকা বেরুল থলে থেকে।

'তুমি এতদিনে আমাকে যা দিয়েছ এ হচ্ছে সেই টাকা। তোমার দেওয়া সব

ক'টি মুদ্রা, এমনকি গতকালকেরটিও, আমি জমিয়ে রেখেছি। এগুলো নিয়ে যাও, তোমার লুকানো দেড়শ' টাকার সাথে মিলিয়ে রেখে দাও।'

হোজা নাসিরুদ্দীন প্রতিবাদ করে বললেন, 'ভিক্ষের টাকা আমি কখনও ফেরত নিই না। এ টাকা আপনি রাখুন, হুজুর। সুযোগমত কোন গরীব পরিবারকে দিয়ে দেবেন। এখন আমাকে বলুন, আমার কাছে আপনি কি সাহায্য চান।'

ফকির কোন জবাব না দিয়ে চিন্তায় ডুবে গেলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল চুপচাপ। বাতি নিবু নিবু হল। হোজা নাসিরুদ্দীন সাবধানে বাতির শিখাটি উস্কে দিলেন। ফকির চোখ মেলে তাকালেন।

'জবাব দাও, হোজা নাসিরুদ্দীন, তুমি কি ইতিমধ্যেই তোমার বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছ?'

বিস্মিত হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'আমার বিশ্বাস? কেন, সেটা তো ছেলেবেলা থেকেই আমার জানা। ইসলাম আমার বিশ্বাস—যদিও আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে প্রায়ই আমি এর বিধান লঙ্ঘন করি।'

'ওটা তো সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। প্রত্যেক জীবন্ত মানুষের কাছে আরেকটি বিশেষ ধর্মবিশ্বাস প্রকাশিত হয় এবং সেটা তার নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আমি তোমাকে তোমার নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করছি।'

হোজা নাসিরুদ্দীন স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে তাঁর কোন নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাস নেই।

ফকির বললেন, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। অথচ এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে সকল বিভ্রান্তিকর ধাঁধার রহস্য উদঘাটনের চাবি। তোমার বিশ্বাসকে জেনে নাও—তাহলে অন্ধকার তোমার সামনে আলো হয়ে উঠবে, বিভ্রান্তি হবে স্বচ্ছতা, অর্থহীনতা হবে অর্থময়। তোমার জীবন সর্বদা ছিল কর্মময়। কিন্তু সেই কর্ম ছিল বাহ্যিক ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আত্মিক বিষয়ে তুমি কোন মনোযোগ দাওনি। তুমি বিশ্বাসকে খোঁজো। যদি না পারো তবে আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'হে মহামান্য দরবেশ, আপনি আমার অন্তরের গভীরে উঁকি দিয়েছেন। আমার প্রিয়তম চিন্তা-ভাবনাও আপনার জানা।'

ফকির বললেন, 'ঠিক বলেছ। জেনে রাখো, তুমি যেখানেই ঘুরে বেড়াও না কেন আমি মনে মনে তোমার সঙ্গে থাকি, তোমার সকল কাজে অংশগ্রহণ করি। যেখানেই তুমি থাক, যা-ই কর, তোমার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা আমার কাছে পৌঁছে যায়, আমার মনের পাতে লিখিত হয়। আমার মধ্যে তুমি তোমার নিজের সত্তাকেই দেখতে পাচ্ছ।'

'সোবহান আল্লাহ! পথের মধ্যে একজন বৃদ্ধের আকারে ও তাপসের বেশে নিজের সাথে দেখা হয়ে যাওয়া সত্যি এক আশ্চর্য ব্যাপার।'

হোজা নাসিরুদ্দীনের মাথায় একটু ঝিম ধরে গেল। দরবেশের অদ্ভুত

কথাবার্তা তাঁকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে।

কিন্তু এটা তো সবে শুরু। আরও অনেক আশ্চর্যজনক কথা তাঁকে শুনতে হবে।

'হুজুর, আপনি কি কাজের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন?'

মাথা নত করলেন দরবেশ। গভীর দুঃখভরা স্বরে বললেন, 'আমার কবরে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই আমি কাতরভাবে তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে সাহায্য করো।'

'কিভাবে সাহায্য করব? আপনাকে কবরের বিছানা থেকে তুলে নিয়ে?'

'আমার আত্মিক সত্তাকে সেই চরম অধঃপতন থেকে রক্ষা করো, যেখান থেকে উঠে আসার জন্য আমি যুগ যুগ ব্যাপী সাধনা করেছি। সেই অনন্তকালের মধ্যে আমার আত্মা কতবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে। পূর্ণতা লাভের জন্য তাকে কত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আর এখন আমার ঘৃণা অবহেলার দরুন তাকে আবার সেই প্রথম থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে।'

হোজা নাসিরুদ্দীন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, 'আল্লাহ রহমানুর রাহিম! আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে সহজ ভাষায় বলুন– আপনি আমাকে দিয়ে কি করাতে চান?'

'আমার মুক্তির নোঙর তোমার হাতের মুঠোয়। আমি দেখছি যে আমাদের তারকাবিহারী গোষ্ঠীর কিছু গোপন তথ্য তোমাকে না জানালে আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে না,' বললেন বুড়ো ফকির।

হোজা নাসিরুদ্দীন রাজি হলেন, 'ভাল কথা। আপনাদের গোপন রহস্য শোনার জন্য আমি প্রস্তুত।'

'তাহলে শুরু করা যাক, সত্যের নামে,' গম্ভীর স্বরে বললেন ফকির। 'কিন্তু প্রথমে তুমি জায়গা বদলে বসো, তোমার ভয়ে আমার ইঁদুরগুলো রুটির টুকরো খাওয়ার জন্য গর্ত থেকে বেরুতে পারছে না।'

হোজা নাসিরুদ্দীন সরে বসলেন। ইঁদুরগুলো গর্তের বাইরে এসে খাওয়া শুরু করল। ফকির দুই হাতে তাঁর দাড়ি পরিপাটি করে শুরু করলেন বক্তব্য– 'উচ্চতর প্রজ্ঞা আমাদের আলোচনাকে আশীর্বাদে অভিষিক্ত করুক! তোমাকে উপলব্ধির ক্ষমতা দান করুক এবং আমাকে প্রদান করুক ভাষার স্বচ্ছতা ও গভীরতা।'

দুই চোখ বুজে কয়েক মিনিট নীরব হয়ে রইলেন তিনি। তাঁর মুখে শান্ত সমাহিত ভাব। যেন কোন অন্তর্নিহিত গোপন কণ্ঠস্বর তিনি একাগ্রমনে শুনছেন। তারপর তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আঙুলের ইশারায় তিনি অতিথির মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

আত্মার পুনর্জন্ম সংক্রান্ত ফকিরের গোপন তত্ত্ব অনেক আগে থেকেই হোজা নাসিরুদ্দীন জানেন। ভারতীয় সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে তিনি এ বিষয়ে

জেনেছিলেন। তবু তিনি ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর মনে তখন অন্য চিন্তা। দূর থেকে ভেসে আসা চরকার গুঞ্জনধ্বনির মত ফকিরের একটানা স্বর তাঁকে আনমনা করে দিল। তিনি ভাবতে লাগলেন তাঁর পরিবারের কথা, আসন্ন বসন্তের কথা, কোন দূরের পথে যাযাবর কাফেলার সাথে পাহাড়, নদী, মরু ডিঙিয়ে অবিরাম চলার কথা।

এদিকে চরকার চাকা ঘুরছে তো ঘুরছেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে হোজা নাসিরুদ্দীনের নাক ডাকল, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। ভাগ্যিস তিনি ছায়ার আড়ালে বসেছিলেন এবং তাই ফকির টের পাননি। ফলে ফকির যে সব গোপন রহস্য প্রকাশ করলেন সেগুলো হোজা নাসিরুদ্দীনের অজানাই রয়ে গেল এবং অজানা রয়ে গেল আমাদেরও।

এক সময় হোজা নাসিরুদ্দীনের মাথা থেকে টুপিটা খসে পড়ল মেঝেতে এবং তিনি চমকে জেগে উঠলেন।

দরবেশ তখন বলে চলেছেন, 'প্রশ্ন উঠতে পারে পৃথিবী ত্যাগের পর আমাদের আত্মা কোথায় নতুন আশ্রয় খুঁজে পায় এবং পৃথিবীতে আসার আগে সে কোথায় ছিল? এর জবাব হল—কেন, মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অনন্ত তারকালোকে! আমরা কোন না কোন্ তারকা থেকে পৃথিবীতে আসি এবং সেখানেই ফিরে যাই, আমরা তারকা-বিহারী!'

হোজা নাসিরুদ্দীন ভাবলেন তাঁর লজ্জাকর আচরণ ঢাকার জন্য দরবেশকে একটা প্রশ্ন করা উচিত।

'হে মাননীয় দরবেশ, আমি অনেক উল্কাপাত দেখেছি! এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব? আমি আগের জন্মে বাস করেছি এরকম কোন তারা যদি আকাশ থেকে পড়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় তাহলে অসুবিধা নাই। কিন্তু এ জন্মে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার পর যেখানে আমার বাস করার কথা সেই তারাটির যদি পতন হয়? তাহলে আমার বিদেহী আত্মা কোথায় বাসা বাঁধবে?'

কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন দরবেশ। হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। শেষে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আর আমি কিনা ধৈর্যের সাথে আমার বক্তব্য শোনার জন্য তোমার প্রশংসা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। আজ বাড়ি যাও। আমি যে সব গোপন কথা তোমাকে বললাম সেগুলো নিয়ে ভাব। কাল বিকেলে ফিরে এলে আমরা আবার আলোচনা শুরু করব।'

হোজা নাসিরুদ্দীন দরবেশকে সালাম করে নীরবে বিদায় নিলেন এবং পরদিন বিকেলে আবার সেখানে হাজির হলেন।

এবার তিনি শুনলেন যে প্রত্যেক জন্ম একটি বিশেষ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আত্মা যদি আরও নিখুঁত দৈহিক রূপ এবং ভবিষ্যতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত

হবার মত প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করতে চায় তবে তাকে এ আইন মেনে চলতে হয়।

'আর পার্থিব দেহের ব্যাপারে আইন হচ্ছে সৎকর্মের আইন। মনে রেখো, ভাবী পৃথিবীর সুখের দিনগুলো হবে যারা সৎকর্মে তৎপর থাকবে তাদের জন্য। আমি তাদেরকে উদ্যোগী ও সৃষ্টিশীল দরবেশ বলে অভিহিত করব। এরাই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল পাপ ও অন্যায়কে ধ্বংস করবে। তুমি, হোজা নাসিরুদ্দীন, হচ্ছ সেই মহৎ স্রষ্টাদের অগ্রদূত। তোমার পার্থিব কার্যকলাপের তাৎপর্য এত বেশি যে সেগুলো যুগ যুগ ধরে মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

হোজা নাসিরুদ্দীন আগ্রহের সঙ্গে দরবেশের কথা শুনে গেলেন, যদিও দরবেশ কথিত সেই সব সুখের দিন পৃথিবীতে আসতে আরও পাঁচ হাজার বছর লাগবে।

অর্ধেক রাত প্রায় কেটে গেছে। হোজা নাসিরুদ্দীন চাইলেন দরবেশকে তাঁর তারকালোক থেকে বাস্তবের মাটিতে এবং যে জন্য তাঁদের সাক্ষাৎ সেই মূল প্রসঙ্গে টেনে আনতে। যথেষ্ট বিনয় সহকারে তিনি বললেনঃ

'হে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহাজ্ঞানী, আমার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। আমি যথাযোগ্য বিনয় সহকারে ধরে নিচ্ছি যে আপনি কি ধরনের সাহায্য আমার কাছে চান সেটা বুঝতে পারার মত অবস্থায় আমি এখন পৌঁছে গেছি। আর, বেয়াদবী মাফ করলে বলতে পারি, সময়ও শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং দয়া করে বলুন আপনার কাজটা কি।'

ফকির মাথা নিচু করে বললেন, 'কাজটা বড় কঠিন।'

'বলুন! আমার সাধ্যের মধ্যে হলে, এমনকি সাধ্যের কিছুটা বাইরে হলেও আমি তা করে দেব।'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দরবেশ বলে গেলেন, 'আমি যখন আমাদের নির্বাক জ্ঞানী ভ্রাতৃসংঘের বিষয়ে কিছুই জানতাম না তখনকার কথা। আমি তখন ধনী। নানা পাপাচার ও ভোগবিলাসে মত্ত। নিজের সর্বস্ব গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে যাওয়ার চিন্তা তখনও মাথায় জাগেনি। আমার নানা সম্পদের মধ্যে ছিল ফারগানা অঞ্চলের এক পার্বত্য হ্রদ। একদিন আগাবেক নামের এক লোকের সঙ্গে দাবা খেলে আমি হ্রদটা হারালাম। এই আগাবেক লোকটা ছিল ড্রাগনের মত হিংস্র ও মাকড়সার মত নির্মম। হ্রদ-এর মালিক হয়ে সে তার তীরে বাড়ি বানাল এবং সেচের পানির জন্য গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এমন চড়া দাম আদায় করতে লাগল যে তাদের অনেকেই গরীব হয়ে গেল, আর অনেকেই হল সর্বস্বান্ত।

'প্রতি বছর বসন্ত ঘনিয়ে এলেই লোকটার নষ্টামি আর লোভের নানা কাহিনী আমার কানে পৌঁছায়। দুঃখে, অনুশোচনায় আমার অন্তর ফেটে যায়, আমি কাঁদি। কিন্তু যা করে ফেলেছি সেটা শোধরানর উপায় আমার নাই। এই পাপ পাষাণের

মত আমার বুকে চেপে আছে। এই পার্থিব জীবনের শেষে এটা আমার ভবিষ্যৎ উন্নততর অস্তিত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে…'

'বুঝতে পেরেছি,' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। 'আপনি চান যে আমি হ্রদটি আগাবেকের হাত থেকে নিয়ে নিই? ঠিক আছে। আমি এই আগাবেক লোকটাকে কখনও দেখিনি। তবু আপনাকে আগাম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, বছর শেষ হবার আগেই তার মুনাফা যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাবে। আমাকে বলুন তো হ্রদটা ঠিক কোন্ জায়গায়?'

দরবেশের মুখে রা নেই। হোজা নাসিরুদ্দীন শুনলেন মোরগের শেষ প্রহরের ডাক। দরবেশের কথা বলার দ্বিতীয় দিনটিও শেষ হয়ে গেছে। আগামী বসন্তের আগে আর একটি কথাও বেরুবে না তাঁর মুখ থেকে।

বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'আপনি সব কথা বলার সময় পেলেন, তারকালোকে বিচরণ সম্পর্কে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিতে পারলেন, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি সেটাই বলতে পারলেন না!'

দুঃখ ও হতাশায় দরবেশের শীর্ণ মুখ অবনত হল দেখে হোজা নাসিরুদ্দীনের মনটা নরম হল। 'আমার নির্মম তিরস্কারের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি জানি আপনার হ্রদ ফারগানার পার্বত্য অঞ্চলে। ওটা আমি খুঁজে বের করবই। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।' এই বলে তিনি বিদায় নিলেন।

দুই

নিজের নামের সঙ্গে একক লড়াই

দরবেশকে দেয়া প্রতিশ্রুতি কিভাবে রক্ষা করবেন সেকথা ভাবতে ভাবতে অস্থির হলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। একদিন খুব ভোরে উঠে তিনি গেলেন গাধার চালাঘরে। তার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দুঃখ কোরো না। আমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। এক সপ্তাহ পরেই আমরা চলে যাব এখান থেকে অনেক দূরে, বড় বড় শহর বাজারে। কিন্তু গুলজানকে নিয়ে কি করব? তাকে কি সব কথা খুলে

বলব? কিন্তু তুমি তো জানো বন্ধু, ওর মনটা কেমন বাঁকা? আল্লাহ না করুন, ও যদি হঠাৎ নদীতে ডুবে মরে তাহলে তার লাশ আমি খুঁজব উজানে, ভাটিতে নয়!'

তিনি ভাবতে লাগলেন। একেকটা বুদ্ধি বিদ্যুৎ প্রবাহের মত তাঁর মগজে আসে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলোকে বাতিল করেন।

'আমি কি একদম বোকা হয়ে গেছি? মাথায় যে কিছুই আসে না। আমার প্রিয় গাধা, তুমি চুপ করে আছ কেন? একটু মাথা খাটাও দেখি, আমাকে সাহায্য করো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পেটের ভেতর গুড়গুড় আওয়াজ তুলে গাধা সাড়া দিল। সেই মুহূর্তে একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত ঝলকে উঠল তাঁর মাথায়।

'আরে তাই তো!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'আমি যদি আমার পরিবারকে ছেড়ে যেতে পারি, তবে আমার পরিবার কেন আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না?'

সেই দিনই বাজার থেকে ফিরে গুলজানকে তিনি বললেন, 'আজ বাজারে বোখারার এক লোকের সঙ্গে দেখা হল। লোকটা তোমার আব্বাজানের বিশেষ চেনা। সে বোখারা ছেড়ে এসেছে মাস দুই আগে। এখন বোখারার এক যাত্রীদলের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে। সে বলল, তোমার আব্বাজান ভাল আছেন, সুখে আছেন। দুঃখ কেবল একটা—তিনি বড় একা। কিন্তু কি আফসোস, বোখারা আমার জন্য নিষিদ্ধ, আমরা তাঁর কাছে যেতে পারব না।'

কোন জবাব দিলেন না গুলজান, শুধু মুখটা আরও নিচু করে সেলাই করতে লাগলেন। হোজা নাসিরুদ্দীন বিষাদমাখা সদয় হাসি নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। আজকের এই স্থূল লালমুখো কটুভাষী মেয়ে মানুষটার মধ্যে তাঁর পুরানো দিনের সেই সুন্দরী গুলজান বিবিকে কে চিনতে পারবে? কিন্তু হোজা নাসিরুদ্দীনের ছিল আলাদা দৃষ্টি। ইচ্ছা হলে হৃদয়ের সেই দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে আগের রূপেই দেখতে পান। 'ওগো আমার শান্ত কপোতী, আমার এ প্রতারণাটি ক্ষমা করো'—মনে মনে বললেন তিনি। 'কিন্তু তোমার বদ মেজাজের কথা তো তুমি নিজেই ভাল করে জানো। কাজেই খোলা মনে বল তো, প্রতারণা করা ছাড়া আমার আর কি উপায় আছে?'

পরদিন তিনি আবার বোখারার সেই লোকটার প্রসঙ্গ তুললেন।

'আমি তাকে বাড়িতে দাওয়াত করে আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কারাভাঁ আগেই বোখারায় রওনা হয়ে গেছে,'—গুলজানের সাথে যাতে চোখাচোখি না হয় সেজন্য দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। কারণ বোখারার কোন লোকের সাথেই গতকাল বা আজ তাঁর দেখা হয়নি। শুরু থেকে শেষতক সবই তিনি বানিয়ে বলেছেন।

'আহা, এক সপ্তাহের মধ্যেই ওরা বোখারায় পৌঁছে যাবে। দক্ষিণের গেট দিয়ে ওরা শহরে ঢুকবে। ওটা তোমাদের বাড়ি থেকে দেখা যায়। তোমার আব্বা

যদি ছাদে দাঁড়িয়ে কারাভাঁটি লক্ষ করেন তাতে আমি আশ্চর্য হব না। বোখারার সেই লোকটি হয়ত তাঁকে বলবে আমাদের কথা। বলবে, আমরা ভাল আছি এবং খোজেন্ত-এ বাস করছি। খোজেন্ত বোখারা থেকে মাত্র এক সপ্তাহের পথ দূরে। সে তোমার আব্বাকে আরও বলবে যে আল্লাহর মেহেরবানিতে সাতটি নাতি হয়েছে তাঁর। তাঁকে কখনও না দেখলেও ওরা সবাই ওদের নানাজীকে ভালবাসে··· ।'

বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন গুলজান। চোখ দুটি তাঁর ভরে গেল পানিতে। হোজা নাসিরুদ্দীন বুঝতে পারলেন গুলজানের দীলের শক্ত মাটি নরম হয়ে এসেছে এবং তাঁর ধূর্ততার কুমোর-চাক ঘুরিয়ে দিয়ে এবার নিজের নকশা মত পাত্র বানাবার সময় হয়ে গেছে।

গলায় একটুখানি দুঃখের সুর ঢেলে তিনি বললেন, 'সত্যি, বুড়ো মানুষটাকে নাতিদের মুখ দেখানো দরকার। আল্লাহ ওই ডাকাত আমীর ব্যাটাকে কানা করে দিক, তার সারাদেহে ফোঁড়া উঠুক। তারই জন্য আমি বোখারায় যেতে পারছি না। তবে নিষেধাজ্ঞাটা কেবল আমার ওপর। তোমার আর বাচ্চাদের ওখানে যেতে কোন বাধা নেই। এক সপ্তাহ পরেই তুমি তোমার আব্বাকে সালাম করতে পারো। কিন্তু কি আফসোস, পথ খরচের টাকাটা আমাদের হাতে নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠলেন গুলজান, 'এটা কেমন কথা? সিন্দুকের ভেতর থলের মধ্যে যে আটশো টাকা পড়ে আছে সেটার কি হল?'

হোজা নাসিরুদ্দীন অপেক্ষা করছিলেন কখন গুলজান এই কথাটা বলেন তার জন্য। এরপর দু'জনের কথাবার্তা কোন্ খাতে যাবে সেটা তিনি খুব ভাল করেই জানেন, ঠিক একজন অভিজ্ঞ মাঝি যেমন জানে নদীর প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি চড়া, বিপজ্জনক ঘূর্ণিপাক ইত্যাদির খবর। তিনি সাহসের সাথে তাঁর নৌকা বেয়ে চললেন, 'না। ওই টাকাটা ছোঁয়া যাবে না। ওটা আমাদের ঘরের জন্য লাগবে। আমি ইতিমধ্যেই টাকাটা বরাদ্দ করে ফেলেছি।'

'ও, বরাদ্দ করে ফেলেছ, না?' বিপজ্জনক চড়া ঘনিয়ে আসছে। স্ত্রীর গলার আওয়াজে তিনি স্রোতের কলকল শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

বৈঠার আরেক ধাক্কায় তিনি নৌকাকে চড়া এড়িয়ে মাঝ নদীতে সরিয়ে নিলেন।

'সব কিছুর আগে আমাদেরকে বাগানের মাঝখানে একটা ইঁদারা খুঁড়তে হবে। পাথরের চাকতি দিয়ে ওটাকে বাঁধাই করে দিতে হবে যাতে গরমের দিনে আমাদের ছেলেরা গোসল করতে পারে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' জবাব দিলেন গুলজান। 'বাগানের পাশেই মাত্র দশ পা দূরেই যখন নদী বয়ে যাচ্ছে তখন ইঁদারা ছাড়া আমাদের চলে কেমন করে? আর বাঁধাইয়ের কথা বলছ? আমরা ইঁদারাটকে মার্বেল দিয়েও বাঁধিয়ে দিতে পারি।'

এবার নৌকা তীরবেগে ছুটে চলেছে সফেন উত্তাল ঘূর্ণাবর্তের দিকে।

হোজা নাসিরুদ্দীন দুই আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ইঁদারা বানাতে দুইশ' টাকা লাগবে। তারপরে, বাগানের মধ্যে আমি একটা কুঞ্জ বানাব বলে ভাবছি। কুঞ্জের ভেতরটা কার্পেট দিয়ে সাজাব। ছুতোর বলছে কুঞ্জ বানাতে আমার খরচ হবে দুইশ' টাকা, আর কার্পেট কিনতে যাবে দুইশ' টাকা।

'ছয়শ' গেল,' বললেন গুলজান। 'কিন্তু এর পরেও তো দুইশ' থাকবে।'

হোজা নাসিরুদ্দীন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ওটারও দরকার আছে। আমাদের তক্তার তৈরি গেটটার বদলে আমি আখরোট কাঠের নকশাদার একটা গেট লাগাতে চাই। আর সবশেষে, আমাদের ঘরের ভেতর-বাইরে নীল ফুল এঁকে দেবার জন্য আমি কারিগর লাগাব বলে ভাবছি।'

নীল ফুলের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ায় তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

'ফুল বাইরে কেন?' গুলজানের প্রশ্ন।

'সৌন্দর্যের খাতিরে,' ব্যাখ্যা করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

আচমকা বৈঠা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল, পাথুরে তীরভূমিতে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেল নৌকা। ঘূর্ণিজলে পড়ে গিয়ে ভেসে গেলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। গভীর রাত পর্যন্ত চলল সরব কান্নাকাটি, চেঁচামেচি।

'বুড়ো মানুষটাকে দেখতে যাওয়ার জন্য টাকা নেই, কিন্তু নীল ফুল দিয়ে ঘর সাজাবার টাকা আছে!' চেঁচিয়ে উঠলেন গুলজান। 'আর বাইরের দিকটা সাজাতে হবে কেন? পয়লা বৃষ্টিতেই তো তোমার বাজে সাজ-সজ্জা ধুয়ে মুছে যাবে।'

হোজা নাসিরুদ্দীন চুপ করে রইলেন। দু'দিন ধরে তাঁর নগ্ন মাথার ওপর বর্ষিত হল গুলজানের গঞ্জনার অবিরাম বৃষ্টিধারা। তৃতীয়দিন একটা ঢাকনাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ি গেট-এ এসে দাঁড়াল। জয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত গুলজান বিবি তাঁর ছেলেদের নিয়ে বোখারায় বাপের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন।

বিদায় মুহূর্তে বিষণ্ন ও উদ্বিগ্ন মুখে গুলজান বললেন, 'ওগো আমার প্রিয় স্বামী, আমি তোমাকে যা যা বলেছি সব মনে থাকবে তো?'

'থাকবে গো আমার দিলের গোলাপ, থাকবে। প্রথমে আমি রান্নার হাঁড়িটা কাঁসারীকে দিয়ে মেরামত করিয়ে আনব। তারপরে চিমনিটা পরিষ্কার করব এবং কসাইয়ের ষোলো টাকা দেনা শোধ করব।'

'বাগানের ভাঙা বেড়াটা মেরামতের কথা ভুলে যেও না যেন।'

'আমি আজই ওটায় হাত লাগাব। ওগো আমার নয়নের আলো, বোখারায় বেশিদিন দেরি কোরো না।'

'আমরা ঠিক তিন মাস পরেই ফিরে আসব।'

হোজা নাসিরুদ্দীনের ইঙ্গিত পেয়ে কোচোয়ান তাড়া দিল তার হাড্ডিসার ঘোড়া দুটোকে। ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ তুলে ঘুরতে লাগল গাড়ির চাকা। শহরের সীমানা পার হয়ে যাবার পর গুলজান স্বামীকে বললেন, 'তুমি আমাদের বিদায়

দিতে গিয়ে যদি বোখারা পর্যন্ত চলে যেতে চাও তাহলে আর হেঁটে লাভ কি, উঠে বসো আমার পাশে।'

হাসিমুখে মস্করাটা স্বীকার করে নিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। গুলজান ও বাচ্চাদের সকলকে শেষ বারের মত আদর করে তিনি রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে গাড়ি মিলিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।

ফিরে এসে হোজা নাসিরুদ্দীন আর ঘরে ঢুকলেন না। সরাসরি গেলেন তাঁর গাধার চালাঘরে। বিনা খাটুনিতে আরামে খেতে খেতে বেশ মোটা হয়ে গেছে গাধাটি। হোজা নাসিরুদ্দীনকে দেখে পিটপিট করে তাকাল সে। তিনি গাধাকে বললেন, 'আশ্চর্য হচ্ছ কেন বন্ধু? বাড়িঘরে কোন সাড়া শব্দ নেই বলে? ওরা সব বোখারায় আমার শ্বশুরবাড়ি গেছে। তুমি আর আমি এখন আকাশের পাখির মতই মুক্ত।'

মিনিট কয়েকের মধ্যে গাধার পিঠে জিন পরিয়ে তিনি বললেন, 'ওহো, তুমি তো দেখছি হিসারের খাসির মতই মুটিয়ে গেছ। কিন্তু আমি দিব্যি করে বলছি, এক সপ্তাহের মধ্যেই সরাইলী কুকুরের মত হালকা ছিপছিপে হয়ে যাবে। বিশ্বাসী বন্ধু আমার, সামনে আমাদের অনেক কাজ, কিন্তু সময় বড্ড কম। চলো, চলো, এগিয়ে চলো। দূরের পথ আমাদের ডাকছে!'

গাধা হাঁকিয়ে তিনি গেলেন মৌনী দরবেশের কাছে। তাঁকে জানালেন যে তাঁর হ্রদ উদ্ধারে চললেন তিনি। দরবেশ নিঃশব্দে দোয়া করলেন।

দরবেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কোকন্দ সড়কের দিকে যাত্রা করলেন তিনি। দুপুর হতে না হতেই দূর থেকে ভেসে আসা জলপ্রপাতের শব্দের মত একটা গুমগুম আওয়াজ তাঁর কানে এল। এটা হচ্ছে সড়কের যানবাহন ও লোক চলাচলের আওয়াজ।

গাধার কানেও আওয়াজটা ধরা পড়ল। চমকে উঠে সে জোর কদমে এগিয়ে চলল। হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর কালো চশমা খুলে ছুঁড়ে ফেললেন রাস্তার ওপর। একটা পাথরের ওপর পড়ে চশমার কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

আধ ঘন্টার মধ্যে তাঁরা পৌঁছে গেলেন কোকন্দ মহাসড়কে। তার ওপরটা ঘনমেঘের মত ধুলোর আবরণে ঢাকা। সেই মেঘের আবরণ ভেদ করে ছুটে চলেছে অগুনতি মানুষ, ঘোড়া, বলদ ও উটের এক অন্তহীন স্রোত। কেউ যাচ্ছে কোকন্দের বাজারে, কেউ আসছে সেখানে থেকে। ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, ঘোড়ার চিঁহিঁ, বলদের হাম্বা, গাধার কর্কশ ধ্বনি সবকিছু মিলে সে এক কানফাটা গর্জন।

হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর গাধাকে চালিয়ে দিলেন একেবারে সেই স্রোতের মাখখানে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘূর্ণিপাক গ্রাস করল তাঁকে। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে ঠেলা ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে চললেন তিনি। এক ষাঁড় লেজের আঘাত

হানল তাঁর মুখে, উট হাঁচি দিল মাথার ওপর। এক গাড়োয়ান প্রচণ্ড গরমে ও শোরগোলে দিশেহারা হয়ে হুঙ্কার দিল তাঁর কানের কাছে, তিনি মাথা নিচু করে এড়ালেন উদ্যত চাবুকের আঘাত।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হোজা নাসিরুদ্দীন সংবিৎ ফিরে পেলেন। এখন তিনি নিজেই সেই গাড়োয়ানটির চেয়ে আরও জোরে চেঁচাতে লাগলেন, 'হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার!' কাউকে ধাক্কা দিয়ে, কাউকে পেছনে ফেলে, কারও পাশ কাটিয়ে, কারাভাঁর সারি ভেদ করে, কখনও দুই ঘোড়াগাড়ির মাঝখান দিয়ে, চলমান ভেড়ার পালকে বিক্ষিপ্ত করে তিনি ছুটে গেলেন সামনের দিকে।

রাতটা পথের পাশে এক চা-খানায় কাটিয়ে পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু করলেন। এখন রাস্তা নীরব ও জনহীন। কারাভাঁ (Caravan) আর ঘোড়াগাড়িগুলো তখনও পথে নামেনি। গাধাটা আপন মনে চলতে লাগল কখনও সড়কের এপাশ ঘেঁষে, কখনও ওপাশ ঘেঁষে। হোজা নাসিরুদ্দীন লাগামে হাত ছোঁয়ালেন না। আপন চিন্তায় মশগুল তিনি, 'আরেকটা রাত কেটে গেলেই আমরা কোকন্দ পৌছে যাব। সেখানে, কোকন্দের বাজারে, আগা-বেক এর কোন না কোন খবর আমি পাবই।'

ভাবতে ভাবতে তাঁর খেয়ালই ছিল না কখন গাধাটা সড়ক থেকে নেমে তাঁকে নিয়ে এসেছে সবুজ ঘাসের গালচে পাতা এক সরু পাহাড়ী পথে। এর এক পাশে পাহাড়ের পর পাহাড়, অন্যপাশে এক ছোট্ট নদী। সামনে উঁচু মালভূমি।

রেগে গেলেন হোজা নাসিরুদ্দীন গাধার ওপর, 'ওরে হতভাগা, ওরে শেয়াল আর টিকটিকির বাচ্চা, ওরে নচ্ছার গাধা, এ কোথায় নিয়ে এসেছিস তুই আমাকে? এ পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে আমি জানি না। তুই সড়ক থেকে নেমে গেলি কেন? কোন্ কুমতলব সুড়সুড়ি দিয়েছে তোর মাথায়?'

আচ্ছা করে চাবুক হেনে গাধাকে শায়েস্তা করার জন্য হাত তুলেও নামিয়ে নিলেন তিনি। চারদিকের সুন্দর শান্ত পরিবেশ তাঁকে নিরস্ত করল।

'কি ব্যাপার, পথে তোর কোন পরিচিত গাধার কাছ থেকে ভ্রূদটির হদিশ পেয়েছিস নাকি? তাই যদি হয় তবে কোন্ পথে যাবি সেটা তুই-ই বেছে নে। তুই কর্তা, আমি তোর হুকুম বরদার। যেদিকে ইচ্ছে যা, আমি টুঁ শব্দটিও করব না।'

সেই মুহূর্তে হোজা নাসিরুদ্দীন কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে তাঁর কথাগুলো কয়েকদিন পরেই সত্যে পরিণত হবে, তিনি সত্যিই তাঁর গাধার চাকরে পরিণত হবেন এবং গাধাটা হয়ে দাঁড়াবে তাঁর মহামান্য ও দুর্দান্ত মনিব?

কিন্তু সেটা পরের কাহিনী। এখন হোজা নাসিরুদ্দীনের সামনে এক উঁচু মালভূমি। তাই, সামান্য বিশ্রাম নিয়ে তিনি আবার চাপলেন গাধার পিঠে, লাগাম ছেড়ে দিয়ে ডুবে গেলেন চিন্তায়। গাধা চলতে লাগল আপন ইচ্ছায়। চড়াই পথ। এঁকে বেঁকে উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ঘন্টা দেড়েক চলার পর তিনি পৌছে

গেলেন এক গাঁয়ে। গাঁয়ের বাইরে উঁচু টিলার ওপর তিনদিক খোলা এক চা-খানা। সেখানে গিয়ে উঠলেন তিনি। চা-খানার গাট্টাগোট্টা জোয়ান মালিক তাঁকে দেখে খুশি হল এবং ছুটে গিয়ে চুলায় হাওয়া দিতে লাগল।

হোজা নাসিরুদ্দীন ছাড়া আর চারজন খদ্দের চা-খানায়। হলদে ধূসর দাড়িওয়ালা এক বুড়ো—স্পষ্টত স্থানীয় বাসিন্দা ও চাষী, কাঁচা চামড়ার জুতা পরা দু'জন রাখাল, আর চতুর্থজন এক হালকা-পাতলা ফ্যাকাসে চেহারার কারিগর। একটা চায়ের পাত্র আর পেয়ালাকে ঘিরে বসেছে তারা। পেয়ালাটা ঘুরছে হাতে হাতে। হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কি সব বলাবলি করছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে কোন নিষিদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করছে তারা।

তাদের আলোচনায় ব্যাঘাত যাতে না হয় সেজন্য হোজা নাসিরুদ্দীন পেছন ফিরে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওদের ফিসফিসানির আওয়াজ ক্রমেই বাড়তে লাগল। হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর কাঁধের পেছনটায় চারজোড়া চোখের দৃষ্টি অনুভব করলেন। 'ওরা আমাকে নিয়েই আলোচনা করছে এবং এখনি এসে আমার মুখোমুখি হবে।'

এবং ঘটল তা-ই। বুড়োটা উঠে হোজা নাসিরুদ্দীনের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম, মুসাফির। আপনার জুতায় আমরা হলদে ধুলোর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানকার পথঘাট তো পাথুরে এবং ধুলোর রঙ সাদা। কাজেই আমরা স্থির করেছি যে আপনি স্থানীয় লোক নন, উপত্যকা অঞ্চল থেকে এসেছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক?'

হাতের পেয়ালাটি বুড়োর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, জনাব, আমি উপত্যকা অঞ্চল থেকে এসেছি।'

পেয়ালাটি গ্রহণ করে হোজা নাসিরুদ্দীনের মুখোমুখি বসল লোকটি। তারপর বলল, 'তাহলে আমাদের বলুন, মুসাফির, গত ক'দিনের মধ্যে উপত্যকা অঞ্চলে কি কি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। খোজেন্তের রুটিওয়ালারা কি বিদ্রোহ করেছে, কিংবা কানিবাদামের মাখনওয়ালারা কর দিতে অস্বীকার করেছে? অথবা উরা তাইয়ুবে কি কোন কিছু ঘটেছে?'

প্রশ্নগুলো শুনে একটু বিস্মিত হলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। তিনি জবাব দিলেন, 'না, ও রকম কোন খবর আমি শুনিনি।'

সঙ্গীদের দিকে চোখ ঠেরে ধূর্ততাপূর্ণ স্বরে বুড়ো বলল, 'আমিও শুনিনি। আমি আপনাকে অমনি কথার কথা হিসাবে জিজ্ঞেস করলাম। আমরা এখানে জংলা জায়গায় পড়ে আছি। উপত্যকা অঞ্চলের লোক আমাদের এখানে খুব কমই আসে কিনা—তাই।'

'অমনি কথার কথা জিজ্ঞেস করলেন?' মৃদু হেসে বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'তাহলে কথার কথা জবাব দিচ্ছি শুনুন, জনাব। কানিবাদামের মাখনওয়ালারা নিয়মিত কর দিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের জানা না থাকলে আমি আপনাদেরকে আরও জানাতে চাই যে খোজেন্ত শহর যেখানে ছিল সেখানেই আছে, মাটির নিচে তলিয়ে যায়নি। নামাঙ্গানের আশপাশে কোন আগুনমুখো ড্রাগনের আনাগোনাও নজরে পড়েনি। আপনারা কি কথার কথা হিসেবে আরও কিছু জানতে চান?'

ব্যঙ্গটা বুঝতে পেরেও চুপ করে রইল বুড়োটা। মুসাফিরকে বিশ্বাস করার সাহস তার হচ্ছে না, অথচ অনুচ্চারিত প্রশ্ন তাকে পীড়া দিচ্ছে।

হোজা নাসিরুদ্দীন বুড়োর মনের প্রশ্নটি আঁচ করে বললেন, 'বুড়ো মিঞা, আমার মুখের দিকে তাকান তো, আমার চোখের গভীরে নজর দিন—বলুন আমাকে গুপ্তচরের মত মনে হয় কিনা?'

'আপনি আমার মনের কথাটি টের পেয়ে গেছেন,' বলল বুড়োটা। 'আমি একদিকে ভয়, অন্যদিকে আপনাকে একটা বিপজ্জনক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগ্রহ, এই দোটানার মধ্যে পড়েছি। তবে আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ শাসকদের সাথে যদি আপনার পরিচয় থেকে থাকে, ওই সব রক্তচোষা···মানে বলছিলাম কি, ওই সব ন্যায় বিচারক—আল্লাহ তাঁদের স্বর্গীয় জীবন রক্ষা করুক এবং তাঁদের পবিত্র হাতে শাসন রজ্জু আরও শক্ত হোক···'

'মুরুব্বী, আমার সামনে শাসকদের প্রশংসা করার দরকার নেই। একটু আগেই তো আপনাকে বলেছি যে আমি গুপ্তচর নই!'

'আপনার চেহারা দেখে আস্থা হয়। কাজেই, আপনার সঙ্গে মন খুলে কথা বলব।' বুড়োর গলার স্বর খাদে নেমে এল। তার তিন সঙ্গীও আরেকটু ঘনিয়ে বসল। 'আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, হোজা নাসিরুদ্দীন আমাদের এদিকে এসেছেন এরকম কোন খবর আপনি শুনেছেন কিনা।'

আর সব কিছুর জন্য হোজা নাসিরুদ্দীন তৈরি ছিলেন, কিন্তু এদের মুখে নিজের নাম শোনার জন্য নয়। গলায় চা আটকে যাওয়ায় তিনি কাশতে লাগলেন।

জোর ফিসফিস আওয়াজে জোয়ান রাখালটা বলল, 'হ্যাঁ, হোজা নাসিরুদ্দীন এসেছেন। এক ভেড়াওয়ালা খোজেন্তের কাছে বড় সড়কের ওপর তাঁকে নিজের চোখে দেখে এসেছে।'

'ওই ভেড়াওয়ালা এক সময় বোখারায় থাকত। হোজা নাসিরুদ্দীনকে সে দেখেছে ও চেনে,'—বলল দ্বিতীয় রাখালটা।

এবার বুড়ো বলল, 'শুধু ভেড়াওয়ালাই নয়, এক কারাভাঁ যাত্রীও তাঁকে দেখেছে সেই একই কোকন্দ মহাসড়কে।'

শুনতে শুনতে হোজা নাসিরুদ্দীন ভাবলেন কালো চশমাটা তিনি বড় তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়েছেন। লোকে তাঁকে চিনে ফেলেছে। কোকন্দ, আন্দিজান ও উপত্যকার অন্যান্য বাজারে তাঁকে নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই নানা গুজব ও

কানাকানি শুরু হয়েছে। এই গুজব ও কানাকানি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি বললেনঃ

'আপনাদের ধারণা ভুল। কারাভাঁ যাত্রী আর ভেড়াওয়ালা দু'জনেই ভুল করেছে। আমি নিশ্চিত জানি যে হোজা নাসিরুদ্দীন এখন এ অঞ্চল থেকে অনেক দূরে আছেন।'

'কিন্তু এক ফেরিওয়ালাও তো তাঁকে দেখেছে!' প্রতিবাদ করে উঠল কারিগরটি।

'ফেরিওয়ালাও দেখেছে?' আপনমনে বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন। 'হায়, কোন্ শয়তানের বুদ্ধিতে আমি চশমাটা খুলে ফেলেছিলাম!'

প্রকাশ্যে তিনি বললেন, 'তাহলে নিশ্চয়ই ফারগানার কোথাও হোজা নাসিরুদ্দীনের একই চেহারার কোন লোক রয়েছে। আমি আবারও বলছি—আসল, খাঁটি হোজা নাসিরুদ্দীন এখন এই এলাকায় দেখা দিতে পারেন না।'

বুড়ো লোকটি প্রশ্ন করল, 'কেন পারেন না, মুসাফির সাহেব?'

চা-খানার মালিকও এবার ওদের কথায় যোগ দিয়ে বলল, 'হোজা নাসিরুদ্দীন যদি সপ্তাহ খানেক আগে দূরের কোথাও ভ্রমণ করে থাকেন তাহলে আজ এখানে আসতে পারবেন না কেন? তাঁর জন্য দূরত্ব বলে কিছু নেই। একবার তিনি চার দিনে হিরাত থেকে সমরখন্দ চলে গিয়েছিলেন।'

হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'মুশকিলটা হচ্ছে কি জানেন, ভায়েরা, তিনি আজকাল আর সফর করেন না। আগেকার দিনের হোজা নাসিরুদ্দীন আজ আর নেই। তাঁর এখন একটা বড় সংসার! তিনি একটা বাড়ি কিনেছেন এবং সফরের কথা ভুলে গেছেন। তাঁর ধূসর রঙের গাধাটিও বাঁধা অবস্থায় খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি নিজেও আরাম-আয়াসে থাকতে থাকতে বেশ ভারী ও মোটা হয়ে গেছেন। তিনি বোকা ও অলস হয়ে পড়েছেন। লোকে চিনে ফেলবে এই ভয়ে কালো চশমা ছাড়া ঘর থেকে বাইরে যান না।'

'আপনি কি এর পরে বলবেন যে তিনি ভীরু কাপুরুষও বনে গেছেন? সবাই জানে যে তিনি কোনদিন কাউকে, কোন কিছুকে ভয় পাননি।'

হোজা নাসিরুদ্দীন অবজ্ঞায় বললেন, 'ওসব বেশিরভাগ মিথ্যা বড়াই। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর ষোলো আনার মধ্যে বারো আনাই একদম বানোয়াট।'

'বানোয়াট?' গর্জে উঠল কারিগর। 'হোজা নাসিরুদ্দীন সংক্রান্ত সব কাহিনীই যদি বানোয়াট হয় তবে আমাদের বদমাশ আমীর ওমরাদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন কে?'

রাখাল দু'জন, চা-খানার মালিক ও বুড়ো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপাটেপি করল।

এসব অশুভ ব্যাপার লক্ষ না করে হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'আমি তা জানি

না। শুধু এটা জানি যে তিনি এখন নিজের নাম ভাঁড়িয়ে উজাক বাই নাম নিয়েছেন। তিনি এখন…'

বাক্যটা পূরণ করতে পারলেন না তিনি। চা-খানার মালিক হুঙ্কার দিয়ে তাঁর পিঠে বসিয়ে দিল বিরাশি সিক্কা ওজনের এক কিল। জোয়ান রাখালটি সেই মুহূর্তে তাঁর দুই পাঁজরে হানতে লাগল ঘুসির পর ঘুসি, আর বুড়োটি দুর্বল মুঠিতে তাঁর দাড়ি আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাদের হোজা নাসিরুদ্দীন আর হোজা নাসিরুদ্দীন নেই এ কথাই তো তুই বলতে চাস, তাই না ব্যাটা বাচাল গোয়েন্দা?'

'হোজা নাসিরুদ্দীনের নামে কুৎসা গাইবার জন্য, তাঁর বদনাম করার জন্য এসব গোয়েন্দাদের রাস্তায় রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে,' এই কথা বলে কারিগরটিও ঝাঁপিয়ে পড়ল হোজা নাসিরুদ্দীনের ওপর। তার পুটুলির মধ্যে শক্ত ভারী কোনাওয়ালা কি একটা জিনিস ছিল। ওটার ঘা খেয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন কঁকিয়ে উঠলেন।

দুই হাতে মাথা, পাঁজর, বুক, পিঠে আঘাত ঠেকাতে ঠেকাতে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'থামো! কাকে পেটাচ্ছ তোমরা হোজা নাসিরুদ্দীনের নামে? তোমরা পেটাচ্ছ…'

হাড়-পাঁজরা বাঁচাবার জন্য তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চা-খানার মালিক তাঁকে সেই সুযোগ দিল না। আচমকা এক প্রচণ্ড লাথি মেরে হোজা নাসিরুদ্দীনকে সে রাস্তায় ফেলে দিল।

'ভাগ, ব্যাটা নোংরা শেয়াল। আর কখনও আমাদের এ গাঁয়ে নাক গলাস নে। যদি গলাস, তবে কসম খেয়ে বলছি, আমার বেড়ার সবগুলো খুঁটি আমি তোর পিঠে ভাঙব।'

একটি কথাও না বলে হোজা নাসিরুদ্দীন মাটি থেকে গড়িয়ে উঠলেন এবং গাধার পিঠে চেপে চটপট সরে পড়লেন সেখান থেকে।

এমনি করে শেষ হল নিজের নামের সঙ্গে তাঁর একক লড়াই।

তিন

কানা চোরের কাহিনী

মাইল খানেক এগিয়ে গাধার লাগাম টেনে ধরলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। গাধার পিঠ থেকে নেমে পথের পাশে একটা পাথরের ওপর বসলেন। অনেকক্ষণ ধরে বুক, পিঠ, ঘাড়, মাথায় হাত বুলালেন। 'আল্লাহ ওই বোঁটকাগন্ধী কারিগরটার হাত দুটো অবশ করুক। ওর সেই অভিশপ্ত পোটলাটার ভেতর কি ছিল, শিলনোড়া না হামান দিস্তা, কে জানে,' আহত স্থানে হাত বুলাতে বুলাতে নালিশ করলেন তিনি। আস্তে আস্তে কমে এল ব্যথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যথার কথা ভুলে প্রথমে তিনি হাসলেন মৃদুমৃদু, তারপর হো হো করে ফেটে পড়লেন অট্টহাসিতে। হাসি থামলে গাধাকে উদ্দেশ করে বললেনঃ

'শুনছিস, ওরে আমার বোকা গাধা, এরইমধ্যে হোজা নাসিরুদ্দীনের নামে আমাকে মার খেতে হল। এখন শুধু বাকি রইল হোজা নাসিরুদ্দীনের সুনাম রক্ষার জন্য আমার ফাঁসি হওয়া।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই একটা ক্ষীণ কাতর ধ্বনি কানে এল তাঁর। গাধাও হঠাৎ কান খাড়া করে স্থির হয়ে গেল। ডান দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন একটি ঝোপের মধ্যে কাপড়ে মাথা ঢেকে পড়ে আছে একটা লোক।

'তোমার কি হয়েছে, মিঞা? এখানে পড়ে আছ কেন? এমন করুণ সুরে কাতরাচ্ছ যে শুনে মনে হচ্ছে তোমার পরান পাখি যেন খাঁচা ছেড়ে যায়?'

কান্না জড়ানো সুরে লোকটি বলল, 'সত্যি খাঁচা ছেড়ে যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে মিনতি করছি যেন তাড়াতাড়ি যায়। আমার কষ্ট আর যাতনা অসহ্য।'

হোজা জানতে চাইলেন, 'কতদিন ধরে এ কঠিন রোগে ভুগছ তুমি?'

'পাঁচ বছর ধরে। প্রতি বসন্তে, ঠিক এই সময়টাতে হিংস্র জানোয়ারের মত রোগটা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর। এটাকে এড়াবার জন্য চিকিৎসা হিসাবে

আমাকে একটা কাজ করতে হয়। এবার সময় মত কাজটা করতে পারিনি। ফলে এখন আমি পথের পাশে পড়ে আছি।'

'ঘাবড়াবার কারণ নেই। আমি তোমাকে সাহায্য করব। কাছাকাছি কোন গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে হেকিম ডাকব।'

'না, না, হেকিমের দরকার আমার হয় না।' বলতে বলতে লোকটি উঠে বসল, মাথার ওপর থেকে কাপড় সরাল। দেখা গেল তার মুখটা চ্যাপ্টা চওড়া। দাড়ি-গোঁফের চিহ্নও নেই, নাকটা বাঁকানো, দুই চোখের একটি ঘোলাটে ও দৃষ্টিহীন—অন্যটি হলদেটে ও গোলাকার। এই চোখটির দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। লোকটা অনুনয় করে বলল, 'আমাকে কোন গাঁয়ে নিয়ে চলুন। সেখানে মানুষজনের মধ্যে আমার যন্ত্রণা কমবে।'

হোজা নাসিরুদ্দীন তাকে গাধার পিঠে চাপিয়ে পরবর্তী এক গাঁয়ে পৌছলেন। গাঁয়ের চা-খানায় তাকে শুইয়ে রেখে স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে আগা বেক ও তার ভ্রূদের খোঁজ খবর নেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারল না। এমন সময় কে যেন তাঁর পিঠে হাত ছোঁয়াল। পেছন ফিরে তাকিয়েই তিনি অবাক। এক গাল হাসি নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই রুগ্ন কানা লোকটি, যার কিনা মাত্র ঘন্টা খানেক আগেই ছিল প্রায় যায়-যায় অবস্থা। বিস্মিত হোজা বললেন, 'একি তুমি, আমার রুগ্ন সাথী?'

'জ্বি হ্যাঁ, আমি,' বলল কানা। 'এখানে বসে বসে সময় নষ্ট করে আমাদের কি লাভ? চলুন, আমরা এখন রওনা হই।'

'চলো, কিন্তু তোমার রোগ সারানর কি হবে? আমি তো হেকিমের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'রোগ আমি হেকিম ছাড়াই সারিয়ে ফেলেছি।' হাসিমুখে জবাব দিল সে।

কিভাবে রোগ সারাল সেটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন বেরিয়ে পড়লেন। সরু পাথুরে রাস্তা। দু'দিকে পাহাড়। বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস। আগে আগে তিনি, পেছনে তাঁর কানা সাথী। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলেন তিনি। কানা চঞ্চল হয়ে উঠল, চলার গতি বাড়িয়ে বার বার তাকাতে লাগল পেছনে। কয়েক পা এগিয়ে সে বলল, 'রাস্তা থেকে নেমে ওই পাথরগুলোর আড়ালে একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভাল হত।'

'বিশ্রাম নিতে হলে রাস্তার পাশেই তো নেওয়া যায়, পাথরের আড়ালে কেন?'

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে শরীরটা কাঁপিয়ে কানা বলল, 'এখানে তীব্র হিমেল হাওয়া, আমার খুব শীত লাগছে।'

তাঁদের কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই পেছন থেকে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার তীরবেগে ছুটে এসে ঘিরে ফেলল দু'জনকে। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে ওরা পাকড়াও করল তাঁদেরকে। চা-খানার মালিক ঘাঁটতে লাগল হোজার পোটলা-

পুঁটলি। বিস্মিত হোজা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমার পোটলা-পুঁটলি ঘাঁটছ কেন?'

ক্রুদ্ধ গর্জনে লোকটা বলল, 'চুপ, হারামজাদা চোর! আমার নতুন কেনা নকশা করা তামার হাঁড়িটা চুরি করে পালাচ্ছিস!'

'তোমার হাঁড়ির কি ঠ্যাং গজিয়েছে যে ওটা লাফ দিয়ে আমার পুঁটলির মধ্যে ঢুকে পড়ল?' জবাব দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'ঠ্যাং গজিয়েছে কিনা এখনি দেখা যাবে,' বলতে বলতেই লোকটা একটা পুঁটলির ভেতর থেকে চকচকে তামার হাঁড়িটা বের করে ফেলল।

আর যায় কোথায়। শুরু হল পাইকারি মার আর অকথ্য গালিগালাজ। বেদম মারের চোটে দু'জনকে ধরাশায়ী করার পর ঘোড়সওয়ারেরা ফিরে গেল আপন গাঁয়ে। ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে।

ধূলি শয্যা ছেড়ে প্রথমে উঠে বসলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। গাধাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এখন আমি বুঝেছি কেন আজ সকালে তুই বড় রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথে নেমে গিয়েছিলি। ওরে বেজন্মা, তুই কি ভেবেছিলি আমার পিরানটা খুব বেশি ময়লা হয়ে গেছে? কিন্তু এটা মনে রাখিস, তৃতীয়বার যদি কেউ কোথাও আমার পিরান গা থেকে না খুলে পিটিয়ে ধুলো ময়লা ঝাড়তে শুরু করে তাহলে তোর কপালে দুঃখ আছে। আমি তোকে কসাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে তোর চামড়া ছাড়িয়ে নেব, তারপর ওতে লবণ মেখে লোহার শিক গেঁথে রোদে শুকাব।' গাধা নিরীহভাবে তাকিয়ে রইল মনিবের দিকে, যেন এসব হুমকি তার কানেই যায়নি।

কানা মরার মত পড়ে ছিল। হোজা নাসিরুদ্দীন ঘাড় ধরে ধাক্কা দিতেই ভীত চোখে তাকিয়ে সে বলল, 'ওরা চলে গেছে? আমি ভেবেছিলাম বিশ্রাম নিচ্ছে। যাক, ওদের পায়ে জুতা না থাকায় ভালই হল।'

'এরমধ্যে ভাল কি দেখলে তুমি?' ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন হোজা।

কানা জবাব দিল, 'পায়ে জুতা না থাকলে লোকে পায়ের গোড়ালি দিয়ে লাথি মারে। গোড়ালির লাথির জোর পায়ের সামনের দিকের লাথির চেয়ে অনেক কম।'

'তোমার জানা থাকার কথা,' বললেন হোজা।

কানা বলে গেল, 'পাঁজরের দফারফা হয়ে যায় কানিবাদামের বুটের লাথিতে। ওখানকার মুচিরা আগার দিকটায় ফ্যাশনের জন্য খুব শক্ত চামড়ার তলি লাগায় কিনা—তাই।'

'পাঁজরে কানিবাদামের বুটের লাথি খেয়ে আমি কখনও পরখ করে দেখিনি এবং দেখার ইচ্ছাও আমার নেই। এখানেই, এই মুহূর্তে এবং চিরকালের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক,' এই বলে হোজা নাসিরুদ্দীন গাধার পিঠে চেপে গাধাকে সঙ্কেত দিলেন এগিয়ে চলার।

কানা হঠাৎ কেঁদে উঠল হু হু করে। ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পথ আটকাল হোজা নাসিরুদ্দীনের। দু'হাত তুলে কেঁদে বলল, 'আমার কথাটা শুনুন! দুনিয়ার

কেউ আমার আসল কথাটা জানে না। আপনার পায়ে পড়ি, দয়া করে শুনুন আমার কাহিনী। তারপরে অনেক কিছুই আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

বুকে কিল দিতে দিতে কান্না জড়ানো স্বরে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি চোর, জঘন্য চোর। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার চুরির জন্যে আমার চাইতে বেশি কষ্ট আর কেউ পায় না। দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে আমার দুঃখ বুঝবে।'

লোকটার কান্না, আবেগ ও উচ্ছ্বাস আন্তরিক ও খাঁটি মনে হল হোজার। তিনি তার কাহিনী শুনতে রাজি হলেন।

কানা বলে গেল, 'মায়ের কোলে থাকতেই চুরি করার এক অদম্য ইচ্ছায় আমি ছটফট করতাম। হাঁটতে শেখার পর আমি আমাদের ঘরে রীতিমত হুলস্থুল বাধিয়ে দিলাম। এখানকার জিনিস ওখানে, ওখানকার জিনিস সেখানে সরিয়ে লুকিয়ে রাখতাম। পাঁচ বছর বয়সে আমি হলাম একজন পাক্কা জুয়াড়ী। আমার দ্বারা মা-বাপ ফতুর হয়ে গেলেন। সাত বছর বয়সে আমি গাঁজা ধরি এবং এক জুয়ার আড্ডায় যোগ দিই। ঘরে হাতাবার মত কিছু না থাকায় শেষে পড়শীদের ঘরে হাত বাড়াই। আমার হাত সাফাইয়ের দক্ষতায় দুই প্রতিবেশী সর্বস্বান্ত হয়। কোন রকমের তালা বা হুড়কো আমার জন্য বাধা হতে পারেনি। অতিষ্ঠ হয়ে বাপ আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। বাপের শেষ পিরানটি আর শেষ সম্বল ছাব্বিশটি টাকা চুরি করে আমি বেরিয়ে পড়ি। তারপর কি করি কোথায় যাই সেই লম্বা কাহিনী বলে আপনাকে বিরক্ত করব না, তবে শুধু এইটুকু বলব যে আমি মাদ্রাজ, হিরাত, কাবুল এবং বাগদাদে ছিলাম। সব জায়গাতেই চুরি করি, চুরিই ছিল আমার একমাত্র পেশা। অহঙ্কার ছাড়াই বলছি, এই লজ্জাজনক চুরি বিদ্যায় আমার জুড়ি গোটা মুসলিম বিশ্বে আর কেউ নেই।'

হোজা নাজিরুদ্দীন বাধা দিয়ে বললেন, 'তাহলে সেই বিখ্যাত বাগদাদী চোর যার কত আশ্চর্য কাহিনী শুনেছি, তার চেয়েও কি বড় চোর তুমি?'

হেসে ফেলল কানা, বলল, 'তাহলে জেনে রাখুন, জনাব, আমিই সেই রূপকথার বাগদাদী চোর।'

হোজা নাসিরুদ্দীনের ওপর এ কথাটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্য কিছুক্ষণ থেমে সে আবার বলল, 'আমার দুঃসাহসিক কার্যকলাপের যে সব গল্প প্রচারিত হয়েছে তার বেশির ভাগই কল্পিত, তবে কিছু কিছু সত্য। আঠারো বছর বয়সে আমি যাই সেই অতুল ঐশ্বর্য ও তার বোকা মালিকদের বিশাল শহর বাগদাদে। বাগদাদের ব্যবসায়ী ও ধনীদের ঘরে ঘরে হানা দিয়ে শেষকালে আমি ঢুকে পড়ি খোদ খলিফার ধনাগারে। সত্যি কথা বলতে গেলে ওখানে ঢোকা মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। খলিফার ধনাগারের পাহারায় ছিল তিনজন দানব আকারের নিগ্রো। ওদের প্রত্যেকেই খালি হাতে একেকটি ষাঁড়ের সাথে লড়তে পারত। ওদের ভয়ে চোর-ডাকাত কেউ ঘেঁষত না সেদিকে। কিন্তু আমি জানতাম যে ওদের একজন

ছিল বদ্ধ কালা—বাজ পড়ার শব্দও শুনত না। দ্বিতীয় জন ছিল পাঁড় গাঁজারু, সব সময় বসে বসে ঝিমাত। আর তৃতীয় জন ছিল একেবারে ভীতুর ডিম, রাতের বেলা একটা ব্যাঙ-এর নড়াচড়ার শব্দ পেলেই ভয়ে সে দিশেহারা হয়ে যেত। আমি করলাম কি, একটা লাউয়ের খোলা যোগাড় করে ছুরি দিয়ে ওতে মানুষের চোখ ও হাঁ-করা মুখের আকারে ছিদ্র করলাম। তারপর একটা লম্বা লাঠির মাথায় ওটাকে বসিয়ে লাঠিটার গায়ে একটা সাদা আলখেল্লা ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর লাউয়ের ভেতর একটা কুপি জ্বেলে দিয়ে চলে গেলাম ভীতু নিগ্রোটা যেখানে পাহারা দেয় তার সামনা-সামনি এক ঝোপের আড়ালে। রাতের আঁধার জমে উঠতেই লাউয়ের খোলাটাকে একবার ওপরে একবার নিচে নামাতে লাগলাম। ওই দৃশ্য দেখেই নিগ্রো দানবটি কুপোকাত, সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা ও পতন। আমাকে আর পায় কে। এক লহমায় সবগুলো তালা খুলে আমি ঢুকে গেলাম খলিফার কোষাগারে। সোনাদানা ইচ্ছে মত হাতিয়ে সটকে পড়লাম অক্ষত শরীরে। পরদিন সকালেই এই দুঃসাহসিক চুরির খবর গোটা বাগদাদ শহরে এবং সেখান থেকে সারা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ল, আর আমি হয়ে গেলাম বিখ্যাত।'

'কিন্তু লোকে যে বলে বাগদাদী চোর পরে খলিফার মেয়েকে বিয়ে করেছিল?' প্রশ্ন করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'ওসব স্রেফ মিথ্যে, গুলতানি। মেয়েদের আমি দুচোখে দেখতে পারি না। তাদের সামান্য জিনিসে হাত দিলেই এমন চেঁচামেচি জুড়ে দেয় যে একেবারে ঘেন্না ধরে যায়।'

'আচ্ছা', পেশাগত কাজে ঘুরে বেড়াবার সময় কোনদিন কি হোজা নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?' জানতে চাইলেন হোজা।

'হয়েছে কখনও কখনও,' জবাব দিল কানা। 'মূর্খ আর অজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই তাঁর কাজকে আমার কাজ এবং আমার কাজকে তাঁর কাজ বলে মনে করে। কিন্তু আমাদের দু'জনের কোন কিছুতেই মিল নেই। সমরখন্দে একবার তাঁর দেখা পেয়েছিলাম। একদিন বাজারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ লোকের কানাকানি শুনলামঃ 'হোজা নাসিরুদ্দীন! হোজা নাসিরুদ্দীন!' লোকের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম মাঝ-বয়সী সাধারণ চেহারার একজন মানুষ একটি ছাইরঙা গাধার লাগাম ধরে এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি একটি পিরান কিনেছেন এবং দাম দিতে যাচ্ছেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'এ লোকটিই সেই মশহুর হোজা নাসিরুদ্দীন। শান্তি ভঙ্গকারী। যাঁর নামে কেউ আশীর্বাদ দেয়, আর কেউ বা দেয় অভিশাপ!' হঠাৎ তাঁর নতুন কেনা পিরানটি ছিনতাই করার এক শয়তানি প্ররোচনা আমি অনুভব করলাম। ভাবলাম, 'আমিই হব দুনিয়ার একমাত্র চোর যে হোজা নাসিরুদ্দীনকেও রেহাই দেয়নি বলে গর্ব করতে পারে।' এই না ভেবে পেছন দিক দিয়ে চুপি চুপি গিয়ে আমি গাধার লেজের গোড়ায় নিচের দিকটায় একটা লাল

মরিচ ভেঙে লাগিয়ে দিলাম।

'হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে জ্বলে ওঠায় গাধাটা প্রথমে লাফাতে শুরু করল এবং তারপর আতঙ্কে তীব্র ডাক ছেড়ে হোজা নাসিরুদ্দীনের হাত ছাড়িয়ে ছুট দিল এক দিকে। গাধার লাথিতে উল্টে গেল পথের ধারে সাজানো দোকান-পশরা, পথের ধুলোয় ছড়িয়ে পড়ল রুটি, খোবানি ও আরও নানা ফলমূল। হোজা নাসিরুদ্দীন দৌড়াতে লাগলেন গাধার পিছে পিছে। বেধে গেল তুমুল হৈ-চৈ, হট্টগোল। সেই সুযোগে আমি বিনা বাধায় দোকানের কাউন্টার থেকে পিরানটি তুলে নিয়ে চম্পট দিলাম।'

'তাহলে তুই-ই ছিলি সেই বেল্লিক, বেহায়া, বেতমিজ শয়তান!' চেঁচিয়ে উঠলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। 'আল্লাহ সাক্ষী, আর কেউ কোনদিন আমার ওপর অমন চাতুরি করতে পারেনি। ধরতে পারলে সেদিন তোর যা হাল হত তার সঙ্গে তুলনা করলে কানিবাদামের বুটের লাথিও তোর কাছে ফুলের ছোঁয়ার মত আরামের মনে হত।'

মুহূর্তের রাগের বশে তিনি নিজের পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছেন। কানা চোর এখন জেনে গেছে নিয়তি তাকে কার সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছে। সে তক্ষুণি হাঁটু গেড়ে বসল এবং দুই হাতে হোজার পিরানের প্রান্তভাগ তুলে ধরে ওতে ভক্তের ন্যায় চুমো দিতে লাগল। ওর হাত থেকে পিরানের প্রান্তটা এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিয়ে হোজা বললেন, 'ছাড়ো, যেতে দাও আমাকে। এটা কি হচ্ছে? তোমরা সবাই কি আমাকে মহাপুরুষ বানাবার ষড়যন্ত্র করেছ? আমি সাধু-সন্ত ফকির দরবেশ কিছুই নই, একজন সাধারণ মানুষ!'

কানা বারে বারে আওড়াতে লাগল, 'পবিত্র হোক এই রাস্তা। এখানে আমি আপনার দেখা পেয়েছি। আমাকে সাহায্য করুন, আপনার হাতেই আমার মুক্তি।'

অগত্যা হোজা নাসিরুদ্দীনকে চোরের বাকি কাহিনী শুনতে হল।

'আমার জীবন স্রোত বয়ে চলল খরবেগে। পাপের সাগরে আমি সাঁতার কাটতে লাগলাম। তারপর একদিন আমি রেশমের শহর মার্গেলানে শয়তানের উস্কানিতে এক আফগানের কোমরবন্ধে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। আফগান আমাকে ধরে ফেলল। আমি হেঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে দিলাম এক দৌড়। গোটা বাজারের লোক আমাকে তাড়া করল। জালে পড়া খরগোশের মত এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে আমি ঢুকলাম এক গলিতে। গলিতে ঢোকা মাত্রই কাঁপা কাঁপা স্বরে কে যেন আমাকে বলল, 'এখানে লুকিয়ে থাকো।' তাকিয়ে দেখলাম এক বুড়ো ফকির, রাস্তার ধারে বসা। তাঁর দেওয়া পিরানে গা ঢেকে আমি মুখ নিচু কর বসে পড়লাম তাঁর জায়গায়, আর তিনি রাস্তা পার হয়ে গিয়ে বসলেন আমার দিকে মুখ করে। আমার অনুসরণকারীরা দু'জন ফকির বসে আছে দেখে থামল না সেখানে, ছুটে চলে গেল সামনের দিকে। ওরা চলে যেতেই ফকির আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর ছোট্ট ঝুপড়িতে। তিনি আমাকে ধিক্কার দিলেন। চুরি যে কি ঘৃণ্য কাজ তা বুঝিয়ে

দিলেন এবং পাপের জীবন থেকে আমার মুক্তির পথ দেখালেন।'

'সেই ফকিরটি কি তোমাকে মানুষের আত্মার তারকালোকে বিচরণের এক লম্বা কাহিনী বলেছিলেন এবং শেষ রাতে মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কি তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

কানা ভয় পেয়ে বলল, 'হুজুর, আপনিই কি সেই ফকির? তাহলে, লোকে যে বলে আপনি ইচ্ছামত যে-কোন জিনিসের রূপ ধরতে পারেন সে কথা কি সত্য?' জবাব না দিয়ে হোজা আদেশ দিলেন, 'তোমার কাহিনী বলে যাও। জ্ঞানী ফকিরের দেখান পুণ্যের রাস্তায় তুমি কেন গেলে না?'

আক্ষেপ করে কানা বলল, 'আমার কপালের দোষ। ফকিরের উপদেশে আমার ভুল ভেঙেছিল। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আর চুরি করব না, ভাল হয়ে যাব, সৎ জীবনযাপন করব। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর আমি সৎ জীবন শুরু করার জন্য কোকন্দ-এর দিকে রওয়ানা হলাম। স্থির করলাম, একটা চা-খানা খুলব। ওতেই আমার একজনের দিন চলে যাবে। মুনাফা যা হবে তা গরীব-দুঃখী আর এতিমদেরকে দিয়ে দেব। কিন্তু এতে একটা সামান্য অসুবিধা দেখা দিল। আমার কাছে যে চার হাজার টাকা ছিল ওটা দিয়ে দোকান কেনা, মেঝেতে বিছানর জন্য কার্পেট, বাসন-পত্র পেয়ালা ইত্যাদি কেনা হয়ে যেত। কিন্তু আমি ভাবলাম, খদ্দের আকর্ষণের জন্য গায়ক বাদক না রাখলে চলবে না। এজন্য শ' তিনেক টাকা দরকার—যা আমার ঘাটতি। এখানেই শয়তান সুযোগ পেয়ে গেল। পুণ্যের জীবনে আমার যাত্রার পথে সে তার রোঁয়া ওঠা পিচ্ছিল লেজটি পেতে রাখল, আর আমি সেটার ওপর পা দিয়ে চিৎপটাং হলাম। আমি ভাবলাম যে শেষ বারের মত একদান জুয়া খেলে এই টাকাটা জিতে নেব। পুণ্যের জীবন শুরু করার জন্যই এই পাপটি আমি করব। আল্লাহ নিশ্চয়ই এটা মাফ করবেন।'

'তারপর তুমি আরেক কোকন্দ যাত্রীর সঙ্গে জুয়া খেলতে বসলে। সারা রাত খেললে। সকালে দেখা গেল তোমার পকেটে একটি কপর্দকও নেই। তোমার চার হাজার টাকা তো গেলই, তার ওপর তোমার জুতা, পিরান, টুপি, কোর্তা, সবই খুলে দিতে হল। রইল কেবল তোমার পায়জামাটি।'

'কি আশ্চর্য! আপনি আমার কোর্তা খুলে দেওয়ার কথাও জানেন? তাহলে তো এটা সত্য যে আপনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সবই বলে দিতে পারেন?' বিস্মিত হয়ে বলল কানা।

'তোমার একটি মাত্র চোখে তোমার অতীত ছাড়া আমি আর কিছুই দেখছি না, ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে তোমার কানা চোখের পাতার আড়ালে। বলে যাও তোমার কৈচ্ছা।' (জুয়া খেলাটা সেই চা-খানায় বসে হোজা দেখেছিলেন।)

'এরপরে আমি কি করতে পারতাম? সৎ জীবনযাপনের স্বপ্ন বিসর্জন দিতাম?

কিন্তু আমার মন বলল, না! আমাকে সৎ পথে চলতে হবে। আমি ঠিক করলাম সৎ পথে চলার জন্য আরেকটি পাপ কাজও যদি করতে হয় করব, তবু সংকল্প ত্যাগ করব না। কোকন্দে পৌঁছলাম। সেখানে যা শুনলাম তাতে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। কোকন্দের সিংহাসনে বসেছেন এক নতুন খান। তাঁর কঠোর ও কট্টরপন্থী শাসনে এককালের চোর-জোচ্চোরদের লীলাক্ষেত্র কোকন্দ শহর তখন তাদের জন্য মরুভূমি। নতুন খান চোর-জোচ্চোরদের বন্ধু ঘুষখোর সাবেক কোতোয়ালকে বরখাস্ত করে কামিল বেক নামে এক উগ্র মেজাজী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী রইসকে তাঁর জায়গায় বসিয়েছেন। নয়া কোতোয়াল খানের প্রিয়পাত্র হবার জন্য শপথ নিয়েছেন যে শহর থেকে তিনি চুরির মূল সুদ্ধ উপড়ে ফেলবেন। আমি যে সময় কোকন্দে গেলাম তখন সেখানে চুরি একদম বন্ধ। ভয়ঙ্কর চেহারার পাহারাদার আর ধূর্ত গোয়েন্দারা শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন চোর ধরা পড়লে তার ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলা হচ্ছে এবং তার কপালে লোহা পুড়ে দাগ দেওয়া হচ্ছে। চোরাইমাল যারা রাখে তাদেরও একই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় পড়ে আমি কয়দিন ধরে ভাবলাম কি করা যায়, কিভাবে সৎ জীবন-যাপনের মূলধন যোগাড় করব। কোন বুদ্ধি মাথায় না আসায় আমি চলে গেলাম কোকন্দের বাইরে বিখ্যাত দরবেশ বাবা তোরা খানের মাজারে। তখন বাবা তোরা খানের বার্ষিক উৎসবের সময়। শয়তান আমাকে প্ররোচনা দিল, "এই উৎসবের সুযোগে তুই তোর কাজ হাসিল কর।" শয়তানের উসকানিতে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাপ কাজটি করলাম। এখানেও আমি চুরি করলাম। চুরি করে যা পেলাম তাতে দুটো চা-খানা চালু করতেও আমার কষ্ট হবার কথা ছিল না। খুশি মনে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমার ডেরায়। তারপরই ঘটল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা। হঠাৎ গুম গুম আওয়াজের সঙ্গে দুলে উঠল আসমান-জমি, ঘরবাড়ি গাছপালা। কড়-কড়াৎ শব্দে ফেটে গেল মাটি। অদ্ভুত এক কাঁপা কাঁপা আলোয় উদ্ভাসিত হল আমার আঁধার কুঠুরি। সেই ভূতুড়ে আলোয় আমি দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং দরবেশ তোরা খান। ক্রোধে রক্তিম তাঁর মুখ, চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা। বজ্র গম্ভীর স্বরে আমাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "ওরে পাপাত্মা শয়তান! তুই আমার এলাকায় চুরি করেছিস! তোর এতই সাহস? তোর প্রতি আমার এই অভিশাপঃ আজ থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চুরিই তুই করবি। চুরিকে তুই ঘৃণা করবি, কিন্তু চুরি না করে তুই পারবি না। প্রতি বছর এই সময়ে, আমার বার্ষিক উৎসবের ঠিক আগে, তোর পেটে অসহ্য ব্যথা হবে, আর সেই ব্যথা চুরি করা ছাড়া আর কোন কিছুতেই সারবে না। সারা বছর ভাল কাজ আর সৎ জীবনযাপন করলেও এই সময়ে পেটের ব্যথা থেকে বাঁচার জন্য তোকে চুরি করতেই হবে। ফলে তোর গোটা বছরের সৎ কাজের ফল নষ্ট হয়ে যাবে। এইভাবে তুই শাস্তি ভোগ করে যাবি তোর পাপ-ক্ষয় হওয়া পর্যন্ত। আমার

অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ তোকেই খুঁজে বের করতে হবে।"

'কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পলকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন তোরা খান। হুড়মুড় শব্দ করে ভেঙে পড়ল আমার কুঠুরি। আমি আতঙ্কে ছুটে বেরুলাম রাস্তায়। আমার চোরাইমাল সব চাপা পড়ল ধ্বংস স্তূপের নিচে।'

হোজা নাসিরুদ্দীনের মনে পড়ল, বছর পাঁচেক আগে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প এবং তার সাথে ঝড় আর বজ্রপাতে কোকন্দ এলাকায় অনেক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তিনি বুঝলেন যে কানা সেই ভূমিকম্পের কথাই বলছে। তীব্র অনুশোচনা আর পাপ বোধের দরুন সে নিজেকেই সেই ভূমিকম্পের কারণ বলে ভেবেছে। চরম আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে প্রায় অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে দরবেশ তোরা খানের ছায়ামূর্তি দেখেছে সে এবং তাঁর অভিশাপ বাণী শুনেছে। তখনকার মানসিক অবস্থায় একজন অশিক্ষিত চোরের এরকম দৃষ্টি ও শ্রুতি বিভ্রম খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ কথা চোরকে না বলে তিনি মন্তব্য করলেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভূমিকম্পটা তোমার কারণেই ঘটেছিল।'

কানা স্বীকার করল যে তারই কারণে ভূমিকম্পটা ঘটেছিল। সে বলল, 'পরে জেনেছি, তোরা খানের পাথরে বাঁধান কবর ঠিক মাঝখানটায় ফেটে গিয়েছিল। তিনি নাকি ভীষণ রেগে গিয়ে আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই দিন থেকে আমার দুর্দশার শুরু। প্রতি বছর তোরা খানের বার্ষিক উৎসবের সময়টায় আমি পেটের ব্যথায় নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করি। চুরি ছাড়া আর কোন উপায়ে তা থেকে রেহাই পাই না। এখন নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন কেন আমি বলেছিলাম যে আমার হেকিমের দরকার হবে না। আপনি এটাও বুঝতে পারছেন রোগ সারাবার জন্য আমাকে কি কাজটি করতে হয়, তামার হাঁড়িটাই বা কেমন করে আপনার পুঁটলির মধ্যে ঢুকল।'

হোজা মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এখন আমি বুঝলাম।'

কানার বর্ণিত তোরাখান সম্পর্কে এখানে দু'টি কথা বলে নেওয়া দরকার। কোকন্দের উপকণ্ঠে একটা নিচু মাঠের মধ্যে তোরা খানের মাজার। প্রাচীন কিংবদন্তী বলে, তিনি ছিলেন একজন এতিম। পাঁচ বছর বয়সে মা-বাবাকে হারান। সেই বয়সে কোকন্দের বাজারে ভিক্ষা করে বাঁচার লড়াই শুরু করেন। দুঃখ-দারিদ্র্যের তিক্ত পেয়ালা আকণ্ঠ পান করতে করতে হৃদয় তাঁর হয়ে ওঠে তিক্ত এবং পাথরের মত কঠিন। গরীবের প্রতি, বিশেষত শিশুদের প্রতি যাদের কোন দয়ামায়া নেই সেসব হৃদয়হীন ধনীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে তিনি বড় হয়ে ওঠেন।

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি এক কারাভাঁর সাথে চলে যান কোকন্দ ছেড়ে। ফিরে আসেন চল্লিশ বছর বয়সে। ওই সময়টা তাঁর কাটে ভারতে আর তিব্বতে। চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নে। লোকে বলে. তাঁর হাতের স্পর্শেই নাকি মানুষের রোগ

সেরে যেত। ধনী রোগীদের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া হারে ফি নিয়ে ওই অর্থ তিনি ব্যয় করতেন গরীব দুঃখী শিশুদের জন্য।

কোথাও বেরুলেই নানা বয়সের একদল শিশু জুটে যেত তাঁর পেছনে। পকেটে টাকা থাকলে যে-কোন দোকানে গিয়ে খেলনা, মিঠাই যত আছে কিনে নিয়ে তুলে দিতেন ছোট্ট বন্ধুদের হাতে। টাকা সঙ্গে না থাকলে এবং কোন অধ-নগ্ন বাচ্চার দেখা পেলে ওকে কোলে তুলে নিতেন। জামা-জুতো-টুপির দোকানে গিয়ে বলতেন, 'দান কর।' তাঁর কঠোর দৃষ্টি সহ্য করতে পারত না দোকানিরা। বাচ্চাটিকে জামা-জুতো-টুপি পরিয়ে দিত। দামের কথা বলত না। কারণ, ওরা বিশ্বাস করত যে এই লোকটি রোগ সারাতে ওস্তাদ ঠিকই, আবার রেগে গেলে দয়ামায়াহীন লোকদের দেহে রোগ চালান দিতেও পারে।

তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যের সব শিশু হাপুসনয়নে কাঁদে। হাজারে হাজারে তাঁর লাশের সঙ্গে গোরস্থানে যায়। কিন্তু গোঁড়া মোল্লা-মুদাররিসরা তাঁকে আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের অন্যতম বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, লোকটা ধর্মকর্ম করত না। ইসলামের নিয়ম-কানুন মানত না। মসজিদ ও পীরদের মাজারের জন্য দান করত না। বলত, জিন্দা গরীবদের টাকার দরকার মুর্দা পীরদের চাইতে বেশি। কাজেই, লোকটা ছিল ধর্মদ্রোহী।

কিন্তু সাধারণ মানুষ, গরীবরা, আর শিশুরা তোরা খানকে দরবেশ বানিয়ে ফেলে। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে। তোরা খানের মৃত্যু বার্ষিকী শিশুদের জন্য এক মহা উৎসব। ওই উৎসবের রাতে শিশুরা নানা উপহার পায়। লোকের বিশ্বাস, তোরা খানই সকলের দ্বারে দ্বারে গোপনে এসব উপহার রেখে যান।

তোরা খানের কাহিনী বর্ণনা এখানেই স্থগিত থাক। আমরা ফিরে যাই কানা চোরের বর্ণনায়। কানাচোর বলে গেলঃ

'তারপর বহুবার আমি তোরা খানের মাজারে গিয়ে কান্নাকাটি করে মাপ চেয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অভিশাপ কাটেনি, বাৎসরিক পেটের ব্যথা থেকে আমি মুক্তি পাইনি।'

হোজা নাসিরুদ্দীন এতক্ষণে তাঁর কানা সঙ্গীটির রোগের আসল প্রকৃতিটা বুঝে ফেলেছেন। স্ব-প্রণোদিত স্থির ধারণা থেকেই এ রোগের উৎপত্তি হয়েছে। হেকিমশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ইবনে সিনার রচনা হোজা পড়েছেন। ইবনে সিনা বলেছেন মানুষের দেহ আর মনের গভীর সম্পর্কের কথা। দেহের গোলমাল মনকে প্রভাবিত করে। আবার মনের গোলমাল দেহকে প্রভাবিত করে। কাজেই, কানাকে সৎ কাজে লাগিয়ে ওর মন থেকে ক্রমে পাপবোধ ও অভিশাপ ভীতি দূর করতে হবে। তাহলে শেষে ওর রোগটিও সেরে যাবে। এই ভেবে তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন তুমি কি করবে বলে ঠিক করেছ?'

'আমি এখন আপনার উপদেশের অপেক্ষায় আছি।'

হোজা ভাবলেন এই কানা চোরটিকে খোজেন্ত-এর সেই বুড়ো ফকিরই তাঁর সাথে জুটিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই ফকিরের হ্রদ উদ্ধারে লোকটা কাজে লাগবে। তাই তিনি ওকে বললেন, 'ঠিক আছে, চলো আমার সঙ্গে। দেখি আমরা দু'জনে মিলে বাবা তোরা খানের রাগ কমাতে পারি কিনা। তবে তোমাকে শপথ করতে হবে যে আমার অনুমতি ছাড়া ভবিষ্যতে আর কখনও তোমার ওই রোগ সারানর কর্মটি করবে না।'

কানাকে নিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন চলে গেলেন তোরা খানের মাজারে। স্থানটি কোকন্দের দক্ষিণ উপকণ্ঠে, একটা নিচু জায়গায়। কানা সোজা চলে গেল মাজারের পাশে। শুরু করল বিলাপ, 'হে দয়ালু! আল্লার নামে আমাকে মাফ করো!'

তার কান্না শুনে বেরিয়ে এল মাজারের অতি বৃদ্ধ, লোলচর্ম খাদেমটি। পরনে শতচ্ছিন্ন পোশাক। হাড়-জিরজিরে শরীর। মুখে হাজার বলিরেখা। চোখে লুকান আগুনের শিখা।

হোজা এগিয়ে গেলেন খাদেমের দিকে। দু'জনে বসলেন একটা গাছের ছায়ায়। কুশল জিজ্ঞাসার জবাবে খাদেম বললেন, 'আমাদের ফকিরী জীবন। সকল কামনা-বাসনা রহিত করে, সকল আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ অবদমিত রেখে, দেহকে অস্বীকার করে আত্মার সাধনা। এই দুঃখের, মিথ্যার, হিংসার পৃথিবীতে জীবন তো এটাই।'

'এটা জীবন নয়—কায়াহীন ছায়া,' প্রতিবাদ করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। 'জীবন হচ্ছে একটা সংগ্রাম, নিজেকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা নয়।'

'হে পথিক! বাহ্যিক জীবন সম্পর্কে আপনার কথাই ঠিক,' বললেন খাদেম। 'কিন্তু আত্মিক জীবন বলেও একটি জিনিস আছে। সেই জীবনের ওপর কারও ক্ষমতা খাটে না। মানুষকে জীবনব্যাপী দাসত্ব আর স্বাধীনতা—এ দু'য়ের একটিকে বেছে নিতে হবে। শেষেরটি অর্জিত হতে পারে একমাত্র আত্মিক জীবনে। সর্ব কামনা-বাসনা-চাহিদা বিসর্জনের মাধ্যমে।'

'আপনার মনে ব্যথা দিতে চাই না হে দরবেশ! কিন্তু আপনার যুক্তি মানলে বলতে হয় যে মুর্দারা আপনার চাইতেও স্বাধীন। কারণ দুনিয়ার কাছে আপনার যেটুকু দাবি এখনও রয়ে গেছে সেটুকুও তাদের নেই। এক ঢোক পানিরও দরকার নেই মৃতদের। জীবনের বিনাসে—মৃত্যুতেই কি মানুষকে পেতে হবে স্বাধীনতা?' প্রশ্ন করলেন হোজা।

'মৃত্যুতে? জানি না। তবে নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে। আমি অনেক দিন নিঃসঙ্গ।'

'তা সত্য নয়। আপনার হৃদয়ে দয়ামায়া আছে। আছে ভালবাসা মানুষের জন্য। তা মানুষের প্রাণে সাড়া জাগায়,' বললেন হোজা। 'জীবন্ত মানুষ কখনও

নিঃসঙ্গ হতে পারে না। মানুষ একা নয়, যুথবদ্ধ।'

'সেসব তো প্রিয় স্বপ্ন-কল্পনা! ঝড়-বৃষ্টি-শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেয়াল গড়া! আত্মরক্ষা করুন, পথিক, আত্মরক্ষা করুন! জীবনের নির্মম সত্য থেকে নিজেকে বাঁচান!'

'আত্মরক্ষা করব? না, জনাব! আমি আত্মরক্ষা নয়—সব সময় আক্রমণই করি,' বললেন হোজা। 'যখন যেখানে দেখি অন্যায় অশুভ, তা সে যে রূপ বা চেহারায় হোক, আমি আক্রমণ করি। যায় যদি জীবন এ সংগ্রামে, যাক। কেউ বলতে পারবে না যে আমি পালিয়ে গেছি ময়দান ছেড়ে। যাবার বেলায় হাতের অস্ত্র তুলে দিয়ে যাব অন্যের হাতে!'

বুড়ো জবাব দিলেন না হোজার আবেগময় কথাগুলোর। কানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহা, এই অভাগা লোকটা প্রতি বছর এখানে এসে মাজারের পাশে গোলাপের শাখা পুঁতে যায়। আশা করে ওটা বাঁচবে, ওতে ফুল ফুটবে। ফুল ফুটলে সে বুঝবে তোরা খানের কৃপা পেয়েছে। কিন্তু একটা ডালও বাঁচে না। ওর জন্য আমার দুঃখ হয়।'

'ও এখন যেটা লাগাচ্ছে এটাও বাঁচবে না,' বললেন হোজা। 'ঠিকভাবে পুঁতছে না।'

'বাঁচবে। আমি যত্ন নেব। দিনে তিনবার পানি দেব।' বললেন বুড়ো মানুষটি। হোজা দেখলেন তাঁর দু'চোখে অশ্রু টলমল করছে।

'বুড়ো মিঞা, আমি জানি করুণার বশে এভাবেই আপনি অলৌকিক ঘটনা ঘটাবেন। আবার এসে কানা দেখবে তার লাগান গোলাপ গাছ বেঁচেছে। সে ভাববে তোরা খান তাকে দয়া করেছেন!'

এর পরে তাঁরা বিদায় নিলেন মাজার থেকে।

চার

কোতোয়াল কামিল বেক আর হোঁৎকা রহিম বাই

হোজা নাসিরুদ্দীন আর তাঁর সঙ্গী রাতটা শহরতলির এক নোংরা মাছি ভনভন-করা চা-খানায় কাটিয়ে ভোরবেলা প্রবেশ করলেন কোকন্দ শহরে। শহরের ভেতর এগিয়ে যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন যে রাস্তায় রাস্তায়, মোড়ে, চত্বরে, অলিতে-গলিতে সর্বত্র টহল দিচ্ছে, ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে, ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা পদমর্যাদার সেপাই, বরকন্দাজ, প্রহরী আর গুপ্তচর। সত্যি, কোকন্দে চোরদের দিন খতম হয়েছে। হোজা ভাবলেন, 'সরকারী কর্মচারীর এত বড় দঙ্গল পুষতে বেচারা নগরবাসীদের না জানি কি বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্চা দিতে হয়। কোন চোর একশ' বছর ধরে অবিরাম চুরি করেও নগরবাসীদের এত ক্ষতি করতে পারত কিনা সন্দেহ।'

মাদ্রাসা, জামে মসজিদ, সাই নদীর ওপরকার পুল, খানের কেল্লা আর প্রাসাদ পার হয়ে তাঁরা প্রবেশ করলেন বাজারে।

তখনকার দিনে প্রাচ্যের বড় বড় শহরগুলোর নিজস্ব নাম ছাড়াও মর্যাদা বোধক একেকটি উপাধিও ছিল। যেমন, বোখারাকে বলা হত 'বোখারা-ই-শরীফ বা মহান রাজকীয় বোখারা', সমরখন্দকে বলা হত 'সাহসী, দিগ্বিজয়ী, ঐশ্বর্যময়ী সমরখন্দ', আর কোকন্দকে বলা হত 'ফুর্তি আর আনন্দের নগরী কোকন্দ'।

এমন একটা সময় ছিল যখন কোকন্দের উৎসবের সংখ্যা ও নাগরিকদের আনন্দ-ফুর্তির সঙ্গে তুলনা করার মত শহর আর কোথাও ছিল না। কিন্তু নতুন খানের আমলে কোকন্দের চেহারা পাল্টে গেছে। নেহাৎ অভ্যাসের বশে উৎসব এখনও হয় বটে, চা-খানাগুলোর সামনে সানাই-শিঙ্গা ঢালঢোল বাজে, কিন্তু আগের সেই ফুর্তির চমক আর নেই। নতুন খানের প্রশ্রয়ে রাজ্যের সব লোভী মোল্লা আর ভণ্ড ধার্মিক কোকন্দে জড়ো হয়েছেন। তাঁদের খাওয়াতে পরাতে,

উপহার উপঢৌকন দিতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য হচ্ছে, মানুষের ওপর করের বোঝা বাড়ছে। খানের একটি মাত্র নেশা—ঘোড়দৌড়। ঘোড়দৌড়ের বেলায় ধর্মের বাধা তিনি মানেন না।

কিন্তু বসন্ত—সে তো বসন্তই। কোকন্দবাসীরাও তার যাদুস্পর্শে সাময়িকভাবে ভুলেছে তাদের উদ্বেগ। তাদের পোশাকে, আচরণে, হাসিতে, গল্পে, ফুলের মেলা আর পাখির কলগানে উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে। দলে দলে লোক রাস্তায় নেমেছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে ওখানে জটলা করছে, শারীরিক কসরৎ দেখছে, কেউ কেউ চা-খানার মধ্যে রাখা সারি সারি খাঁচা ভর্তি পাখির একটা কি দুটো কিনে ছেড়ে দিচ্ছে মুক্ত আকাশে, অন্যরা ওই দৃশ্য দেখে হাততালি দিচ্ছে।

'বাবা তোরা খান আমাদের কাছ থেকে কিছু ভাল কাজ আশা করছেন,' কানা-সাথীকে বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন। 'চলো, খাঁচায় বন্দী বেচারা খুদে পাখিগুলোকে নিয়েই আমরা শুরু করি। এই টাকাটা নাও। কিন্তু খবরদার, তোমার চারপাশে ভীড় করে যারা তামাশা দেখবে তাদের কারও টাকার থলে তোমাকে ইশারায় ডাকলেও সে দিকে হাত বাড়াবে না।'

'আচ্ছা হুজুর, আপনার হুকুম মতই আমি কাজ করব।'

এই বলে কানা সবচেয়ে কাছের চা-খানায় গিয়ে ওদের সবগুলো পাখি একত্রে কিনে ফেলল। তারপর সে একটার পর একটা করে পাখি খাঁচা থেকে বের করে মুক্ত আকাশে ছেড়ে দিতে লাগল, আর বিকেলের সোনালী রোদ ডানায় মেখে ওরা উড়ে চলল মুক্তির আনন্দে।

দেখতে দেখতে মানুষের ভীড় জমে গেল সেখানে। বন্ধ হয়ে গেল রাস্তা। সবাই উচ্চস্বরে প্রশংসা করতে লাগল কানার বদান্যতার।

কানার মুখে খুশির হাসি। সে বলল, 'কি আশ্চর্য, এটা আগে কখনও আমি ভাবিনি। একেক সময় তো আমার হাতে অনেক পয়সা এসেছে, তখন ইচ্ছে করলে হাজার হাজার পাখিকে মুক্তি দিতে পারতাম। কিন্তু পাখি মুক্ত করলে হৃদয়ে যে এত আনন্দ জাগে তা আমি আগে জানতাম না।'

'অনেক জিনিস রয়েছে যা তুমি আগে জানতে না এবং এখনও জানো না।' জবাব দিলেন হোজা। তিনি ভাবলেন যে লোকটার ব্যাপারে তাঁর ভুল হয়নি। ওর হৃদয়ের ফোয়ারাটি এখনও জীবন্ত আছে।

হঠাৎ ঢোল-নাকাড়ার শব্দের সাথে শোনা গেল ক্রুদ্ধ গর্জন, 'হট্ যাও! রাস্তা ছাড়! হট্ যাও!'

ভীড় পিছিয়ে গিয়ে পলকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল চারদিকে। হোজা নাসিরুদ্দীন দেখলেন তাঁর সামনে বাদামী রঙের মদ্দা ঘোড়ায় সওয়ার এক বড় শাহী কর্মচারী। তাঁকে ঘিরে রয়েছে একদল ভয়ঙ্কর চেহারার বড় বড় গোঁফওয়ালা লালমুখো রক্ষী। ওদের হাতে নানা রকমের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র—বর্শা, তরবারি,

কুঠার ইত্যাদি। শাহী কর্মকর্তাটির বুকে ছোট বড় অসংখ্য মেডেল ঝিকমিক করছে। তাঁর গোলগাল তাজা মুখে কালো গোঁফের রেখা তিরতির করে কাঁপছে, চোখ থেকে ঝরে পড়ছে উদ্ধত অবজ্ঞার দৃষ্টি। চোখ কটমট করে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এই ব্যাটা হাভাতেরা, কোত্থেকে এসেছিস তোরা?'

আহা, এই হামবড়া কর্তাটি যদি জানতেন তাঁর সামনে ময়লা পিরান, ময়লা টুপি আর তালিমারা জুতা পরে কে দাঁড়িয়ে আছেন!

'আমরা হুজুর, গাঁয়ের লোক, কোকন্দের বাজারে এসেছি,' বিনীতভাবে, মুখে দাস্যভাব ফুটিয়ে জবাব দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। 'আমরা কোন দোষ করিনি। কেবল আমাদের মহামান্য খানের গৌরবের জন্য এবং আমাদের মহা শক্তিমান কর্তা—আপনাকে সম্মান জানাবার জন্য কয়েকটা পাখিকে মুক্তি দিয়েছে।'

'কয়েকটা বাজে পাখিকে মুক্তি দিয়ে লোক জড় করা ছাড়া আর কোন উপায়ে খানের প্রতি ভক্তি আর আমাকে শ্রদ্ধা জানান যায় না?' ক্রুদ্ধ স্বরে এবং 'মুক্তি দিয়ে' কথা দুটো চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করে জিজ্ঞেস করলেন শাহী কর্মচারীটি। 'এখনি এসব মুক্তি দেয়া-টেয়া বে-আইনী করা উচিত। এসব মূঢ় রীতি আমার শহরকে কলঙ্কিত করছে। আমি বুঝতে পারছি, ওড়াবার মত পয়সা তোমার আছে। সেটা বাজারে না উড়িয়ে রাজকোষে দিলেই তোমার ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যেত। ওদের কাছে কী আছে দেখো তো পরীক্ষা করে!' রক্ষীদের হুকুম দিলেন তিনি।

রক্ষীরা মুহূর্তে পাকড়াও করল হোজা নাসিরুদ্দীন ও তাঁর সঙ্গীকে। মুহূর্তের মধ্যে খুলে নিল তাঁদের কোমরবন্ধ, পিরান, কোর্তা সব। হোজার রূপো ও তামার মুদ্রা ভর্তি টাকার থলেটি মহা উৎসাহে বাড়িয়ে দিল কর্তার দিকে। দুষ্ট হাসি হেসে তিনি বললেন, 'আমি যেমনটি ভেবেছিলাম ঠিক তাই। থলেটা গুছিয়ে রাখো এখন। পরে রাজকোষে জমা দেয়ার জন্য আমাকে দিয়ো।'

রক্ষীদলের সর্দার তার ঢিলেঢালা লাল পাজামার গভীর পকেটে থলেটি চালান করে দিল। তারপর শাহী কর্মচারী ও তাঁর দল আবার কাড়া-নাকাড়ার আওয়াজ তুলে চলে গেল সেখান থেকে। ওদের দিকে তাকিয়ে হোজা বললেন, 'দুনিয়ার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা তাঁদের দুষ্কার্যের মাত্রা অনুসারে ছোট, মাঝারি, বড়—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ওরা আমাদের পকেটে একটা তামার পয়সাও রেখে যায়নি। কিন্তু ব্যাপারটা আরও খারাপ হতে পারত। ওরা আমাদের মাথা দুটোও নিয়ে যেতে পারত, কারণ এই কর্তাটি ছিলেন বড় শ্রেণীর।'

কানা বলল, 'রক্ষী সর্দারের পকেট থেকে আমাদের থলেটি উঠিয়ে নেবার জন্য আমার হাত চুলকাচ্ছিল, কিন্তু কি করব, আপনার হুকুম নেই।'

হোজা বিরক্তির সাথে জবাব দিলেন, 'তোমার মাথায় কি মগজ নেই? একটা টাকার থলে উদ্ধার করে তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কোন বিশেষ

অনুমতির দরকার হয় না।'

'এই যে ওটা,' বলে কানা তার নিজের কোমরবন্ধের নিচ থেকে হারান থলেটি বের করল। 'ওর পকেটে দুখানি বালাও ছিল—ওজনে বুঝলাম সোনার—কিন্তু আমি ওগুলো নিইনি।'

টাকার থলে ফিরে পাবার আনন্দে দু'জনে চা-খানা ও খাবারের দোকানগুলোতে গিয়ে পেট ভরে খেয়ে নিলেন। তারপর আবার বেরুলেন বাজার পরিক্রমায়। বিশাল বাজার। সারি সারি দোকানপাট। যেদিকে তাকাও শেষ নেই তার।

কোকন্দের বাজারে দোকানে দোকানে মাদুর আর কার্পেট বিছিয়ে সাজান পশরার সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য আর ঐশ্বর্যের বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। তখনকার দিনে প্রাচ্য জগৎ যে সব জিনিসের জন্য গর্ব করতে পারত তার সব কিছু জড়ো করা হয়েছে সেখানে! হুঁকোর বাজারে আছে অতি সাধারণ ও নিম্নমানের হুঁকো থেকে আরম্ভ করে ইস্তাম্বুলের কারিগরদের দক্ষ হাতে তৈরি অপূর্ব নকশাদার মহামূল্যবান হুঁকো। আছে সোনার কারুকাজ করা দুর্মূল্য পাথর। রূপার পাতে বাঁধাই করা ভারতীয় আয়না। বিচিত্র-বর্ণা অসাধারণ নকশায় তৈরি পারস্যদেশী গালিচা। নানা রঙের রেশমী বস্ত্র—যার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে সূর্যের চোখ-ঝলসান উজ্জ্বলতা। বিকেলের গভীর নীল আকাশের কোমলতা আর দ্যুতিকে হার মানান অনুপম ভেলভেট। নানা আকার-আকৃতির বারোকোশ, বালা, মাকড়ি, ঘোড়ার জিন, ছুরি, বুটজুতা, পিরান, টুপি, কোমরবন্ধ, কস্তুরী, আতর, আরও কত কি।

দেখতে দেখতে দিন শেষ হয়ে এল। লোকজন ঘরে ফিরতে লাগল। বহিরাগতরা চা-খানাগুলোতে আশ্রয় নিল। কিন্তু বাজার বন্ধের ঘন্টা তখনও বাজেনি। অনেক দোকানপাটে কাজকারবার চলছে।

এরকম একটা দোকান মুদ্রাবিনিময়ের কারবারী রহিম বাই-এর। রহিম বাই কোকন্দের সেরা ধনীদের একজন। মোটাসোটা শরীর, ঝুলে পড়া থুতনি, ফোলা মুখ, পিরানের বাইরে বেরিয়ে-পড়া মাংসল ঘাড়, আর প্রকাণ্ড ভুঁড়িওয়ালা রহিম বাই বেঁটেখাট দশটি আঙুলে অসংখ্য আংটি পরে বসে আছে তার দোকানে। ভারি পর্দাওয়ালা চোখে তাকিয়ে আছে সে সামনে থরে থরে সাজান সোনা, রূপো, আর তামার মুদ্রার দিকে। ওখানে রয়েছে ভারতীয় মুদ্রা রূপেয়া, চৌকো আকারের চীনা মুদ্রা চেঙ, তাতার মুদ্রা আলতিন, পার্শী তোমান, আরবীয় দিনার এবং সেই আমলে প্রাচ্যদেশে প্রচলিত আরও অনেক মুদ্রা। সুদূর 'বিধর্মীদের' দেশের গিনি, ডবলুন, ফার্দিং, ফ্রাঙ্কীয় রাজাদের বর্ম তরবারি পরিহিত মূর্তি ও 'ঘৃণ্য' ক্রুশ চিহ্নখোদিত মুদ্রাও আছে অনেক।

হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর কানা সাথীকে নিয়ে যে সময় সে দোকানের কাছে

পৌঁছলেন তখন রহিম বাই দিনের মুনাফার হিসাব মিলাচ্ছে। গম্ভীর ও চিন্তামগ্নভাবে মুদ্রার একেকটি স্তবক তুলে নিয়ে গুনে গুনে বাক্সে ভরে রাখছে। এমন সময় তাঁরা দেখলেন একজন মহিলা—বোরখার নিচের প্রান্তে নীল রঙের ফিতে লাগান দেখে হোজা বুঝলেন যে বিধবা—সেখানে উপস্থিত হয়েছে।

দোকানের সামনে গিয়ে মহিলা বিধবাটি বলল, 'মেহেরবান, দয়ালু মহাজন সাহেব, আপনার কাছে আমি একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। আপনি আমার বাচ্চাদের বাঁচান।'

মুদ্রার স্তূপের ওপর লেপ্টে থাকা দৃষ্টি একটু তুলেই হোঁৎকা রহিম বাই বলল, 'যাও, যাও এখান থেকে, আমি ভিক্ষে দিই না।'

'ভিক্ষে নয়, আমি সহায়তা চাই। এতে আপনারও কিছু লাভ হবে।'

'লাভ' কথাটা শুনেই রহিম বাই ভাল করে তাকাল মহিলাটির দিকে।

'স্বামীর মৃত্যুর পরে আমার এককালের সচ্ছল সংসার ছারখার হয়েছে। এখন কয়েকখানা অলঙ্কারই আমার সম্বল। এগুলো আমি রেখে দিয়েছিলাম দুঃসময়ের জন্য। সেই দুঃসময় এখন দেখা দিয়েছে। আমার তিনটি বাচ্চাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে,' বলে বিধবাটি কাপড়ের নিচ থেকে একটা ছোট্ট চামড়ার থলে বের করে কান্না জড়ান স্বরে বলে গেল, 'আমি কয়েকজন ব্যবসায়ীকে অলঙ্কারগুলো দেখিয়েছি। কিন্তু খানের সর্বশেষ ফরমান অনুযায়ী কোতোয়াল সাহেব প্রথমে এগুলো দেখে না দিলে তারা কেউই কিনবে না। মহাজন সাহেব, আপনি তো জানেন, কোতোয়ালের পরিদর্শনের পরে আমি না পাব টাকা, না পাব আমার অলঙ্কার। কোতোয়াল নিশ্চয়ই সেগুলোকে চোরাই মাল বলে ঘোষণা করবেন এবং রাজকোষের জন্য বাজেয়াপ্ত করবেন।'

রহিম বাই ঠোঁট চেটে দাড়ি চুমরে বলল, 'হুম, ওগুলো রাজকোষে যাবে কি যাবে না সে প্রশ্ন এখনও রয়েছে। তবে তিনি যে ওগুলো গ্রাস করবেন সেটা একেবারে নিশ্চিত। অন্যদিকে কোতোয়াল সাহেব প্রথমে দেখে না দিলে অচেনা লোকের কাছ থেকে কিছু কেনাও বিপজ্জনক। এরকম অপরাধের জন্য ফরমান অনুযায়ী শাস্তি হল একশ' ঘা বেত এবং কারাদণ্ড। কিন্তু আপনার দুঃখের কথা শুনে···আচ্ছা, কি আছে ওখানে দেখান তো!'

বিধবা চামড়ার থলেটি তুলে দিল রহিম বাই-এর হাতে। মুখের বাঁধন খুলে উপুড় করে ধরতেই ওটার ভেতর থেকে বেরুল একটা ভারি সোনার বালা, বড় আকারের পান্না বসান একজোড়া মাকড়ি, একখানি চুনীর হার, একটি সোনার চেন, আর কয়েকটি ছোটখাট সোনার অলঙ্কার।

'কত দাম চান এগুলোর জন্য?'

বিধবা ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, 'দুই হাজার রূপোর টাকা।'

কানা ফিসফিস করে হোজা নাসিরুদ্দীনকে বলল, 'বেচারি ওগুলোর আসল

দামের ঠিক তিন ভাগের একভাগ দাম চাচ্ছে। আমি এখান থেকে দেখেই বুঝতে পারছি ওগুলো ভারতীয় চুনী।'

রহিম বাই অবজ্ঞার সাথে ঠোঁট উল্টে বলল, 'সোনাটি ভেজাল, আর পাথরগুলো সস্তা জাতের, কাশগড়ী জিনিস।'

কানা ফিসফিস করে হোজাকে জানাল, 'ব্যাটা মিথ্যে বলছে।'

'আপনার প্রতি সহানুভূতিবশত বলছি, এই সবগুলোর জন্য আমি আপনাকে—ইয়ে···মানে, হাজারখানেক রূপোর টাকা দিতে পারি,' বলল রহিম বাই।

কানা ছটফট করে উঠল, তার হলদে চোখটা জ্বলে উঠল গোস্‌সায়। প্রতিবাদ করার জন্য সে ছুটে যেতে চাইল সামনে, কিন্তু হোজা নাসিরুদ্দীন তাকে সামলে রাখলেন।

আপত্তির সুরে বিধবাটি বলল, 'আমার স্বামী বলেছিলেন শুধু হারের চুনীগুলোর জন্যই তিনি এক হাজারের বেশি রূপোর টাকা দিয়েছিলেন।'

'তিনি আপনাকে কি বলেছিলেন আমি জানি না এবং জানতেও চাই না। এই অলঙ্কারগুলো চোরাই মালও হতে পারে—এ কথাটা মনে রাখবেন। ঠিক আছে, আমি আপনাকে আরও দুইশ' টাকা দেব। এক হাজার দুইশ'-এর বেশি একটা তামার পয়সাও নয়!' সাফ জানিয়ে দিল রহিম বাই।

বিধবাটি আর কি করবে? সে রাজি হল।

রহিম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে অলঙ্কারগুলো তার থলেতে ভরে রেখে বিধবার হাতে এক মুঠো টাকা তুলে দিল।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে কানা ফিসফিস করে বলল, 'আস্ত ডাকাত একটা! আমি নিজে একজন চোর, গোটা জীবন কাটিয়েছি চোরদের সঙ্গে, কিন্তু এমন রক্তচোষা আর কখনও দেখিনি!'

কিন্তু ঘটনা তখনও শেষ হয়নি। বিধবা রহিম বাই-এর দেয়া টাকাগুলো গুনেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনার ভুল হয়েছে, মহাজন সাব, এখানে তো মাত্র সাড়ে ছয়শ' টাকা!'

'ভাগো!' গর্জন করে উঠল রহিম বাই। রাগে মুখ তার লাল হয়ে গেছে। 'চোরাই সোনা সুদ্ধ তোমাকে পাহারাদারদের হাতে তুলে দেবার আগে কেটে পড়ো এখান থেকে!'

'বাঁচাও, বাঁচাও, লোকটা আমাকে ঠকিয়েছে! কে কোথায় আছ—ভাইয়েরা, আমাকে বাঁচাও।' চিৎকার করতে করতে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল বিধবা মেয়েলোকটি।

কানার গোস্‌সা এবার সীমা ছাড়াল। সেই মুহূর্তে যদি রাস্তার মোড়ের দিক থেকে হঠাৎ কাড়া-নাকাড়ার কানফাটা আওয়াজ না উঠত তাহলে হোজা

নাসিরুদ্দীন ওকে থামিয়ে রাখতে পারতেন না।

দেখা গেল সেই শাহী কর্মকর্তাটি আর তাঁর রক্ষীদল রহিম বাই-এর দোকানের দিকে এগিয়ে আসছেন।

বিধবাটি চুপ করে ভয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল। রহিম বাই হাত দু'টি ভুঁড়ির নিচে ভাঁজ করে রেখে মাথা নুইয়ে সালাম জানাল শাহী কর্তাটিকে, অর্থাৎ নগর কোতোয়াল সাহেবকে। তিনি ঘোড়ার পিঠে বসে মাথাটা সামান্য নেড়ে বললেন, 'আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের মাথার মুকুট রহিম বাই সাহেবকে অভিনন্দন। আপনার দোকানের কাছে আমি যেন কান্নাকাটির শব্দ শুনলাম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই মেয়েলোকটা!' বিধবাটির দিকে আঙুল তুলে রহিম বাই জবাব দিল। 'সে জঘন্য নোংরা আচরণ করেছে, শান্তি ভঙ্গ করেছে। আমার কাছে টাকা চায়, কি সব মণিমুক্তার কথা বলছে…'

'মণিমুক্তা!' শুনেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কোতোয়ালের, চোখের মণি দুটো তাঁর হঠাৎ জ্বলে উঠল দপ্ করে। তিনি হুকুম করলেন, 'কই মেয়েলোকটা, ওকে আমার সামনে আনো!'

কিন্তু কোথায় পাবে তাকে? সর্বস্ব হারানর ভয়ে বিধবাটি ততক্ষণে পালিয়ে গেছে এক গলিপথে।

'সাধারণ মানুষ যত পদদলিত হয় চোর-বাটপাড়েরা তত বেশি স্বাধীনতা পায়। চুরি বন্ধ করতে গিয়ে এরা ব্যবসার নামে প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতিকে উৎসাহিত করছে। ছুটে যাও তো বিধবাটির পিছে, দেখে আস সে কোথায় থাকে।' কানাকে হুকুম দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

কানা পলকে উধাও হয়ে গেল। তার নানা অদ্ভুত ক্ষমতার মধ্যে একটি ছিল এই যে লোকের দৃষ্টির সামনে সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যেত এবং ঠিক তেমনি যেন আবার হাওয়া থেকেই বেরিয়ে আসতে পারত।

হোজা নাসিরুদ্দীন রক্ষী ও প্রহরীদের নজর এড়াবার জন্য রাস্তার একপাশে জড় করা পাথরের স্তূপের আড়ালে সরে গেলেন এবং সেখান থেকে দোকানটির ভেতরের কাণ্ড-কারখানা লক্ষ করতে লাগলেন।

রহিম বাই-এর আমন্ত্রণে কোতোয়াল দোকানে গিয়ে চা খেতে বসলেন। দু'জনের মধ্যে শুরু হল আসন্ন ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিয়ে আলোচনা।

গোঁফে তা দিতে দিতে কোতোয়াল বললেন, 'রহিম বাই, আপনাকে ছাড়া আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি ভয় করি না। শুনলাম, এই প্রতিযোগিতার জন্য আপনি নাকি আরব দেশ থেকে দুটো মদ্দা ঘোড়া আনিয়েছেন। শুনেছি, কিন্তু দেখিনি। কারণ, ওগুলোকে আপনি আপনার বিবির চাইতেও বেশি যত্নের সাথে লোকের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখেন। গুজব বলে, ওগুলোর জন্য আপনার চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। প্রথম পুরস্কার পেলেও তো আপনার খরচ উঠবে

না।...'

'আমার মোট খরচ পড়েছে বাহান্ন হাজার,' বলল রহিম বাই। 'কিন্তু আমাদের মহান খানের দৃষ্টিকে আনন্দ দানের প্রশ্নে খরচের ব্যাপারটি নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

'এটা খুব প্রশংসার কথা। আপনার এই ভক্তির কথা আমি খানকে জানাব।'

আলাপের এই পর্যায়ে হঠাৎ বাতাস ভরে গেল আতরের সুগন্ধে। রহিম বাই-এর বিবি এলেন দোকানে। দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী তন্বী। পাতলা বোরখার আড়ালে দেখা যাচ্ছে তাঁর প্রসাধন-চর্চিত চেহারা। কোতোয়াল উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম জানালেন, 'আমার পরম বন্ধুর স্ত্রী শ্রদ্ধেয় সুন্দরী আরজু বিবিকে আমার অভিনন্দন।'

আরজু বিবি মাথা নুইয়ে মুচকি হেসে অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। কোতোয়ালের সামনে নিজের ধন সম্পদের ও বদান্যতার বড়াই করার লোভ চেপে রাখতে না পেরে রহিম—বাই থলে থেকে কয়েকটি অলঙ্কার নিয়ে বিবিকে উপহার দিল। বলল যে ঘন্টা কয়েক আগেই স্বর্ণকারের দোকান থেকে আট হাজার টাকা দিয়ে ওগুলো কিনেছে। আরজু বিবি কোতোয়ালের দিকে চোরা দৃষ্টি হেনে স্বামীকে ধন্যবাদ দিল। আত্ম-সন্তুষ্ট রহিম বাই লক্ষ করল না তার বিবির দৃষ্টি। সে তখনও দিয়ে যাচ্ছে কেমন খোলা হাতে সে খরচ করে, কোন জিনিসের জন্য কত ব্যয় করেছে সেই ফিরিস্তি। প্রশ্রয়ের হাসি হেসে তার কথা শুনতে শুনতে কোতোয়াল এক সময় বলে উঠলেন, 'এই মণিগুলো আপনার সৌন্দর্যের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিবে আরজু বিবি। আহা কি আফসোস, এসব মণিময় অলঙ্কার শোভিত আপনার পবিত্র রূপ দেখার সৌভাগ্য কেবল আপনার স্বামীর একলার।'

আত্ম-সন্তুষ্টি ও বোকামির তাড়নায় রহিম বাই বলে বসল, 'আরজু বিবি, এই মাকড়ি ও হারটা পরে আমার সেরা দোস্ত মহান কামিল বেকের সামনে বোরখা খুলে মিনিট খানেক দাঁড়ালে তেমন বেশি পাপ হবে বলে আমি মনে করি না।'

আরজু বিবি বিনা আপত্তিতে তাই করলেন। রূপ দেখে চোখ ঝলসে গেছে এমন ভঙ্গি করে কোতোয়াল হাত দিয়ে দু'চোখ ঢাকলেন।

আনন্দে রহিম বাই আত্মহারা হয়ে গেল।

পাথরের স্তূপের আড়াল থেকে সব ঘটনা লক্ষ করে হোজা নাসিরুদ্দীন ভাবলেন, 'তোর অত আনন্দের কি আছেরে ব্যাটা হোঁৎকা আহাম্মক! তুই মদ্দা ঘোড়া আনিস আরব দেশ থেকে, কিন্তু তোর বউ মদ্দা ঘোড়া খুঁজে নেয় ঘরের কাছ থেকে!'

কানা চোর ফিরে এল। যেন বাতাস ফুঁড়ে বেরিয়ে এল হোজা নাসিরুদ্দীনের সামনে। বলল, 'বিধবাটি কাছেই থাকে। তার তিনটে বাচ্চাই যে অসুস্থ এটা সত্য। ধার-দেনা শোধ করতেই তার ছ'শো টাকায় কুলাবে না। ওই বদমাশ রক্ত চোষাটার হারামিপনার দরুন আগামীকাল থেকেই বেচারির হাতে একটি তামার

পয়সাও থাকবে না।'

হোজা বললেন, 'এ দোকানটা আর বিধবার ঘরটা চিনে রাখো, কিছুদিনের মধ্যেই ওগুলোর দরকার হবে আমাদের। এখন চলো যাই এখান থেকে।'

তাঁরা চলে গেলেন বাজারের শেষ প্রান্তের এক চা-খানায় রাতের আশ্রয়ের জন্য।

গভীর রাত পর্যন্ত ঘুম এল না হোজা নাসিরুদ্দীনের। তাঁর মাথায় ঘুরছে বুড়ো ফকিরের হারান হ্রদ আর আগা বেকের চিন্তা। বাজারের কত লোককেই না তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, কিন্তু কেউই তাঁকে কোন হদিস দিতে পারেনি। কোথায় গেল হ্রদটা? আরেকটা বিষয়—ওই গরীব বিধবাটিকে সাহায্য করার চিন্তাও তাঁকে পীড়িত করছে। ওর অলঙ্কারের ন্যায্য মূল্য ছয় হাজার টাকা ওকে পাইয়ে দিতে হবে। কিন্তু কিভাবে? কোথায় পাবেন তিনি অত টাকা? কিছু ভেবে না পেয়ে অগত্যা কানাকে তিনি জানালেন সমস্যাটা।

কানা জবাব দিল, 'আগেকার দিন হলে ছয় হাজার টাকা আমি খুব সহজেই কোকন্দ থেকে জোগাড় করতে পারতাম। কিন্তু এখন কোকন্দবাসীদের বড় দুর্দিন যাচ্ছে। অত বড় তহবিল কারও কাছে নেই, এক ওই হোঁৎকা মুদ্রার কারবারী ছাড়া।'

ভর্ৎসনার সুরে হোজা বললেন, 'আবারও তুমি পাপ চিন্তা করছ? তোমার কি চুরি না করলেই নয়? অন্য উপায় আছে কিনা বলো।'

'জুয়া খেলে জিতে নেব?'

'জুয়ায় তো হেরেও যেতে পারো। আমাদেরকে এমন এক খেলা বেছে নিতে হবে যাতে আমরা জিতবই।'

হোজা নাসিরুদ্দীনের মাথায় একটা মতলব ঝলসে উঠল। মতলবটা অবশ্যই সৎ। তিনি বললেন, 'তিন জনের—তোমার, আমার আর ওই হোঁৎকা মহাজনের মধ্যে হবে এই খেলা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওকে কেমন করে ফুসলে আমাদের খেলায় টেনে আনব?'

কানা বলল, 'ওকে ফুসলে আমাদের খেলায় আনা? তার চেয়ে বরং ওই খুঁটিটাকে বা উটটিকে ফুসলে আনা সহজতর হবে।'

'দেখো, ছয় হাজার টাকা ওর কাছ থেকেই নিতে হবে এবং নেয়া উচিত। স্বেচ্ছায় সে তা দেবে। ওর জন্যও এতে ভাল হবে, সে পাপমুক্ত হবে।'

হেসে ফেলল কানা। বলল, 'ওই রক্ত চোষাটা স্বেচ্ছায় ছাড়বে ছয় হাজার টাকা? একশ' দিতে হলেই তো সে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা যাবে।'

কথা বলতে বলতে এক সময় কানা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু হোজার চোখে ঘুম নেই। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ছয় হাজার টাকা রহিম বাইকে দিতে হবে এবং সে দেবে সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছায়। এর কোন নড়চড় হবে না।

ওদিকে রহিম বাই তখন নিশ্চিন্ত আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে তার সুন্দরী বিবির পাশে। আর সুন্দরী আরজু বিবি নিদ্রাহীন চোখে ঘৃণার সাথে স্বামীর বিশাল ভুঁড়ির ওঠা-নামা দেখতে দেখতে ভাবছেন সুন্দর সুপুরুষ কোতোয়াল কামিল বেকের চেহারা, তাঁর কথা বলার চমৎকার ভঙ্গি, পৌরুষময় ঘন কালো গোঁফজোড়ার কথা। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

আর আরজু বিবির স্বপ্নের নায়ক কামিল বেক তখন কি করছিলেন? তাঁর মাথায় তখন আরজু বিবির বদলে অন্য চিন্তা। তিনি তখন ফন্দি আঁটছিলেন কিভাবে নিজের আরও উন্নতি ঘটাবেন, রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করবেন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘায়েল করবেন। এসব ফন্দি মাথায় নিয়ে তিনি রওনা হলেন খানের প্রাসাদে।

পাঁচ

খানের প্রাসাদে কামিল বেক

খানের প্রাসাদে সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। শুধু খান ছিলেন জেগে, আর জেগে ছিল তাঁর প্রহরীর দল। তিনি রাতে ঘুমুতে পারতেন না মারাত্মক হাঁপানি রোগের দরুন। তাই সারা রাত জেগে রাজকার্যের হিসেব নিতেন। উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে খান শুনছিলেন কামিল বেকের বিবরণ। বুকে হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে কোতোয়াল বলছিলেন, 'আজ বাজার বন্ধ হবার পর শহর যখন নীরব হল তখন আমি ঘোড়দৌড়ের ময়দানে গেলাম আসন্ন প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা স্বচক্ষে দেখার জন্য।'

খান বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'স্বচক্ষে তো গতবারও তুমি পরখ করে দেখেছিলে, তবু একটা ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। দেখো, এবার যেন কোন গর্ত-টর্ত না থাকে।'

নিচু হয়ে কুর্নিশ করে কোতোয়াল বলল, 'এবার সেরকম হলে আমার গর্দান

দেব। আমি বিশ্বাস করি আমার তেকিন ঘোড়া দুটো দেখে জাঁহাপনার চোখ জুড়াবে।'

'শুনলাম এবার তোমার তেকিনের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে। এক ব্যবসায়ী—নামটা মনে থাকে না—নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আরবী ঘোড়া আনিয়েছে। তুমি দেখেছ ওগুলো?'

কোতোয়াল বলল, 'দেখেছি আলমপানা। ঘোড়া নিঃসন্দেহে ভাল, তবে আমার গুলোর মত নয়। ব্যবসায়ীটি মিথ্যে দাম, বাড়িয়ে বলেছে। আমার গোয়েন্দাদের বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে জানা গেছে ওগুলোর আসল দাম কুড়ি হাজারের কিছু বেশি।'

'কুড়ি হাজার? অত অল্প দামের বাজে ঘোড়া নিয়ে সে আমার সামনে আসতে চায়?'

ধূর্তের হাসি হেসে কোতোয়াল বলল, 'জাঁহাপনা, ব্যবসায়ীটি নীচ বংশের। উঁচু স্তরের কায়দা-কানুন সে কেমন করে জানবে?'

ঘোড়-দৌড়ের ময়দানের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এই বিষোদ্‌গার করে কামিল বেক তাঁর দরবারী প্রতিদ্বন্দ্বী খাজাঞ্চী, রাজস্ব উজির, আর খোজা সর্দারের বিরুদ্ধে কিছু কিছু অভিযোগ করলেন। তারপর একটুখানি দম নিয়ে তিনি তৈরি হলেন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ষীয়ান সেনাপতি বীর যোদ্ধা ইয়াদগার বেককে এক চরম আঘাত হানার জন্য। সাহসী, স্পষ্টভাষী ও উদার চরিত্র ইয়াদগার ছিলেন সকলের প্রিয়। কিন্তু, এজন্যই তিনি ছিলেন কামিল বেকের চক্ষুশূল।

ক্লান্তিতে হাই তুলে খান বললেন, 'হুম, আর কিছু বলার আছে তোমার?'

দুরদুর করে কেঁপে উঠল কোতোয়ালের বুক। মিনমিন করে বললেন, 'একটা দুঃখের, অথচ সত্য কথা বলতে চাই প্রভু।'

'বলে যাও···'

'কথাটা আমাদের সিপাহ-সালার ইয়াদগার বেক সম্পর্কে

'ইয়াদগার বেক? তিনি কি কোন দোষ করেছেন? কি করেছেন তিনি?'

'আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে তিনি একজন ব্যভিচারী।'

'ব্যভিচারী? ইয়াদগার বেক? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ জাঁহাপনা, তিনি ব্যভিচারী বলে চূড়ান্ত প্রমাণ রয়েছে। ছয় বছর আগে স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি আরেকটি বিয়ে না করে শরাফত নামের এক ফার্সী মেয়েলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।'

'আমরা জানি। কিন্তু মেয়েলোকটি তো একা। স্বামী তাঁর পাঁচ বছর আগে ভারতে যাওয়ার সময় পথে মারা গেছে।'

'কিন্তু প্রভু আপনার সর্বশেষ ফরমান মতে এটা অপরাধ। ফরমান জারির দু'মাস পরেও ইয়াদগার বেক শরাফতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেননি।'

খান বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'ফরমানের সঙ্গে এর কি যোগাযোগ আছে? মেয়েলোকটি স্বাধীন। এখানে ব্যভিচার কোথায়? ওকে নিকাহ করেছে ইয়াদগার বেক।'

'আমার প্রভু জানতে চান, ফরমান এখানে কিভাবে খাটবে। কিন্তু মেয়েলোকটি যদি স্বাধীন না হয়? যদি তার বিয়ে বৈধভাবে নাকচ না হয়ে থাকে? যদি তার স্বামী মারা না গিয়ে এখনও জীবিত থাকে?'

'জীবিত? তাহলে এই পাঁচ বছর সে কোথায় ছিল?'

'সে জীবিত এবং ভারতের পেশোয়ারে দাস হয়ে আছে। দু'জন পেশোয়ারী বছর দুই আগে আমাদের জাঁহাপনাকে জাদু করার মতলবে এসে ধরা পড়েছিল। আমি তাদেরকে বন্দী করে রেখেছি। মাত্র কয়েকদিন আগে এরা বলেছে যে পেশোয়ারের বাজারে এই মেয়েলোকটির স্বামীকে দাস অবস্থায় দেখেছে। লোকটি তিনবার তার স্ত্রীকে খবর পাঠিয়েছে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য। কিন্তু, আমি কসম করে বলতে পারি, ইয়াদগার বেকের উসকানীতে মেয়েলোকটি তা করেনি। জেরার মুখে কয়েদী দু'জন এক কথাই বলেছে।'

কঠিন হাসি হেসে খান বললেন, 'তোমার জেরার মুখে সবাই এক কথাই বলে। এ রকম একটা হাস্যকর অজুহাতে ইয়াদগার বেককে গ্রেফতার করলে প্রজারা কি বলবে, সৈন্যরাই বা কি বলবে? আমাদের মনে হচ্ছে এখানে কোন একটা চালাকি রয়েছে।'

খান অত্যন্ত বিরক্ত হলেন কোতোয়ালের ওপর। একটুখানি দম নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'আমরা বলছি, এখানে কোন চালাকি আছে। কয়েদী দু'জন ধরা পড়ল দু'বছর আগে এবং মেয়েলোকটির স্বামীর সাথে দেখা হবার কথা তারা বলল মাত্র এখন। এতদিন কেন তারা সেকথা বলেনি?'

'এতদিন তারা গোঁয়ারের মত অস্বীকার করে এসেছে, স্বীকার করল মাত্র এখন।'

খানের মুখের হাসিটি আরও কঠিন হয়ে উঠল, 'গোঁয়ারের মত অস্বীকার করে এসেছে? তোমার কথা অনুযায়ী, যে অপরাধ (জাদু) স্বীকার করলে তাদের কারাদণ্ড নিশ্চিত ছিল সেটা তারা স্বীকার করে ফেলল তোমার দ্বিতীয়বার জেরার সময়। আর যে কথা বললে তাদের ভয়ের কিছুই ছিল না—মেয়েলোকটির স্বামীর সাথে দেখা হবার সেই কথাটি দুই বছর ধরে তারা অস্বীকার করে গেল? তোমার কারাগারে, তোমার হাতে বন্দী থেকে? ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকছে না?'

কোতোয়াল বুঝতে পারলেন যে তিনি ভুল সময় বেছে নিয়েছেন এবং ভুল করে ফেলেছেন। খানের মেজাজ খারাপ। আজ রাতে প্রাসাদে আসাই তাঁর ভুল হয়েছে। কিন্তু সংশোধনের সময় আর নেই। বারে বারে কুর্নিশ করে হাত কচলে বেপরোয়ার মত তিনি বললেন, 'আমার মহান প্রভু, দুনিয়ার আলো, ইয়াদগার

বেকের ব্যভিচার অনেক আগেই আমার নজরে পড়েছে, কিন্তু আপনার অমূল্য স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আপনাকে তা বলিনি।'

খান প্রশ্ন করলেন, 'অনেক আগেই তোমার নজরে পড়েছে? কোথায়? যুদ্ধের ময়দানে, যেখানে তুমি কোন দিন যাওনি? এবং কার সঙ্গে তিনি ব্যভিচার করেছেন? তাঁর তরবারির সঙ্গে? আমরা অবশ্য অন্য জিনিস লক্ষ করেছি। ওই সব দোষ আমরা অন্যদের মধ্যে লক্ষ করেছি—যাদের সে সবের জন্য যথেষ্ট সময় ও দৈহিক সামর্থ রয়েছে। যারা নিজেদের ব্যভিচার বৃত্তির জন্য জাঁকাল গোঁফ গজায়, বার্নিশ করা উঁচু গোড়ালির বুট পরে চীনা কুমারীদের মত হেঁটে বেড়ায়। ব্যভিচারের সন্ধান এসব লোকদের মধ্যেই করা উচিত।'

কামিল বেকের পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠে যেন সরে যেতে লাগল। তবে কি খান কোন খবর পেয়েছেন? হয়ত আরজু বিবির নাম পর্যন্ত তাঁর কানে গেছে? খান কি তাঁকে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে বসেছিলেন? আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে তিনি বলে উঠলেন, 'জাঁহাপনার কথাই ঠিক! তাঁর দিব্য জ্ঞানের দ্বারা তিনি আমার চোখের সামনে থেকে ভুলের পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে ওই পেশোয়ারী বদমাশগুলো মহৎপ্রাণ ইয়াদগার বেকের বীরকীর্তি এবং কোকন্দ রাজ্যের গৌরবকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে তাঁর নামে কলঙ্ক আরোপ করেছে। এখন জানা দরকার, কার উসকানীতে তারা এ কাজ করল। আগামী কালই আমি তাদেরকে আবার জেরা করব। এখন আমি যাই, জাঁহাপনা।'

'দাঁড়াও!' হুকুম দিলেন খান! 'আরও কাছে এসে দাঁড়াও।'

ত্রাসে থরথর করে কেঁপে উঠলেন কোতোয়াল। খানের তর্জনীর দিকে মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন।

'তোমার পেশোয়ারীগুলো কোথায়?'

'কারাগারে, প্রভু!'

'আমরা নিজেই ওদেরকে জেরা করতে চাই।'

'সকাল হলেই ওদেরকে প্রাসাদে নিয়ে আসব, জাঁহাপনা।'

'সকালে নয়, এখনি।'

'প্রাসাদের জন্য ওরা তৈরি নয়, প্রভু। ওদের কাপড়-চোপড় ছেঁড়া, ময়লা। ওরা গোসল করেনি, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল…'

'তাতে কিছু অসুবিধা হবে না। দরকার হলে নাপিতকে জাগান যাবে।'

'কিন্তু…ওদের গায়ে যে তীব্র ক-কটু গন্ধ,' তোতলাতে তোতলাতে বললেন কোতোয়াল।

'আমরা ওদেরকে জানালার পাশে দাঁড় করিয়ে জেরা করব। এই প্রহরী, কে আছ ওখানে!'

বিছানার কাছে ঝোলান কাঁসার ঘন্টায় ঘা দিলেন খান। প্রাসাদ রক্ষী বাহিনীর

কর্তা ছুটে এলেন ঘন্টার আওয়াজে।

কোতোয়ালকে তাঁর কাছে থাকার হুকুম দিয়ে তিনি রক্ষীদলের প্রধানকে বললেন, 'তুমি এক্ষুণি চারজন লোক নিয়ে জিন্দানখানায় চলে যাও। সেখানে দু'জন পেশোয়ারী লোক…' হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ কাশির ধমকে কথা বন্ধ হয়ে গেল খানের। কাশি আর থামে না। কাশতে কাশতে নুয়ে পড়লেন তিনি বালিশের ওপর। নিঃশ্বাস নিতে না পারায় চোখ দুটো যেন তাঁর ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। খান অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

মুহূর্তে হেকিম বৈদ্য, নফর-বাঁদীর ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল প্রাসাদের সর্বত্র।

ছয়

ভোর রাতে কয়েদী পলায়ন নাটক

এই হৈ-চৈ হট্টগোলের মধ্যে কিভাবে শাহী মহল থেকে বেরিয়ে এলেন কোতোয়াল কামিল বেগ তা তিনি নিজেও জানেন না। হাঁপানির হঠাৎ আক্রমণে খান যদি অজ্ঞান হয়ে না পড়তেন তাহলে এই রাতটাই হতে পারত কোতোয়ালের জীবনের শেষ রাত।

ছুটতে ছুটতে নগর উদ্যানে পৌছার পর ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল তাঁর। বিপদটাকে এড়ান গেছে আপাতত কিন্তু কাটান যায়নি। হাঁপানির ধাক্কা সামলে ওঠার পর পেশোয়ারী কয়েদীদের কথা খানের মনে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওদেরকে তাঁর সামনে হাজির করতে বলবেন। কাজেই বাঁচতে হলে পেশোয়ারী দুটোকে সরিয়ে দিতে হবে এবং তা করতে হবে রাত পোহাবার আগেই। কিন্তু কি উপায়ে?

কোন বুদ্ধিই এর্ল না কোতোয়ালের মাথায়। গতকাল হলে তিনি ওদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে কিংবা গোপনে হত্যা করতে পারতেন এবং তাতে কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারত না। কিন্তু আজ ওসব পরীক্ষিত পন্থা কোন কাজেই আসবে না।

আজ ওরকম করলে কে বলতে পারে যে ওই পেশোয়ারীদের যুগল মাথার সঙ্গে একটি তৃতীয় মাথাও—অর্থাৎ তাঁর নিজের মাথাটাও যুক্ত হবে না?

হ্যাঁ, শেষ উপায় একটা আছে বটে, তবে সেটা তাঁর বহুমুখী গোপন কার্যকলাপের মধ্যে এখনও পরীক্ষা করে দেখেননি। উপায়টা হচ্ছে কারাগার থেকে বন্দীদের পলায়ন!

এটাই ঘটাবেন কোতোয়াল। চলে গেলেন তিনি তাঁর দফতরে। ওখানে রয়েছে তাঁর বিশ্বস্ত লোকজন। বিনা প্রশ্নে তাঁর আদেশ পালনের ব্যাপারে ওদের ওপর নির্ভর করা যায়। ওরা মুখ খুলবে না কোনদিন।

এখন দেখা যাক, যে পেশোয়ারী কয়েদীরা কোকন্দের প্রবল প্রতাপশালী কোতোয়ালের এত মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে, স্বয়ং রাজ্যের মালিক মহামান্য খানের কাছেও যারা অতখানি আগ্রহের পাত্র, ওরা কে। ওরা আসলে দু'জন অতি সাধারণ রাজমিস্ত্রি। কোকন্দে এসেছিল জীবিকার সন্ধানে। দু'জনেই প্রবীণ, জীবনে কখনও জাদু-টোনা বা প্রতারণার ধার ধারেনি। কোতোয়াল সেনাপতি ইয়াদগার বেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানর মতলবে এই নিরীহ সরল বিদেশী মানুষ দুটোকে রাস্তা থেকে ধরে এনে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ আর জাদু-টোনার অভিযোগের পরে মাটির নিচে অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। দেড় বছর পর সম্প্রতি একদিন ওদেরকে ওপরে কোতোয়ালের নির্যাতন কক্ষে নিয়ে গিয়ে প্রথমে একচোট মারধোর ও ধমক-ধামক দেওয়া হয়। তারপর, অনেকক্ষণ ধরে বোঝান হয় যে কোন্ এক মহিলাকে না পুরুষকে কারা নাকি জাদু-টোনা করে দাসী বা দাস বানিয়ে রেখেছে এবং কোন্ এক মহিলা বা পুরুষ নাকি কার উসকানিতে সেই মহিলা বা পুরুষটিকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনছে না। তারপরে কে যেন জাদুবলে এক বুড়ো সেনাপতিকে শরাফত নামক এক পার্শী মহিলার কিংবা এক পার্শী মহিলাকে শরাফত নামক এক বুড়ো সেনাপতিতে রূপান্তরিত করেছে। ওদেরকে বলা হয় এসব কথা স্বীকার করলে ওরা ছাড়া পাবে। বেচারা পেশোয়ারীদের মাথায় এসব কথা একেবারে তালগোল পাকিয়ে যায়। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না ওরা। তবে এসব আবোল-তাবোল কথাবার্তা আর জেরার পর একটি ব্যাপারে ওরা নিশ্চিত হয় যে এ জীবনে মুক্তির আশা নেই, জল্লাদের তলোয়ারের নিচে গর্দান ওদের যাবেই এই নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে ওরা সেদিন ফিরে যায় কয়েদখানায়। চরম হতাশার মধ্যে কাটতে থাকে তাদের অন্ধকারের দিন।

এমন অবস্থায় কোতোয়ালের আদেশে তিনজন কারারক্ষী গভীর রাতে গিয়ে ওদের হাতের কড়া পায়ের বেড়ি খুলে দিল এবং শেকলগুলো কেটে দিয়ে ওদেরকে তৃতীয়বারের মত ওপরে নিয়ে গেল। কোতোয়ালের পরিকল্পনা মত কাজ এগুতে লাগল খুব সাবধানে ও গোপনে। কিন্তু ওপরে নেওয়ার পরেই পেশোয়ারীরা বেঁকে বসল ওরা ভাবল যে ওদেরকে নিশ্চয়ই জল্লাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নিষ্ঠাবান মুসলমান ওরা, তওবা না করে জান দেবে কি করে? কাজেই ওরা একজন মোল্লা দাবি করে বসল।

কারারক্ষীরা অনেক বোঝাল যে ওদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, কাজেই ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু পেশোয়ারীরা বিশ্বাস করল না ওসব কথা। ওরা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—মোল্লা এসে তওবা না করালে ওরা এক পা-ও নড়বে না।

এদিকে মুহূর্তগুলো কেটে যাচ্ছে একের পর এক, সকাল আসছে ঘনিয়ে। রাত শেষ হয়ে গেলে জেল থেকে কয়েদী পলায়নের গোটা পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে।

তখন রক্ষীরা জোর করে পেশোয়ারীদেরকে কারাগারের বাইরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু এতেও কাজ হল না। ওরা এমন জোর চেঁচামেচি জুড়ে দিল যে তা শুনে অন্য কয়েদীরাও চীৎকার দিতে লাগল। জিন্দানখানাটি ছিল শাহী মহলের কাছে। ফলে আশঙ্কা দেখা দিল যে কয়েদীদের মিলিত চীৎকারের আওয়াজ শাহী মহল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অগত্যা কি করা দরকার তা জানার জন্য রক্ষীরা বাধ্য হয়ে কোতোয়ালের কাছে ছুটে গেল।

কোতোয়ালের বিশ্বস্ত মোল্লাটি ওই সময় উপস্থিত ছিল না। তিনি ভাবতে পারেননি যে তাঁর কয়েদীরা এতটা গোঁড়া ধর্মভীরু হতে পারে। গোপনীয়তার কারণে বাইরের কোন মোল্লাকেও এখন ডাকা যাবে না। কি করবেন কোতোয়াল? চট করে একটা নতুন বুদ্ধি আঁটলেন তিনি। বোকা পেশোয়ারীদের গাল দিতে দিতে তিনি তাঁর একজন অনুচরকে সাদা আলখেল্লা আর পাগড়ী পরে মোল্লা সেজে ওদের কাছে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

নকল মোল্লার মুখে সময় ও উপলক্ষ্যের সঙ্গে মানায় এমন কোন দোয়া-দরুদ কিছুই শোনা গেল না—কারণ ওসব সে জানত না। অভ্যাস দোষে দোয়া-দরুদের পরিবর্তে তার মুখ থেকে বেরুতে লাগল অশ্লীল গালাগালির স্রোত। ফলে, তার আসল পরিচয় কয়েদীদের কাছে ফাঁস হয়ে গেল

নকল মোল্লার বোকামির দরুন কোতোয়ালের পরিকল্পনাটা আবার ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হল। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তওবা করতে পারবে না ভেবে এবং এই অতি গুরুত্বপূর্ণ শেষ কাজটির ক্ষেত্রেও ওদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে দেখে পেশোয়ারীরা হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। ওদের প্রতি সহানুভূতিতে অন্য কয়েদীরাও গর্জন করে উঠল গোটা জিন্দানখানা কাঁপিয়ে।

ব্যাপারটা আবার জানান হল কোতোয়ালকে। রাগে দাঁতে দাঁত ঘষলেন তিনি। মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল তাঁর। সময় নষ্ট হচ্ছে। ভোর হয় হয়। তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ফাঁস হয়ে যাবে সব ফন্দি-ফিকির।

ভয়ের তাড়নায় এবং উপায়ান্তর না দেখে তিনি এবার এক চরম পন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

হুকুম দিলেন, 'কয়েদী পালিয়ে গেছে বলে ঘোষণা করো, পাগলা-ঘন্টি

বাজিয়ে দাও, ঢাক-ঢোল-দামামা বাজাও, ঢাল-তলোয়ারের আওয়াজ তোল, মশাল ঘুরিয়ে তুমুল হৈ-চৈ বাধিয়ে দাও। তারপর পেশোয়ারী হারামজাদাদের হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় ঠেসে চেঁচান বন্ধ করে মোটা পশমী বস্তায় পুরে দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চাপাও। তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সিপাহী বস্তাবন্দী পেশোয়ারীদের নিয়ে নগরের দক্ষিণ ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাও সীমান্তের দিকে। সীমান্তে বস্তাগুলো ফেলে দিয়ে চলে আস। তোমাদের নগরের বাইরে যাওয়া-আসা কেউ টের পাবে না। কারণ পলাতক কয়েদীদের ধরার জন্য আমি লোক পাঠাব উল্টো দিকে—অর্থাৎ উত্তর ফটকের দিকে।'

তাঁর আদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালিত হল। পাগলা-ঘন্টি বাজল, ঢাক-ঢোল-দামামা বাজল, মশাল জ্বলল, তুমুল শোরগোল হৈ-চৈ শুরু হল, চীৎকার শোনা গেল, 'ধর, ধর ওদেরকে, পাকড়াও!'

যেন এই মাত্র পাগলা-ঘন্টি শুনে ছুটে এসেছেন এরূপ ভাব দেখিয়ে কোতোয়াল এলেন তাঁর সাদা ঘোড়ায় চেপে। মশালের আলোর মধ্যে খোলা তলোয়ার ঘুরিয়ে জিন্দানখানার সামনে চক্কর দিতে দিতে নির্দেশ দিলেন, 'উত্তর দিকে যাও, উত্তরের ফটকের দিকে…'

অনুসরণকারীর দল ছুটে গেল তীর বেগে। সকলের আগে সাদা ঘোড়ার পিঠে স্বয়ং কোতোয়াল, হাতে তাঁর নাঙ্গা তলোয়ার।

ওদিকে বস্তাবন্দী পেশোয়ারীদের অবস্থা তখন সঙ্গীন। বাতাস না পেয়ে ওদের দম বন্ধ হবার উপক্রম।

দুই ঘন্টা অবিরাম চলার পর চার ঘোড়সওয়ার ওদের নিয়ে থামল এক পরিত্যক্ত গোরস্থানের কাছে ঘন ঝোপ-জঙ্গল আর কাঁটাবনের মধ্যে। তারপর বস্তা ঝেড়ে ওদেরকে বের করে দিয়েই সেপাইরা আবার ছুটল উল্টো দিকে।

এইভাবে সমাপ্ত হল কোতোয়ালের কয়েদী পলায়ন নাটকের সফল অভিনয়।

সাত

মাথা কাটা পুলে নতুন জ্যোতিষী

হোজা নাসিরুদ্দীন ও তাঁর কানা সাথী যে চা-খানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে কয়েদখানার এসব নৈশ হট্টগোলের আওয়াজ পৌঁছেনি।

বাজারের এক প্রান্তে চা-খানায় শুয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন ভাবছিলেন কিভাবে রহিম বাইয়ের কাছ থেকে অসহায় বিধবাটির গয়নার ন্যায্য দাম ছয় হাজার টাকা উদ্ধার করা যায়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি তাঁকে চমকে দিল। তড়াক করে উঠে বসলেন তিনি। কানাকে জাগিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কোকন্দের ঘোড়দৌড় কবে রে?' কানা বলল, 'ক'দিন পরেই তো হবে বলে শুনলাম কয়েকজনের মুখে।' কানাকে হোজা জানালেন বুদ্ধিটার কথা। কানা একগাল হেসে বলল, 'কি আশ্চর্য, বুদ্ধিটা আমার মাথায় আসেনি। ঠিক আছে, এবার হোঁৎকা রহিম জব্দ হবে।'

পরদিন খুব ভোরে উঠেই হোজা নাসিরুদ্দীন বাজারে গিয়ে একটা ছেঁড়া কার্পেট, একটা লাউয়ের খোল, একটি প্রাচীন চীনা পুঁথি একটা আয়না, এক ছড়া তসবী এবং আরও টুকিটাকি অনেক জিনিস কিনলেন। তারপর সাই নদীর তীর ধরে এগিয়ে হাজির হলেন 'মাথাকাটা' পুলের ওপর। পুলটির এই ভীতিকর নাম হয়েছে এ কারণে যে এককালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মাথা কেটে এখানে ঝুলিয়ে রাখা হত। এখন কাটা মাথা এখানে না ঝুলিয়ে অন্যত্র ঝোলান হলেও নামটা রয়ে গেছে। পুলটা এখন নানা ধরনের ঝাড়ফুঁককারী, গুণিন, আর জ্যোতিষীদের আড্ডা।

জনা পঞ্চাশেকের মত গুণিন আর জ্যোতিষী ওখানে সব সময় থাকে। যারা বেশি নামী আর মানী তারা বসে পুলের পাশে চওড়া পাথুরে পাঁচিলের ওপর অন্যরা সুবিধামত যে-কোন জায়গায় বসে। প্রত্যেকের সামনে বিছান কার্পেটের ওপর সাজান থাকে নানা উপকরণ সীসের বাঁচি, ইঁদুরের হাড়, গুল-কুনারের

পবিত্র ঝরনার পানি ভর্তি লাউয়ের খোল, কাছিমের খোল, তিব্বতি লতাগুল্মের বীজ এবং আরও অনেক জিনিস। অনেকের কাছে রয়েছে নানা আকারের পুরানো, ছেঁড়াখোড়া, মলাট আর পাতা খসে যাওয়া হরেক রকমের আঁকজোক ও নকশাওয়ালা পুঁথি-কেতাব। সেগুলো দেখে আনাড়ী লোকদের মনে ভয়-বিশ্বাস জেগে ওঠে। সর্দার জ্যোতিষীর সামনে রয়েছে একটা মরা মানুষের খুলি। কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে এটা সে রেখেছে। আর সব জ্যোতিষীর পরম ঈর্ষার বস্তু এই খুলিটি।

হোজা নাসিরুদ্দীন গিয়ে দাঁড়ালেন সর্দার জ্যোতিষীর সামনে। বুড়ো, একেবারে হাড্ডিসার লোকটা। বিনীতভাবে তাকে সালাম দিয়ে হোজা জিজ্ঞেস করলেন তিনি কোন্ জায়গাটায় কার্পেট পাতবেন।

সর্দার জ্যোতিষী বিরক্তির সুরে প্রশ্ন করল, 'কোন্ ধরনের জ্যোতিষ চর্চা করতে চাও তুমি?'

অন্য জ্যোতিষীরা বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল নয়া আগন্তুককে এবং কি কথাবার্তা হয় শুনছিল। বাঁ পাশের মোটাসোটা একজন বলে উঠল, 'আরেক চিড়িয়া।'

'আমাদের এখানে এমনিতেই জ্যোতিষীর ভীড়,' বলল আরেকজন।

'গতকাল আমার দশ টাকাও রোজগার হয়নি,' বলল তৃতীয় জন।

'ব্যাটারা কোত্থেকে এসে জোটে কে জানে,' বলল চতুর্থ জন।

হোজা জানতেন যে এর চাইতে ভাল অভ্যর্থনা তিনি এখানে পাবেন না। সেজন্য নম্রভাবে বললেন, 'মানুষের ভাগ্য গণনাকারী জ্ঞানী ভাইসব, আমার কাছ থেকে আপনারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয় করবেন না আমি ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রেম-ভালবাসা, জন্ম-মৃত্যু, এসব বিষয়ে কাজ করি না। আমি কেবল চুরি ও চোরাই মাল উদ্ধার নিয়ে কাজ করি। এবং বিনা অহঙ্কারে আমি বলতে পারি যে এই ক্ষেত্রে আমার জুড়ি নেই কোথাও।'

'চুরি?' বলল, সর্দার জ্যোতিষী। হেসে উঠল সে হো হো করে। 'তাহলে যে-কোন জায়গায় বসে যাও একটা কড়িও তোমার রোজগার হবে না।'

সেই হাসিতে যোগ দিয়ে অন্যরাও বলে উঠল, 'একটা কড়িও না।'

বুড়ো বলল, 'আমাদের শহরে তোমার সুবিধে হবে না। কোকন্দে চুরি বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি হিরাত কিংবা খোরেজম চলে যাও।'

'চলে যাব? পকেটে মাত্র আটটি টাকা নিয়ে কোথায় যাব আমি?' বিষণ্ন স্বরে বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লেন।

কারবার শুরু হল পুরোদমে। চিররহস্যে ঘেরা ভবিষ্যৎ জানার জন্য ভাগ্য তাড়িত ও বিড়ম্বিত মানুষেরা এসে ভীড় জমাতে লাগল জ্যোতিষীদের কাছে।

একটি বিধবা এসে এক জ্যোতিষীকে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'দেখুন তো একটু, নয়া সাদিতে আমি সুখী হব কিনা?'

'হ্যাঁ হবে; যদি একটা কালো ঈগল সূর্য উদয়ের সময় উড়ে এসে তোমার জানালায় না বসে।' জবাব দিল জ্যোতিষী। 'আর ইঁদুরে চাটা বাসনপত্রের ব্যাপারে সাবধান থেকো। ওসব বাসনপত্র থেকে কোন কিছু খেয়ো না।'

এক ব্যবসায়ী এসে প্রশ্ন করল আরেক জ্যোতিষীকে, 'সমরখন্দের এক লোক আমার কাছে ১৮ গাঁট পশম বেচতে চায়। এটা কিনলে কি আমার লাভ হবে?' ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ জ্যোতিষীটি কিছুক্ষণ তার ইঁদুরের হাড় গুনল, সীমের বীচি নাড়াচাড়া করল, তারপর মুখচোখে গুরুগম্ভীর ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'কিনে ফেলুন, কিন্তু সাবধান, দাম দেবার সময় আপনার চারদিকে একশ' হাতের মধ্যে যেন কোন টাকমাথা লোক না থাকে।'

এমনিভাবে চলল জ্যোতিষীদের কারবার।

এদিকে একদিন দু'দিন তিনদিন গেল হোজা নাসিরুদ্দীনের কাছে কেউ এল না চোরের খবর নিতে কিংবা চোরাই মাল উদ্ধারের তদবিরে। এই ব্যর্থতার জন্য অন্য জ্যোতিষীরা তাঁকে টিটকিরি দিয়ে নানা কথা বলতে লাগল। চুপ করে তিনি এসব সয়ে গেলেন।

চতুর্থ দিন এক দুঃসাহসিক চুরির খবর ছড়িয়ে পড়ল শহরে। শহরের সকল লোক বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গেল। হোঁৎকা রহিম বাই যে দুটো আরবী ঘোড়া এনেছে আসন্ন প্রতিযোগিতার জন্য এবং খুব যত্নের সঙ্গে লোকের নজর থেকে লুকিয়ে রেখেছে, ওগুলো রাতে তার গোপন আস্তাবল থেকে চুরি হয়ে গেছে। এমন চুরির কথা আগে কোনদিন কেউ শোনেনি।

সেদিন বিকেল বেলা গোটা শহরে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হল যে, ঘোড়া দুটো যে ব্যক্তি উদ্ধার করতে বা ওদের সন্ধান দিতে পারবে তাকে পাঁচ শ' রুপোর টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

জ্যোতিষীরা ব্যঙ্গের সুরে হোজা নাসিরুদ্দীনকে বলল, 'কি মিঞা, দেরি করছ কেন? যাও না, পাঁচ শ' টাকা রোজগার করে নাও।'

একজন বলল, 'পাঁচ শ' টাকায় ওর মন উঠবে না, পাঁচ হাজার হলে ও যাবে।'

হোজা নাসিরুদ্দীন অতিকষ্টে রাগ দমন করে চুপচাপ বসে রইলেন।

এদিকে উত্তেজনায় সারা শহর তোলপাড়। রহিম বাই ঘোড়ার শোকে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। কোতোয়ালের অবস্থাও কাহিল। পেশোয়ারী কয়েদীদের রহস্যময় পলায়নের ব্যাপারে তাঁর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ আর তিরস্কারে খান তাঁকে একেবারে ঝাঁঝরা করে ছেড়েছেন। তাঁর শরীর মন দুই-ই ভেঙে পড়ার অবস্থা। এমন সময় ঘটল এই ঘোড়া চুরির ঘটনা। না জানি এটা নিয়ে খানের

কাছে তাঁর কি হেনস্তা হয়।

রাতে খান তাঁকে সত্যিই ডাকলেন। সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে খান একাই কথা বললেন, আর কোতোয়াল কেবল কুর্নিশ করলেন, মাথা নিচু করে শুনলেন, দুই চোখ ও হাত উপরে তুলে প্রার্থনার ভঙ্গি করলেন। সেখান থেকে ফিরে এসেই তিনি তলব করলেন তাঁর বড় আর মাঝারি অনুচরদের। ওদেরকে তিনি যা বললেন সেটা খান তাঁকে যা বলেছেন তার চাইতে সংক্ষিপ্ত। ওরা গিয়ে তলব করল ওদের অধীনস্থ ছোট কর্তাদের এবং মাত্র দু'একটা কথায় বক্তব্য শেষ করল। ছোট কর্তারা তলব করল সাধারণ প্রহরী ও চোরদের এবং একটি কথাও না বলে শুধু চোখ-ঘুসি দিয়েই সাক্ষাৎকার শেষ করল।

সেই রাতে কোকন্দ যেন এক বিভীষিকার শহরে পরিণত হল। রাস্তায় রাস্তায় অলিতে গলিতে বর্শা ঢাল তলোয়ার আর মশাল নিয়ে সেপাই শান্ত্রী আর চরেরা ছুটাছুটি করল পাগলের মত। শত শত গুপ্তচর ঝোপঝাড়ের আনাচে-কানাচে, গাছপালার আড়ালে ওঁতপেতে রইল ঘোড়াচোর ধরার জন্য। তল্লাশি চলল প্রত্যেক চা-খানায়, সরাইখানায়। হোজা নাসিরুদ্দীন যেখানে ঘুমাতেন সেই চা-খানায়ও তল্লাশি হল। তাঁর মুখেও মশালের আলো ফেলে ওরা দেখল। তাঁর কানা-চোর সেই রাতে সেখানে ছিল না।

পরদিন সকালেও শান্তি ফিরল না শহরে। দুপুরের দিকে বিরাট দলবল নিয়ে কোতোয়াল দেখা দিলেন মাথাকাটা পুলের ওপর। তাঁর দু'চোখে আগুন, গোঁফ কম্পমান, গলার আওয়াজ ভয়ঙ্কর। পুলের দু'দিকে রক্ষীদল মোতায়েন করে তিনি সর্দার জ্যোতিষীর সঙ্গে ঘোড়া চুরি এবং ঘোড়া উদ্ধার বিষয়ে গোপন কথাবার্তা শুরু করলেন। কিন্তু সর্দার জ্যোতিষী তাঁকে কোন সমাধান দিতে পারল না। সে বলল যে তার অধিনস্থ সকল ভৌতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে চেষ্টা করবে চোর ধরার ও ঘোড়া উদ্ধারের। কিন্তু এই ফাঁকা কথায় কোতোয়াল খুশি হলেন না। একে একে আর সব জ্যোতিষীকেও তিনি ডাকালেন। কিন্তু তারাও এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারল না। আনাড়ী লোককে ধাপ্পা দেয়া যায়, কোতোয়ালকে নয়। কোতোয়ালের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে মাথা নিচু করে রইল জ্যোতিষীরা। হোজা নাসিরুদ্দীনকে ডাকার পর তিনিও বললেন যে সন্দেহজনক কিছুই তাঁর নজরে পড়েনি। এমন সময় হঠাৎ একপাশ থেকে বিদ্বেষপূর্ণ স্বরে কে একজন বলে উঠল, 'কেন, তুমি না বলেছ যে চোরাই মাল উদ্ধারে তোমার জুড়ি নেই কোথাও?'

'উদ্ধার' কথাটা শোনা মাত্রই কান খাড়া হয়ে গেল কোতোয়ালের। হুঙ্কার দিয়ে বললেন তিনি, 'তাহলে চুপ করে রয়েছ কেন জ্যোতিষী? আমি তোমাদের পাপের বাসা ভেঙে গুড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দেব। এই রক্ষীরা, ধর এই ব্যাটাকে, লাগাও বেত যতক্ষণ না পাঁজি বদমাশটা চোরাই ঘোড়ার হদিস দেয়। নতুবা এখানে সকলের সামনে সে স্বীকার করুক যে সে একটা মিথ্যুক।'

রক্ষী হোজা নাসিরুদ্দীনের পিরানটি ছিঁড়ে ফেলল। দু'জন ছুটে এল দুটো চাবুক নিয়ে। আর দেরি করা বিপজ্জনক দেখে অতি বিনীতভাবে তিনি বললেন, 'মহামান্য মালিকের পায়ের তলায় আপনার অধম গোলাম একটা আর্জি পেশ করতে চায়। মেহেরবানি করে তা শুনুন। সত্যি, আমি চোরাই মালের হদিস বের করি এবং চোরাই ঘোড়ার সন্ধান দিতে পারি।'

'তুমি পারো? তাহলে এতক্ষণ তা করোনি কেন?'

'মহামান্য প্রভু, এটা করতে গেলে যার জিনিস চুরি হয়েছে তার উপস্থিতি প্রয়োজন, নতুবা গণনা কার্যকর হয় না।'

'ঘোড়া উদ্ধার করতে তোমার কত সময় লাগবে?'

'আজ সূর্যাস্তের আগেই যদি চোরাই ঘোড়ার মালিক আমার সামনে হাজির হয় তাহলে এক রাতের মধ্যেই কাজ হয়ে যাবে।'

হোজার এই জবাবে উপস্থিত সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। সকলে, বিশেষ করে অন্য জ্যোতিষীরা বিস্ময়ে কানাকানি করতে লাগল।

ক্রুদ্ধ এবং বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে কোতোয়াল বললেন, 'আমার মুখের ওপর মিথ্যা বলতে তুমি সাহস করছ?'

'আমি মিথ্যে বলছি না, প্রভু।

'ঠিক আছে, দেখা যাবে। এই রক্ষীরা, ব্যবসায়ী রহিম বাইকে এখানে হাজির কর।'

অনুচরদের একজন জানাল যে রহিম বাই অসুস্থ। সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠলেন কোতোয়াল, 'আমি অসুস্থ নই? দু'রাত দু'চোখ এক করতে পারিনি। আমি তার জাহান্নামী ঘোড়া খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর সে শুয়ে আছে পালঙ্কে। যাও, খাটিয়ায় তুলে নিয়ে এসো তাকে।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই নিয়ে আসা হল রহিম বাইকে। বুকে হাত চেপে কোঁকাতে কোঁকাতে মাথা নুইয়ে কোতোয়ালকে সালাম জানিয়ে বিদ্রূপের সুরে রহিম বাই বলল, 'স্বনামধন্য ও সর্বশক্তিমান কামিল বেককে বান্দা সালাম জানাচ্ছে। কোন্ কারণে তিনি রোগশয্যা থেকে তুলে এনেছেন তাঁর এই অধম দাসকে, যে কিনা এই শহরে চোরের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না?'

'যোগ্য রহিম বাইকে তলব করেছি এই কারণে যে আমি দেখাতে চাই, তাঁর ঘোড়া উদ্ধারে আমরা নিশ্চেষ্ট নই। আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং চিন্তিত।'

'মাননীয় কামিল বেকের চিন্তার কি আছে? তাঁর তেকিন ঘোড়াদের বাজি জেতা এখন কি নিশ্চিত নয়?'

এটা একেবারে সরাসরি মুখের ওপর আঘাত। কোতোয়ালের মুখটা সাদা হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'ঘোড়া হারানর দুঃখ ও তজ্জনিত রোগে আমাদের যোগ্য রহিম বাইয়ের বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এখানে আপনার সামনে একজন

জ্যোতিষী দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজেকে অসাধারণ দক্ষ বলে দাবি করছে এবং বলছে যে আপনার ঘোড়া সে বের করে দিতে পারবে।'

'জ্যোতিষী? এরই জন্য আমার মহামান্য প্রভু আমাকে রোগশয্যা থেকে তুলে এনেছেন? না, আমার সহৃদয় প্রভু নিজেই তাঁর ভাগ্য গণিয়ে নিন, আমি চললাম,' এই বলে রহিম চলে যাওয়ার উপক্রম করল।

বরফ-ঠাণ্ডা গলায় কোতোয়াল বললেন, 'এই শহরে হুকুম দেবার মালিক আমি পরম যোগ্য রহিম বাই এখন দয়া করে জ্যোতিষীর সঙ্গে আলাপ করবেন।'

মুখে বিরক্তির ভঙ্গি করেও রহিম বাই হুকুম মেনে নিল। হোজা নাসিরুদ্দীনের সামনে গিয়ে সে বলল, 'তোমাদের ওপর আমার এক কানাকড়ি পরিমাণও বিশ্বাস নেই। কর্তৃপক্ষের হুকুম, তাই বলছি, আমার আস্তাবল থেকে দুটো ভাল জাতের আরবী ঘোড়া চুরি হয়েছে।'

চীনা বইটি খুলে হোজা বললেন, 'একটা সাদা, একটা কালো।'

'আরে মহাজ্ঞানী জ্যোতিষী, সে তো শহরের সবারই জানা। আরব থেকে আনবার সময় বহু লোক ওদের দেখেছে।' ব্যঙ্গের সুরে বলল রহিম বাই।

'সাদাটির ঘাড়ের কেশরের নিচে পশমী সুতোর চাইতে মোটা নয় এমন একটা কাটা দাগ আছে, আর কালোটার বাঁ কানের ভেতরে মটর দানার মত একটা আঁব আছে।'

রহিম বাই থ' খেয়ে গেল। এ দুটো চিহ্নের খবর সে আর তার বিশ্বস্ত সহিস ছাড়া আর কেউই জানত না।

চীনা কেতাবের আরেকটি পৃষ্ঠা উল্টে হোজা বললেন, 'সাদা ঘোড়াটার লেজে একটা মন্ত্রপূত সাদা রেশমী সুতো, আর কালোটির লেজে কালো রেশমী সুতো জড়ান আছে।'

এই কথা শুনে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল রহিম বাইয়ের। প্রতিযোগিতার ঘোড়াকে তুকতাক করা বে-আইনী।

কোতোয়াল ভাবল এই জ্যোতিষীটাকে শয়তানই জুটিয়ে দিয়েছে। ব্যাটা ঘোড়াগুলোকে বের করে ফেলবে দেখা যাচ্ছে। তা করুক সে। এখন আমি যদি তুকতাকের কথা তুলে রহিম বাইকে চেপে ধরি তাহলে ঘোড়া উদ্ধার হলেও তদন্ত শেষ হওয়ার আগে প্রতিযোগিতায় ওগুলোকে সে নামাতে পারবে না।

গম্ভীর স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এ-ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে জনাব রহিম বাই?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রহিম বাই বলল, 'রেশমী সুতো-টুতোর কথা আমি কিছু জানি না। আস্তাবলের চাকরেরা হয়ত লাগিয়ে থাকবে আমাকে না জানিয়ে, কিংবা আগের আরবী মালিকেরা হয়ত লাগিয়েছিল···'

এ পর্যন্ত বলেই তার মনে পড়ল ঘোড়া তো এখনও চোরের হাতে। তার

বিরুদ্ধে তুকতাক জাদু টোনার কোন প্রমাণ নেই। কাজেই ভয় কিসের? চিৎকার করে সে বলে উঠল, 'সব মিথ্যা কথা, জ্যোতিষী ব্যাটা মিথ্যুক, কুৎসা রটনাকারী। আমার ঘোড়া পাওয়া গেলে…'

তাকে বাধা দিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'ঘোড়া পাওয়া যাবে আগামীকাল। থামুন, আমার কেতাব আরও কিছু বলবে। কেতাব বলছে যে সাদা ঘোড়াটির ডান পায়ের খুরে পরানো নালে একটা মন্ত্রপড়া সোনার পেরেক ঠুকে ওপরে ধূসর রঙ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে চোখে না পড়ে। কালোটির নালেও ওরকম জাদুর পেরেক লাগান হয়েছে।'

আতঙ্কে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলল রহিম বাই।

শয়তানি হাসি হেসে কোতোয়াল নিচু কণ্ঠে বলল, 'হুঁম, জাদুর পেরেক, মন্ত্রকরা রেশমী সুতো! সরকারী দায়িত্বের কারণে তদন্ত শুরু করতে আমি বাধ্য হচ্ছি।'

রহিম বাই পেশাদার মিথ্যাবাদী। ব্যবসার খাতিরে মিথ্যা বলতে বলতে মুখ শক্ত হয়ে গেছে তার। সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে বলল, 'এই জ্যোতিষীটা কি বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় শুধু তার দাম বাড়ানর জন্য সে এসব বলছে। সে বলুক, কত মজুরি চায় এবং তার গণনা যে মিথ্যা হবে না তার নিশ্চয়তা কি?'

হোজা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন রহিম বাই-এর মনের কথা। রহিম বাই-এর মনে কোন সন্দেহ নেই যে জ্যোতিষীটি অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে। তার মনে এক দিকে ঘোড়া ফিরে পাওয়ার আগ্রহ, অন্য দিকে তুকতাক জাদু-টোনার দায়ে কয়েদখানায় যাওয়া—এই দু'য়ের দ্বন্দ্ব চলছে। এই সঙ্কট থেকে জ্যোতিষী ছাড়া আর কে তাকে উদ্ধার করতে পারে?

'দাম-দর পাওনা-দেনা ঠিক হবে শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যে,' বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'তৃতীয় কেউ এ আলোচনায় যোগ দিতে পারে না?' জানতে চাইলেন কোতোয়াল।

'না, তাহলে আমার গণনা খাটবে না।'

অগত্যা কোতোয়াল সরে গেলেন এক পাশে। তাঁর আদেশে অন্যরাও সবাই সরে গেল।

তখন রহিম বাই বলল, 'ওই পেরেকগুলো আর রেশমী সুতো কোত্থেকে এল বুঝতে পারলাম না।'

'তাও এখনি বের করে দিচ্ছি,' বলে হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর চীনা কেতাবের দিকে হাত বাড়ালেন।

'থাক, থাক, জ্যোতিষী,' বাধা দিল রহিম বাই। 'ওটা গতকালের ঘটনা, অথচ

আমাদেরকে ভাবতে হবে…'

'আগামীকালের, ভবিষ্যতের কথা,' যোগ করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'ঠিক বলেছ, জ্যোতিষী! ঘোড়াগুলোকে যদি তাদের আগের অবস্থায়…অর্থাৎ কিনা…কি সে বলে…ফিরিয়ে আনা যায়।'

'আপনি বলতে চান, পেরেক আর রেশমী সুতো ছাড়া, তাই না?'

'আহ্, অত জোরে বলছ কেন! এখন তোমার দাবি কত বল।'

আমার দাবি সামান্য, মহাজন সাব, মাত্র দশ হাজার টাকা।'

'দ-শ হাজার! হায় আল্লাহ, এ যে ঘোড়া দুটোর দামের অর্ধেক। আরব থেকে ওগুলোকে আনতে আমার মোট বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।'

'কিন্তু আপনি তো মহামান্য কামিল বেককে অন্য দাম বলেছেন সেদিন আপনার দোকানে বসে। আপনি বলেছেন বাহান্ন হাজার টাকা খরচ হয়েছে।'

বিস্ময়ে চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল রহিম বাই-এর। লোকটা কি সর্বজ্ঞ? কিছুই কি জানা নেই এর? একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রহিম বাই বলল, 'এই সব খবর কি তুমি ওই বইটির মধ্যেই পাও?'

'হ্যাঁ।'

'অদ্ভুত বই! কোথায় পেলে ওটি?'

'চীন দেশে।'

'চীনে এরকম আরও অনেক বই পাওয়া যায়?'

'দুনিয়ার মধ্যে ওটাই একমাত্র বই।'

'ওরকম একশটা বই থাকলে আমাদের মত কারবারীদের অবস্থা কি হত আল্লাহ জানেন! ওটা তুমি বন্ধ করে রাখ জ্যোতিষী, ওসব চীনা লেখা দেখলে আমার ভয় হয়। ঠিক আছে, দশ হাজারে আমি রাজি।'

'আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করবেন না মহাজন!'

'আমি নিরস্ত্র, আর তোমার হাতের ওই বইটি ধারাল তরবারির মত। তোমাকে ঠকানো সম্ভব নয়।'

'আগামীকাল আপনার ঘোড়া পেয়ে যাবেন। চুক্তিমত সুতো আর পেরেক ছাড়া। দশ হাজার টাকার সোনার মোহর একটা থলেতে ভরে নিয়ে আসবেন। আসুন, এবার আমরা শেষ কাজটি করে ফেলি।'

এই বলে হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর লাউয়ের খোলে রক্ষিত পবিত্র পানি ছিটিয়ে দিলেন রহিম বাই ও নিজের গায়ে।

দূর থেকে কোতোয়াল, রক্ষীদলের কর্তা, রক্ষীরা ও অন্যান্য জ্যোতিষীরা নীরবে এই দৃশ্য দেখল।

দশ হাজার টাকায় চুক্তি হয়েছে শুনেই সর্দার জ্যোতিষী মাথা ঘুরে পড়ে মূর্ছা গেল। অন্যরা হতবাক। কোতোয়াল অর্থপূর্ণভাবে কেশে শুধু মুচকি হাসলেন, কিছু

বললেন না। কিন্তু রহিম বাই বাড়ির পথে রওনা হতেই এক দঙ্গল চর তার পিছে পিছে চলল।

ব্যাপারটা লক্ষ করে হোজা নাসিরুদ্দীন ভাবলেন, 'তার মানে আমিও ওদের নজর এড়াতে পারব না।' পেছনে তাকাতেই তিনি দেখলেন তাঁর পেছনে তিনজন এবং পাশে একজন চর। কোতোয়াল হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডেকে বললেন, 'জ্যোতিষী, মনে রেখ, আমার উপস্থিতি ছাড়া রহিম বাইকে ঘোড়া ফিরিয়ে দেয়া চলবে না। আর এ-ব্যাপারে তোমার বেশি তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। দেখো, রেশমী সুতো আর পেরেক যেন অদৃশ্য হয়ে না যায়। তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে, যাও।'

কার্পেট গুটিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন 'মাথাকাটা পুল' থেকে নেমে গেলেন। চরেরা চলল তাঁর পিছু পিছু।

চা-খানায় গিয়ে তিনি নামাজ পড়লেন যাতে কেউ অভিযোগ করতে না পারে যে শয়তানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। তারপর চীনা কিতাব খুলে ওটা পড়ার ভান করতে লাগলেন। চরেরা লিখে নিল এসব তাদের নোট বইতে। হোজা মনে মনে স্থির করলেন, 'আমি সৎ থাকব। ঘোড়াগুলো পেরেক আর রেশমী সুতো ছাড়াই রহিম বাইকে ফেরত দেব। তারপর কোতোয়ালের আক্রোশ থেকে বাঁচার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যাব।'

কানা চোর উপস্থিত হল চা-খানার সামনের রাস্তায়। চরদের দেখে সে সবই বুঝল এবং হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে একবারও না তাকিয়ে চলে গেল।

মিনিট খানেক পরে চা-খানার গোটা মেঝে জুড়ে পাতা কাঠের চৌকির নিচে অতি মৃদু টোকার শব্দ হল।

হোজা নাসিরুদ্দীন যেন তাঁর সামনে দাঁড়ানো কোন অদৃশ্য প্রেতাত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন এমনি ভঙ্গিতে অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি শুনছি! আমি দেখছি!' তিনি ঝুঁকে পড়লেন পবিত্র পানিভর্তি লাউয়ের খোলের ওপর। চরেরা ছুটে এল চারদিক থেকে। 'আমি ঘোড়াগুলো দেখছি, একটা সাদা একটা কালো। আমি তাদের কেশর দেখতে পাচ্ছি, আমি তাদের পায়ের খুরে কোন রকম মিশ্রণ ছাড়া খাঁটি লোহার নাল দেখতে পাচ্ছি, আমি তাদের পরিপাটি যত্নের সঙ্গে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো বলিষ্ঠ লেজ দেখছি। এভাবেই তারা আগামীকাল আমার সামনে উপস্থিত হোক, প্রকৃতি তাদেরকে যা দিয়েছে তাই নিয়ে তাদের অঙ্গে বা লোমে অন্য কোন জিনিসের ভেজাল না নিয়ে। উমুরু···শাহ্‌রা···দ্রিমাচা···মাংখারু···হিংরা···সিনচিং···'

চৌকির তলায় নখের আঁচড়ের একটা ক্ষীণ শব্দ হল। এর অর্থ হল এই যে কানা চোর হোজা নাসিরুদ্দীনের বক্তব্য শুনেছে ও বুঝেছে এবং এখনি কাজে লেগে যাবে। এটা আগে থেকে স্থির করা সঙ্কেত।

এরপর কেতাব বন্ধ করে হোজা নাসিরুদ্দীন শুয়ে পড়লেন। একটানা ঘুমালেন পরদিন ভোর পর্যন্ত।

পরদিন সকালের মাথা-কাটা পুল লোকে লোকারণ্য। গোটা শহরের মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে চোরাই ঘোড়া উদ্ধারের দৃশ্য দেখতে। কোতোয়াল আর রহিম বাই ভোর থেকেই হাজির। হোজা নাসিরুদ্দীন এসে পৌঁছতেই রহিম বাই চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার ঘোড়া কই, জ্যোতিষী?'

'আমার সোনার মোহর কই?'

কোমরবন্ধের নিচ থেকে একটা মোটা থলে বের করে রহিম বাই বলল, 'এই যে এখানে, পুরো দশ হাজার টাকার সোনার মোহর, গুণতে হবে না।'

হোজা নাসিরুদ্দীন নীরবে কার্পেটটি বিছিয়ে বসে পড়লেন। উত্তেজনায় অধীর হয়ে রহিম বাই তাঁকে ফিসফিস করে বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, দেরি করছ কেন?' হোজা তাঁর চীনা বই-এর দিকে চেয়ে রইলেন, জবাব দিলেন না। রহিম বাই তড়পাতে লাগল বুকে হাত চেপে।

কিছুক্ষণ পরে হোজা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কেতাব বলছে যে ঘোড়াগুলো তাদের প্রকৃতির দেওয়া চেহারা নিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসবে।'

শুনে রহিম বাই মহাখুশি।

'আপনার ঘোড়া চোমাক গাঁয়ের কাছে পুরানো খনির নিচে বাঁধা আছে,' বললেন হোজা।

'পুব পাশ থেকে খনির ভেতর নেমে বিশ কদম এগিয়ে গেলে ডান দিকে একটা গুহা। সেই গুহার মধ্যে আপনার···'

তাঁর কথা শেষ করার আগেই পুলের এক পাশ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল রহিম বাই-এর সহিসরা, অন্য পাশ থেকে ছুটে গেল কোতোয়ালের রক্ষীরা খটখট আওয়াজ তুলে ধুলো উড়িয়ে।

চোমাকের দূরত্ব ওখান থেকে বেশি নয়। আধ ঘন্টার মধ্যে ঘোড়সওয়ারদের ফিরে আসার কথা।

জনতা অধীর, চঞ্চল হয়ে উঠল। রহিম বাই উত্তেজনায় কাঁপছে। কিন্তু কোতোয়াল অচঞ্চল। পাথরের মত মুখ করে উদ্ধত ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ এক গাছের উঁচু ডালে বসা একটা ছেলে চিৎকার করে উঠল, 'ওরা আসছে! ওরা আসছে!'

জনতা দু'ভাগ হয়ে পথ তৈরি করে দিল। হুড়মুড় করে এসে পড়ল ওরা, কিন্তু সাদা বা কালো কোন আরবী ঘোড়াই নেই ওদের সঙ্গে।

কিভাবে কি ঘটল তা বুঝবার আগেই রক্ষীরা হোজা নাসিরুদ্দীনকে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

'থাম থাম, তোমাদের আল্লাহর দোহাই, থাম। ঘোড়াগুলো গুহার মধ্যে ছিল।

এই দেখ লাগাম দুটো পাওয়া গেছে ওখানে। জ্যোতিষীকে ছেড়ে দাও…' চিৎকার করে বলল রহিম বাই।

কিন্তু তার চেঁচামেচিতে কোন ফল হল না। রক্ষীরা হোজা নাসিরুদ্দীনকে চোরের মত টেনে নিয়ে গেল।

আট

জিন্দান থেকে মুক্তি

কোকন্দের কারাগার বা জিন্দানখানাটি সাক্ষাৎ জাহান্নাম। মাটির নিচে এক বিরাট গর্ত, ওপরে ছাদ। ছাদের তিনটি ছিদ্র পথে ভেতরের জমাট দুর্গন্ধ বেরিয়ে যায়। খানের রাজকোষ থেকে কয়েদীদের জন্য একটি কপর্দকও ব্যয় করা হয় না। আত্মীয় পরিবার খাবার যোগায় নিজ নিজ লোকের জন্য, আর যাদের কেউ নেই তাদের ভরসা পথিকের দেয়া ভিক্ষা। ওপরে ভিক্ষাপাত্র থাকে। দয়া হলে কেউ কিছু দিয়ে যায়, না দিলে উপোষ। উপরের প্রবেশ পথে বসে থাকে কারারক্ষী ও তাঁর প্রধান সহকারী আবদুল্লাহ বৈরাম—এক বিশালদেহী দানব। আর আছে এক খাটো কপাল ঠোঁট-কাটা আফগান—আবদুল্লার সহকারী। এই দু'জনের হাত-পা চাবুকের স্পর্শে সেই জাহান্নামের গর্ভ থেকে সারাদিন চিৎকার আর কান্নার রব ওঠে।

এই জিন্দানখানায় নিক্ষিপ্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে গেলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। কিছু সময় লাগল তাঁর হুঁশ ফিরে পেতে। অন্ধকার চোখে একটু সয়ে উঠতেই তিনি দেখলেন চারদিকে অসংখ্য কয়েদী। ক্রোধ ও করুণায় হৃদয় জ্বলে গেল তাঁর। এমনকি তিনিও, যে কিনা অনেক দেখেছেন এ দুনিয়ার, কোনদিন ভাবতে পারেননি যে এরকম একটা জঘন্য বীভৎস স্থান কোথাও থাকতে পারে। যাক, তাঁকে এখন ভাবতে হচ্ছে নিজের ভাগ্যের কথা, কেমন করে কি ঘটল সেকথা। ব্যাপারটা তাঁর কাছেও জটিল ও দুর্বোধ্য ঠেকছে।

ঘোড়াগুলো কোথায় গেল? কেমন করে উধাও হল? রহিম বাই তো তাদের লাগাম সনাক্ত করেছে। তার মানে ওরা খনির গুহায় ছিল। কোতোয়াল তার অনুচরদের দিয়ে সরিয়ে ফেলেনি তো? কানা চোরই বা গেল কোথায়, কি হয়েছে তার? সে নিজেই ঘোড়াগুলোকে অন্য কোন শহরে নিয়ে গিয়ে বেচে ফেলেনি তো? না, কানা আজন্ম চোর হলেও বেঈমান নয়, বিশ্বাসঘাতক নয়।

জিন্দানখানার অন্ধকার গহ্বরে বসে হোজা নাসিরুদ্দীন যখন এসব ভাবছেন তখন মাথাকাটা পুলের ওপর চলছে আরেক নাটক।

অক্ষম ক্রোধে মুখচোখ লাল করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রহিম বাই কোতোয়ালকে বলছে, 'ঘোড়া পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, পাওয়া গেছে বলা যায়। লাগাম পাওয়া গেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমাদের মাননীয় কামিল বেক গণনা বন্ধ করে দিয়ে জ্যোতিষীকে জিন্দানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মহান কর্তার ভুল করা উচিত হবে না। তাঁর মতলব আমি বুঝে ফেলেছি। খানের প্রাসাদে আমি অপরিচিত নই। তাঁর পায়ে পড়ে আমি আশ্রয় ও বিচার চাইব।'

ঘৃণা মিশ্রিত উপেক্ষায় এসব শুনলেন কোতোয়াল, তারপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'জ্যোতিষীটা অনেক দুষ্কার্য করেছে, এবং সেজন্যই আমি তাকে জিন্দানে পাঠিয়েছি। গতকালই তাকে আটক করতাম, করিনি শুধু আমাদের সম্মানিত রহিম বাই-এর ঘোড়া উদ্ধারে সহায়তার খাতিরে। তাঁর সম্পত্তি রক্ষার জন্য এত সব ঝক্কি পোহানর পরও সম্মানিত রহিম বাই এরকম অকৃতজ্ঞতার দ্বারা তার প্রতিদান দিচ্ছেন।'

খাটো মোটা দুই হাত আকাশ পানে তুলে রহিম বাই জবাব দিল, 'আমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য। হায় আল্লাহ, আমি তো দেখছি আপনি এসব করেছেন একটি মাত্র উদ্দেশ্যে—ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য।'

আর কোন জবাব না দিয়ে চলে গেলেন কোতোয়াল। ঢাকঢোল কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে তাঁর রক্ষী আর অনুচররা চলল পিছু পিছু। আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে গেল জনতার ভীড়। রহিম বাইও রাগে গজ-গজ করতে করতে ফিরে চলল ঘরে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই চরেরা কোতোয়ালকে খবর দিল যে রহিম বাই নাপিত ডাকিয়ে দাড়ি-গোঁফ ছাঁটাচ্ছে। পরবর্তী ঘন্টায় তারা খবর দিল যে সে তার জরির পোশাক রোদে শুকাচ্ছে, পেতলের বোতাম বালি দিয়ে ঘষে চকচকে করছে।

কোতোয়ালের কপালে চিন্তার কুঞ্চন দেখা দিল। হোঁৎকা রহিম বাই খানের কাছে নালিশ জানাবার জন্য তৈরি হচ্ছে! ব্যাটা পাগল নাকি? কয়েকদিন আগে জিন্দানখানা থেকে দু'জন পেশোয়ারী কয়েদীর পলায়নের ঘটনা খান এখনও ভুলে যাননি। এসময় রহিমের নালিশ অবস্থাটা ঘোলাটে করে তুলতে পারে। জরুরি ভিত্তিতে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। কোতোয়াল হাততালি দিলেন। ছুটে এল তাঁর প্রধান অপরাধ তদন্তকারী সহকারী। তিনি ওকে প্রশ্ন করলেন, 'গত বছর

যার শিরচ্ছেদ হয়েছে সেই বিদ্রোহী ইয়ারমাত মোমিশ ওগলির কাগজপত্রগুলো কোথায়?'

সহকারী এক বাণ্ডিল কাগজ এনে তাঁর হাতে দিল। সেগুলো দেখতে দেখতে তিনি ভাবলেন, জ্যোতিষীটাকে কোন মারাত্মক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে এবং ইয়ারমাতের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক বের করে তাকে একজন বিপজ্জনক বিদ্রোহী বলে প্রমাণ করতে হবে। এর দ্বারা তিনি এক ঢিলে কয়েকটি পাখি মারতে পারবেন। যথা—জ্যোতিষীর নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারাই প্রমাণ করা যাবে ওকে মতলব নিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়েছে বলে রহিম বাই যে অভিযোগ করেছে সেটা মিথ্যা। আরবী ঘোড়াগুলো রেস-এর ময়দানে নামবে না এবং তার ফলে প্রথম পুরস্কার তাঁর তেকিন ঘোড়াই পাবে। হোঁৎকা রহিম বাই রেস শেষ হবার পরেও হারানো ঘোড়া ফেরত পাবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জ্যোতিষীকে (হোজা নাসিরুদ্দীন) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে হবে। বা হাঁড়িকাঠে পাঠাতে হবে। সবকিছু ঠিকমত চললে কর্মতৎপরতার জন্য আরেকটি পদকও পাওয়া যেতে পারে।

তাঁকে খুব দ্রুত ও বিবেচনার সাথে কাজ হাসিল করতে হবে, যাতে খান জ্যোতিষীকে নিজে জেরা করার সময় ও সুযোগ না পান।

কিন্তু তিনি কোন্ অভিযোগ আনবেন জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে? বিদ্রোহীর সহচরগিরি, কিংবা অপরাধে সাহায্য করার অভিযোগ? না, অভিযোগ হবে ইয়ারমাতের সাথে আত্মীয়তার। এটা এমন এক ফাঁদ যা থেকে ব্যাটা বেরুতে পারবে না। সে প্রমাণ করুক যে বিদ্রোহীর দাদু তারও দাদু ছিল না। কবর থেকে উঠে এসে তার দাদীও যদি অস্বীকার করে ওই কুৎসাপূর্ণ অভিযোগ, যদি বলে যে বিদ্রোহীর দাদুর সঙ্গে তার গোপন অবৈধ সম্পর্ক ছিল না, তাতেও কিছু হবে না। তার সাক্ষ্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাবে, কারণ স্মরণাতীত কাল থেকে সবাই জানে কোন মহিলা কারও সঙ্গে নিজের গোপন সম্পর্কের কথা স্বীকার করে না।

'জ্যোতিষীকে নিয়ে আস আমার সামনে।' হুকুম দিলেন কোতোয়াল।

হোজা নাসিরুদ্দীনকে সঙ্গে সঙ্গে জিন্দান থেকে তুলে এনে কোতোয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। তাঁর গায়ের কোর্তা খুলে নেয়া হল। তাঁর পেছনে একজন দাঁড়াল চাবুক হাতে।

কোতোয়াল বললেন, 'তোমাকে কেন ধরে কয়েদ করেছি তা তুমি নিজেই জানো। তোমার ব্যাপারে সব কিছুই আমার জানা। অনেক দিন ধরে তোমাকে আমি খুঁজছিলাম। এখন তুমি নিজেই তোমার কুকাজের কথা আমাকে বল এবং জানাও তোমার আসল নাম কি।'

হোজা নাসিরুদ্দীন নিরুত্তর। চিন্তা করার জন্য তাঁর সময়ের দরকার।

'তুমি কি বোবা হয়ে গেছ? নাকি ভুলে গেছ? মনে করিয়ে দেব?'

হোজার সামনে দাঁড়ানো প্রহরীটি মুঠি পাকাল, পেছনের লোকটি চাবুক তুলল, কিন্তু তিনি ঘাবড়ালেন না। তিনি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও ঘাবড়াবার লোক ছিলেন না। তাঁর একটি মাত্র ভয় এই যে কোতোয়াল হয়ত তাঁর আসল পরিচয় কোনক্রমে জেনে ফেলেছে। তবুও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি বললেন, 'মহামান্য প্রভু, আমার গণনায় কোন ধোঁকাবাজি ছিল না।'

'গণনা না ঘন্টা। তোমার গণনায় একটি মাত্র জিনিস প্রমাণ হয়েছে যে তুমি অন্য সব জ্যোতিষীর মতই বদমাশ ও ধূর্ত।'

কোতোয়ালের জবাব থেকে হোজা নাসিরুদ্দীন বুঝলেন যে তাঁর আসল পরিচয় প্রকাশ পায়নি। একটা পাথর যেন সরে গেল তাঁর বুকের ওপর থেকে। তরবারির পয়লা চক্করে তিনি জয়ী হয়েছেন।

'আমার মহামান্য প্রভু ঘোড়ার লাগাম তো স্বচক্ষেই দেখেছেন। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে ঘোড়াগুলো আপনাদের সওয়ারীরা যাওয়ার মিনিট কয়েক আগেও সেই গুহার মধ্যে ছিল।'

কোতোয়ালের জন্য এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ফাঁদ এবং তিনি সরাসরি সেই ফাঁদে পা দিলেন। সতর্ক না হয়েই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে ঘোড়াগুলোকে সেখানে পাওয়া গেল না কেন?'

হোজা নাসিরুদ্দীন সামনাসামনি মোকাবেলা করলেন তাঁকে, 'কারণ, গতকাল মাথাকাটা পুলের ওপর সংক্ষিপ্ত আলাপের সময় আমি এক প্রতাপশালী ব্যক্তির চোখে এরকম ইচ্ছা লক্ষ করেছি যে ওগুলো যেন খুব শিগগির ওদের মালিকের কাছে ফিরে না যায়।'

কোতোয়াল পিছু হটলেন। হতভম্ব হয়ে কাশতে লাগলেন। চকিতে তাকিয়ে দেখলেন সহকারী জবানবন্দীটা লিখে ফেলেছে কিনা। ভাবলেন, লোকটা খুবই বিপজ্জনক, একে এখনি হাঁড়িকাঠে পাঠানো দরকার। একটা কাগজ হাতে নিয়ে তিনি বিদ্রোহী ইয়ারমাতের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে হোজাকে প্রশ্ন করতে উদ্যত হলেন।

মারাত্মক বিপদ আসছে বুঝতে পেরে হোজা নাসিরুদ্দীন তার আগেই বলে উঠলেন, 'আর অন্য একজনের চোখে, যার মধ্যে কর্তৃত্বের আগুন নয়—সোনাদানার চিন্তার ছাপ ছিল—সেখানে এই অধম জ্যোতিষী লক্ষ করেছে কোন এক অনুপম সুন্দরী মহিলা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ, তাঁর সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ। এরকম সন্দেহ থেকেই জাগে ঈর্ষা, ঈর্ষা থেকে প্রতিহিংসার কামনা এবং সেটা থেকে দেখা দেয় বিপদ—যা এই মুহূর্তে প্রতাপশালী ব্যক্তিটির অজান্তে তাঁর মাথার ওপর তরবারির মত ঝুলছে।'

এটা এক প্রচণ্ড আঘাত। কোতোয়ালের দম আটকে গেল। কাগজটা পড়ে গেল কাঁপা হাত থেকে। চকিতে তিনি তাকালেন জ্যোতিষী ও তাঁর নিজের দুই

সহকারীর দিকে। এই তিন সাক্ষীকেও শেষ করে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি কাগজটি কুড়িয়ে পকেটে ভরে ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি তাঁর প্রধান সহকারীকে বললেন, 'নামাঙ্গানের সুবাদারের চিঠিটা কোথায়, দেখছি না যে।'

সহকারী সেটা খুঁজে পেল না, কারণ ওরকম কোন চিঠি ছিল না।

কোতোয়াল খেঁকিয়ে বললেন, 'তুমি সব সময় কাগজপত্র মিশিয়ে ফেলছ, হারাচ্ছ। যাও ওটা খুঁজে আন।' লোকটা চলে গেল চিঠি খুঁজতে। তারপর একটুখানি হেসে কোতোয়াল অপর সহকারীকে বললেন, 'আহা, আমি ভুলে গেছি। যাও তো, ওকে শাহী মর্দান মসজিদের মোল্লার গোপন রিপোর্টটাও খুঁজে আনতে বল।'

সে-ও চলে গেল। এবার কোতোয়াল আর হোজা নাসিরুদ্দীন পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেন। কোতোয়াল নিম্ন স্বরে বললেন, 'এসব কি আবোল-তাবোল বকছ জ্যোতিষী? গতকালের গাঁজার নেশা এখনও কাটেনি? অপূর্ব সুন্দরী মহিলা, ঈর্ষা, ক্ষমতাশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার চক্রান্ত—এসব কি?'

'আমি ব্যবসায়ী রহিম বাই, তার সুন্দরী স্ত্রী আরজু বিবি এবং এক তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলেছি যাঁর নাম আমার প্রভু ভাল করেই জানেন।'

কোতোয়াল চুপ করে রইলেন। হোজা নাসিরুদ্দীন বুঝলেন তাঁর জয় সম্পূর্ণ হয়েছে। কুঁকড়ে গেলেন কোতোয়াল। ভেঙে পড়া ভঙ্গিতে নিবানো হুঁকায় ঘনঘন টান দিতে লাগলেন। তাঁর সামনে এখন একটাই পথ—জ্যোতিষীর সঙ্গে আপোস করা। তবু সহজে তিনি হার মানলেন না। হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন ব্যাপারটা।

'কোথায় এসব গুজব শুনেছ জ্যোতিষী? তুমি দেখছি পুলের ওপর বসে বসে রাজ্যের বুড়িদের গালগল্প শুনতে ভালবাস।'

'আমার একজন বুড়ি আছে যার সঙ্গে আমি প্রায়ই আলাপ করি।'

'ওহ্ হো! কি নাম তার, পরিচয় কি, কোথায় থাকে, শিগগির বল, আমিও ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'আমার বুড়ি হচ্ছে আমার চীনা কেতাব। কেতাবেই আমি এসব খবর পেয়েছি। রহিম বাই-এর চোখেও এর সমর্থন পেয়েছি।'

'তুমি কি বলতে চাও যে ওই কেতাব দেখেই যে কোন গোপন কথা তুমি জানতে পার? এ তো বাচ্চাদের রূপকথা।'

'আমার মহান প্রভু যা মনে করেন। তিনি চাইলে আমি চুপ করে থাকব। কিন্তু আগামীকাল যদি রহিম বাই বিষয়টা খানের কানে তুলে দেয়, যদি সে তার দাম্পত্য শয্যার পবিত্রতা রক্ষার আবেদন জানায়, তাহলে?'

আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হয়ে কোতোয়াল শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলেন।

'ঠিক আছে জ্যোতিষী, এখন তোমার গণনায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হবে, বুঝলে? আমি তোমাকে জিন্দান থেকে মুক্ত করে

দেব, পুরস্কার দেব এবং সর্দার জ্যোতিষী বানিয়ে দেব।'

হোজা কোতোয়ালকে তাঁর দয়ার জন্য ধন্যবাদ এবং অনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কোতোয়াল বললেন, 'ভাল। তুমি ঠিক কথাই বলেছ—আনুগত্য। আমরা দু'জন একে অপরকে বুঝি। তুমি অবশ্য টের পেয়েছ যে তোমাকে আমি আন্দাজের ওপর ভর করে আটক করেছি। কাল তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম তুমি একজন মহাজ্যোতিষী। এরকম লোকই আমার চাই। এ জন্যই তোমাকে আজ এখানে ডেকে এনেছি। আসল কথা হচ্ছে আমার সহকারীদের আমি বিশ্বাস করি না। ওরা আমার ক্ষতি করতে পারে, ষড়যন্ত্র করতে পারে আমার বিরুদ্ধে। ওদের চোখকে ধোঁকা দেবার জন্য এবং গোপনে তোমার সঙ্গে আলাপের সুযোগের জন্যই কাল ঘটা করে পুলের ওপর থেকে তোমাকে গ্রেফতার করেছি। আমার প্রধান সহকারীকে প্রথম সুযোগেই আমি হাঁড়িকাঠে পাঠাব। তখন তুমি তার জায়গায় বসতে পারবে, তবে এই শর্তে যে তোমাকে উদ্যমী ও অনুগত হতে হবে।'

কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছে দেখে হোজা নাসিরুদ্দীন কোতোয়ালকে সময় নষ্ট হবার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ, এখন থেকে তুমিই হলে সর্দার জ্যোতিষী। অন্য জ্যোতিষীদের আয় থেকে যত অংশ ইচ্ছা হয় তুমি আদায় করতে পারবে। আর এখন তোমাকে জানতে হবে রহিম কবে খানের কাছে নালিশ জানাতে যাবে। আগামীকাল না তো?'

'না, অত শিগগির নয়। তার হাতে এখনও যথেষ্ট প্রমাণ নেই। সে এখন অপেক্ষা করছে কখন আমার মহামান্য প্রভু সতর্কতা ভুলে গিয়ে…'

'সে বৃথাই অপেক্ষা করবে। কিন্তু টের পেল কি করে সে? আমার কোন দুশমন কথাটা তার কানে লাগিয়েছে?'

'কেতাব দেখলে বলতে পারি।'

'দেখ তো?'

হোজা নাসিরুদ্দীন থলের ভেতর থেকে বের করে কেতাব খুলে তাকিয়ে রইলেন।

'কেতাব কিছু বলছে?'

গলার স্বরে একটা ভৌতিক আমেজ এনে হোজা বলে উঠলেন, 'ওই যে! আমি দেখছি, দিনের শেষে সূর্য অস্ত যাচ্ছে! আমি দেখছি একটা বাজার…একটা দোকান…হোঁৎকা রহিম বাই বসে আছে দোকানে…আমি শুনতে পাচ্ছি কাড়া-নাকাড়ার শব্দ…রক্ষীদের চিৎকার…এক মহা শক্তিমান ব্যক্তি সেখানে এলেন…তাঁর গর্বিত দৃষ্টি…তাঁর চমৎকার গোঁফ আমি চিনতে পারছি। তিনি ঘোড়া থেকে ঘৃণ্য ব্যবসায়ীটির পাশে গিয়ে বসলেন…দু'জনে চা খেতে খেতে আলাপ

করছেন···ঘোড়দৌড় আরবী ঘোড়া, তেকিন ঘোড়ার কথা বলছেন···কিন্তু এ কোন্ হুরী বা পরিজাদী হঠাৎ আবির্ভূত হলেন?···কার সাধ্য বর্ণনা করে সেই সৌন্দর্য! ধীর পায়ে ভারী নিতম্ব দুলিয়ে পাতলা বোরখাধারী এসে দাঁড়ালেন দোকানের ভেতর···দেখ, দেখ, ঘৃণ্য ব্যবসায়ীটি তার থলে থেকে নানা রকমের অলঙ্কার বের করছে···তারপর, তারপর···একি? সুন্দরী রহিম বাই-এর হাত থেকে অলঙ্কার নিচ্ছে, আর চোখের ইশারায় কথা বলছে সেই শক্তিধর কর্তাটির সঙ্গে!···এ যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা!'

কোতোয়ালের গোটা শরীর ঝুঁকে পড়েছে হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে তিনি বলে গেলেন, 'ছিঃ ছিঃ হোঁৎকা রহিম বাই! তুমি তোমার স্ত্রীকে অলঙ্কারগুলো পরে বোরখা খুলে দাঁড়াতে বলছ! আমি দেখছি, চাঁদ আর সূর্যের চোখাচোখি হল···সতর্কতা ভুলে গেল ওরা···দু'জনের চোখেই জ্বলে উঠল কামনার দৃষ্টি। আরে নীচ, বদমাশ, হিংসুক রহিম বাই, তুই বুঝি এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিলি?···হঠাৎ দৃষ্টি তুলে তুই ওদের এ অবস্থায় দেখে ফেললি?···আমি দেখছি তোর এতদিনকার সন্দেহের অবসান হয়েছে···তুই সব বুঝতে পেরেছিস···মুখের বিগলিত হাসির আড়ালে তুই প্রতিহিংসার মতলব আঁটছিস মনে মনে···।'

কোতোয়াল বলে উঠল, 'তাহলে এটাই তার মতলব! সত্যি বলতে কি, আমি ওই হোঁৎকা হুলো বেড়ালটিকে অতখানি ধড়িবাজ ভাবিনি কখনও। আল্লাহর দোহাই জ্যোতিষী, তুমি যেন সেদিন আমাদের সামনে বসেই সব কিছু দেখেছ, অথচ আমরা তিনজন ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। যাক—এখন তোমার কাজ হচ্ছে রহিম বাই-এর গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং সে কখন কি মতলব আঁটছে সেটা আমাকে জানানো।'

'আমি জিন্দান থেকে বেরুলেই তার একটি চিন্তাও আমার নজর এড়াতে পারবে না।'

'বিকেলেই তুমি মুক্তি পাবে। তার আগে খানের কাছে জানাতে হবে।'

'খান যদি অমত করেন?'

'সেটা নিয়ে ভেব না?'

'আরেকটা কথা প্রভু, কিছু খরচপত্র লাগবে।'

'আপাতত কাজ শুরু করার জন্য আমি তোমাকে দুই হাজার টাকা দেব।'

'সেক্ষেত্রে আপনার সকল হুকুমই তামিল হবে।'

কোতোয়ালের আদেশে হোজা নাসিরুদ্দীনকে দফতরের দোতলার বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। নরম তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আরামে চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন তিনি কোথায় গেল আরবী ঘোড়া, কানা চোরই বা গেল কোথায়। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন ক্লান্তিতে।

এদিকে কোতোয়াল গেলেন খানের কাছে, জ্যোতিষীর মুক্তি অনুমোদন করিয়ে নিতে। খান বললেন, 'ওর গর্দান কাটাই ভাল। বিদ্রোহীর সঙ্গে আত্মীয়তা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার।'

'হে শাহ্-ই-জমান, আমি খোঁজ-খবর নিয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে বিদ্রোহী ইয়ারমাতের সঙ্গে ওর কোন রক্ত সম্পর্ক নেই। জ্যোতিষী এক ভিন গাঁয়ের এবং সম্পূর্ণ আলাদা পরিবারের লোক।'

'তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ভিন গাঁয়ের এবং আলাদা পরিবারের লোক হলেও সে বিদ্রোহীর আত্মীয় হতে পারে। হয়ত সাক্ষাৎ আত্মীয় নয়, দূর সম্পর্কের। আর তা-ই যদি হয় তবে?'

'ইয়ারমাতকে সে কোনদিন চোখেও দেখেনি। গুপ্তচরেরা ওকে অন্য লোক বলে ভুল করেছিল এবং ভুল করেই ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'একবার যখন ওকে ধরে এনে জিন্দানে আটক করা হয়েছে তখন নিরাপত্তার খাতিরে ওর মাথা কেটে ফেললে দোষ কি? ওর গর্দান না নেওয়ার কোন হেতুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তোমার সেই পেশোয়ারী জাদু-টোনার চাইতে বিদ্রোহ অনেক বেশি গুরুতর ব্যাপার। আমাদের জন্য এক ইয়ারমাতই যথেষ্ট। তার কার্যকলাপ আমাদের মুখে অনেকগুলো কুঞ্চন-রেখা এঁকে দিয়েছে।'

'হে শাহ্-ই-জমান, এক ঘৃণ্য জ্যোতিষীর নোংরা মাথাটা রক্ষার জন্যই আমি এই কাকুতি-মিনতি করছি না। আমার মনে রয়েছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা— সিংহাসনের শক্তিবৃদ্ধির চিন্তা।'

'তাহলে বলে যাও।'

'এইসব উচ্চতর বিবেচনার দ্বারা চালিত হয়েই আমি আজ আমার চিন্তার দুর্বল উটগুলোকে শাহী মহলে নিয়ে এসেছি। আমি তাদেরকে আপনার রাজকীয় প্রতাপের সরাইখানার সামনে নতজানু করে বসিয়ে দিয়ে আপনার শাহী প্রজ্ঞার নির্ঝর থেকে আকণ্ঠ পান করার সুযোগ দিতে চাই…'

'থাম, উজীর, থাম। ভবিষ্যতে এসব কথা তুমি দয়া করে আগে থেকে কাগজে লিখে আমাদের দরবারের অনুষ্ঠান পরিচালককে শুনিয়ে দিয়ো। সে ব্যাটা শুনুক মনোযোগ দিয়ে, কারণ ওই কাজের জন্যই আমরা তার বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি।'

'রাজকীয় কর্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কথার মালা অনুষ্ঠান পরিচালককে উপহার দেব জাঁহাপনা।'

'তোমরা বিশ জন উজীর রয়েছ আমাদের এবং প্রত্যেকেই অন্তত ঘন্টা দুই একটানা কথা বল। এ অবস্থায় আমরা ঘুমাই কখন বল তো?'

'যো হুকুম, জাঁহাপনা। আপনার আদেশ পালিত হবে। সংক্ষেপে নিবেদন করছি, গত বছর আমরা অনেকের গর্দান নিয়েছি যার ফলে রাজকীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়েছে।'

'ঠিক তাই। দেখলে তো, গর্দান নেয়া সব সময় উপকারী।'

'এবার রাজকীয় অনুকম্পার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন কি আরও উপকারী হতে পারে না? আমরা যদি জ্যোতিষীটাকে ছেড়ে দিয়ে, ঢোল-সহরত ও নকীবদের দ্বারা কথাটা প্রচার করে দি জনগণের মধ্যে, তাহলে কি এটা যুক্তিসঙ্গত ভাবে ধরে নিতে পারি না যে তাদের হৃদয় এতে আনন্দে ভরে উঠবে এবং তারা আবেগে ফেটে পড়ে চেঁচিয়ে উঠবে··"আহা, কি সুখী আমরা, কি ভাগ্য আমাদের! এমন এক বাদশাহর পরাক্রান্ত বাহুর ছায়ায় বাস করছি যিনি বসন্তের সূর্যের মত আমাদেরকে উত্তাপ বিতরণ করেন···'

'উজীর, কথাগুলো কাগজে লিখে নিচে গিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালককে পড়ে শুনিয়ো। এখন তোমার আসল বক্তব্য শেষ কর।'

'এতে জনগণের মধ্যে মসনদের প্রতি সমর্থন আরও বৃদ্ধি পাবে।'

'তোমার যুক্তি ঠিকই মনে হচ্ছে। তবে ওই লোকটা, মানে জ্যোতিষীটা বিপজ্জনক—যদি সে বিদ্রোহীর আত্মীয়···" '

'হে খান-ই-আযম। সেই বিপদ সহজেই মোকাবিলা করা সম্ভব। প্রথমে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং নগর নকীবদের দ্বারা ঘটনাটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। এটা হবে রাজকীয় অনুকম্পার কাজ। তারপর, দুই কি তিন সপ্তাহের মধ্যে একদিন গভীর রাতে তাকে আবার ধরে আমার মাটির নিচের কারাকক্ষে এনে এক কোপে গর্দানটা কেটে ফেলা হবে। এটা হবে রাজকীয় সতর্কতামূলক কাজ। প্রথমটা হবে প্রকাশ্যে, দ্বিতীয়টা হবে গোপনে। অনুকম্পা আর সতর্কতা পরস্পরের পরিপূরক। এই দুইটি কাজ দুইটি অতুলনীয় রত্নের মত আমাদের সূর্যপ্রতিম শাহানশার মুকুটে ঝিক-ঝিক করবে···'

'ওসব নিচের তলায় অনুষ্ঠান পরিচালকের জন্য রেখে দাও। তোমার বক্তব্য কি শেষ হয়েছে উজীর?'

'আমার তুচ্ছ চিন্তার পাত্র খালি হয়ে গেছে জাঁহাপনা।'

'ভালই হয়েছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ইতোমধ্যেই। তোমার যুক্তি আমাদের পছন্দ হয়েছে উজীর। আমরা তোমার পরিকল্পনা অনুমোদন করলাম।'

'আমার রাজকীয় প্রভুর দয়ালু দৃষ্টি আমার হৃদয়ে আনন্দের প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে। আমি এই মুহূর্তে জ্যোতিষীর মুক্তির ব্যাপারে একটি ফরমান তৈরি করে ফেলব। কাল সকালেই নগরের নকীবরা মহামান্য খানের আদেশ জনগণের সামনে ঘোষণা করবে।'

'তাই হোক।'

সেদিনই বিকেলের দিকে কোতোয়ালের দেয়া নতুন পিরান, নতুন জুতা পরে দুই হাজার টাকা পকেটে পুরে হোজা নাসিরুদ্দীন মুক্ত হলেন কয়েদখানা থেকে।

রাস্তায় বেরুতেই দেখা হল হোঁৎকা রহিম বাই-এর সঙ্গে। তার গায়ে দামী

পোশাক, বুকে পেতলের চকচকে বোতাম, হাতে একটা ঘোড়ার লাগাম। খানের মহলে ঢোকার অনুমতির অপেক্ষায় সে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিল। হোজাকে দেখে খুশি হল সে।

'তোমাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে, জ্যোতিষী? আহা কি আনন্দের কথা? আমার ঘোড়া উদ্ধার হবে তাহলে। আমি আঠারো টাকা খরচ করে একটা আর্জি লিখিয়েছি। পড়ে দেখবে নাকি একটু?'

'আমি তো চীনা ভাষা ছাড়া আর কিছু পড়ি না।'

'আমার আর্জিতে ঘোড়া খুঁজে বের করা পর্যন্ত তোমার গর্দানটা না কাটার আবেদন রয়েছে। দেখছ, তোমার উপকারের জন্য আমার কত আগ্রহ!'

'বেশ দেখলাম এবং ঘোড়া উদ্ধার পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখার আর্জি লেখানর জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

'তাহলে দেরি না করে গণনায় লেগে যাও না। হয়ত রাত হবার আগেই ঘোড়ার হদিস পেয়ে যাবে।'

'অত তাড়া কিসের? আপনার চেষ্টায় আমার গর্দানটা যখন রক্ষা পেয়েছে তখন ঘোড়ার সন্ধান একটু ধীরে সুস্থে করলেই হবে।'

'কি বলছ তুমি, ঘোড়ার সন্ধান ধীরে সুস্থে করবে? তুমি কি ভুলে গেছ যে রেস-এর আর মাত্র তিন দিন বাকি?'

'খানের কাছে যান, তিনি হয়ত রেস দু'এক হপ্তার জন্য স্থগিত রাখতে রাজি হবেন।'

এই বলে হোজা পা বাড়ালেন সামনের দিকে।

'তাহলে জ্যোতিষী, সাবধান থেক! আমি জানি তোমাকে ঘুষ দেয়া হয়েছে এবং কে দিয়েছে তা-ও আমার জানা। দরবারে আমারও লোক আছে…'

রাগে হিসহিস করে বলল রহিম বাই। কিন্তু হোজা নাসিরুদ্দীন তখন চলে গেছেন অনেক দূরে।

রাতে চা-খানায় শুয়ে শুয়ে চৌকির তলায় বসা কানা চোরের সঙ্গে চুপে চুপে আলাপ করলেন তিনি।

'গুহার মধ্যে ঘোড়া পাওয়া গেল না কেন বল তো, কি হয়েছে ঘোড়াগুলোর?'

'আমি ওগুলোকে গুহায় ছেড়ে যেতে পারিনি। গুপ্তচরেরা সর্বত্র চষে বেড়াচ্ছিল, এমনকি খনির ভেতরেও ওরা উঁকিঝুঁকি মারছিল। কাজেই ভোর হবার আগে ঘন কুয়াশার আড়ালে আমি ঘোড়াগুলোকে আরেক জায়গায় সরিয়ে একটা খালি বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছি। বাড়িটা…মহল্লার…'

পরবর্তী কাজের নির্দেশ নিয়ে কানা সরে গেল। নিশ্চিন্ত মনে হোজা চোখ বুজলেন।

পরদিন সকালে মাথা কাটা পুলে যেতেই সব জ্যোতিষী নত হয়ে হোজা

নাসিরুদ্দীনকে সালাম করল। ওরা জেনে গেছে তাঁর নতুন মর্যাদার কথা।

স্বয়ং কোতোয়াল এসে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সঙ্গে গোপন আলাপ শুরু করলেন।

'তুমি কি রহিম বাই-এর মনের গোপন অলিগলি হাতড়ে দেখেছ জ্যোতিষী?'

'দেখেছি, এখন পর্যন্ত সেখানে বিপজ্জনক কিছু পাইনি।'

'খুব কড়া নজর রেখ জ্যোতিষী, সতর্ক থেক।' হাত বাড়ালেন তিনি হোজার দিকে। হোজা নত হয়ে তাতে চুম্বন দিলেন। হোজার প্রতি কোতোয়ালের এই গভীর প্রীতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল অন্য জ্যোতিষীরা।

কোতোয়াল বললেন, 'আচ্ছা জ্যোতিষী, ঘোড়াগুলোর কি হল বল দেখি? গুহার মধ্যে পাওয়া গেল না কেন?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'ঘোড়া? খুব সোজা ব্যাপার—আমি ওগুলোকে সরিয়ে ফেলেছি।'

'সরিয়ে ফেলেছ? কি বলতে চাও তুমি? তুমি ছিলে এখানে, পুলের ওপর, ঘোড়া ছিল খনির ভেতর।'

'খুব সোজা—আমি ওগুলোকে হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়েছিলাম।'

'হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়েছিলে? তাহলে তুমি তা-ও পার?'

'এটা তুচ্ছ ব্যাপার। শেষ মুহূর্তে আপনাদের ঘোড়-সওয়ারেরা খনিতে পৌঁছে গেলে আমি আমার কেতাবের সাহায্যে দেখলাম যে চোরেরা কোন সময় এসে ঘোড়ার নাল থেকে সোনার পেরেক আর লেজে বাঁধা জাদুর সুতা খুলে নিয়ে গেছে। কাজেই আমি ঠিক করলাম ঘোড়া আপাতত ফেরত দেব না। আমার মহামান্য প্রভুকে জানিয়ে তাঁর নির্দেশ মত কাজ করব।'

'বাহ্, সাবাস।'

'এ অবস্থায় ওদেরকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।'

'তা—আমাকে বললে না কেন? তাহলে তুমি আটক হতে না।'

'সময় পাইনি হুজুর। হঠাৎ আপনার লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাছাড়া, তখন বললেও আপনি বিশ্বাস করতেন না।'

'হুম! তাজ্জব কারবার! আচ্ছা বল তো, রহিম বাইকে ওরকম হওয়ায় মিলিয়ে দিতে পার না? ধর, বোগদাদ কিংবা তেহরানে পাঠিয়ে দিলে। আরও ভাল হয় সাদা কাফেরদের দেশে পাঠিয়ে দিলে।'

'তেমন ক্ষমতা আমার নেই। এখন পর্যন্ত কেবল পশুদের ওপর এটা খাটাতে পারি। তবে হ্যাঁ, যখন আমি আমার কেতাবের গভীর রহস্য আরও আয়ত্ত…'

'কি আফসোস! জানো, দরবারে এমন আরও অনেক লোক আছে যাদেরকে…!'

কল্পনার দৃষ্টিতে তিনি দেখলেন জ্যোতিষীর সাহায্যে তিনি প্রধান সেনাপতি,

উজীরে আযম, বাণিজ্য উজীর, কাজীউল-কোজ্জাৎ, খাজাঞ্চী সবাইকে একের পর এক হাওয়ায় মিলিয়ে দিলেন। বাকি থাকল কেবল স্বয়ং খান। অবশেষে একদিন খানকেও হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে নিজেই বসলেন সিংহাসনে। এ পর্যন্ত এসেই হঠাৎ তাঁর চেতনা ফিরল। কি সর্বনাশ! কার সামনে বসে তিনি এসব মারাত্মক স্বপ্ন দেখছেন! এ যে সাংঘাতিক লোক! হয়ত তাঁর এই কল্পনাটাও এর কাছে ধরা পড়ে গেছে। নাহ্, কাজ উদ্ধার হয়ে গেলেই এর সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কোতোয়াল বিদায় নিলেন।

নয়

মাকড়সার জালে বোলতা

হোজা নাসিরুদ্দীন আশা করেছিলেন রেস-এর আগে শেষ ক'টা দিন রহিম বাই তাঁর কাছে ঘোরাঘুরি করবে তার ঘোড়া উদ্ধারের আশায়। কিন্তু সে আসেনি। ক্রোধে সে এখন অন্ধ। প্রথম পুরস্কার আর চায় না সে—চায় না খানের রাজকীয় প্রশংসা। সে চায় প্রতিশোধ নিতে, কোতোয়ালের শয়তানি ফাঁস করতে এবং বদমাশ জ্যোতিষীটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে রেস-এ কোতোয়ালের তেকিন ঘোড়া দুটোই জয়ী হল। ঢাক-ঢোল-শিঙ্গা-দামামার কানফাটা বাজনার মধ্যে বিজয়ী ঘোড়া দুটোকে খানের সুসজ্জিত উঁচু মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। খানের সামনে দাঁড়িয়ে তেকিন দুটো পিঠ বাঁকিয়ে লাগাম কামড়ে পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করতে লাগল। গোটা ঘোড়দৌড়ের মাঠটা তারা বারো বার চক্কর দিয়েছে কিন্তু ওতে বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হয়নি, দম হারায়নি মোটেও। একটুও ঘামেনি ওদের দেহ। আবার ছোটার জন্য লম্বা সরু পাগুলো অস্থির চঞ্চলভাবে ঠুকছে মাটিতে।

হাসিতে উদ্ভাসিত হল খানের মুখ। প্রশংসা করলেন তিনি ঘোড়াগুলোর। সিংহাসনের পেছনে দাঁড়ানো সভাসদদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠল প্রশংসার।

বিজয়ের আনন্দে উজ্জ্বল কোতোয়ালের চোখমুখ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বুক চিতিয়ে গোঁফে তাও দিয়ে শরীরটাকে ডাইনে বাঁয়ে বাঁকিয়ে জুতোর গোড়ালিতে ঠুকে টান-টান হয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

খানের প্রধান নকীব মঞ্চের কিনারা বরাবর এগিয়ে হাত উঠিয়ে গোলমাল বন্ধ করার জন্য ইঙ্গিত দিলেন।

বাদ্য-বাজনা স্তব্ধ হল। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে জনতা মঞ্চের কাছে এগিয়ে গেল।

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে নকীব আরম্ভ করলেন, 'কোকন্দের পরম দয়ালু ও সূর্যপ্রতীম মালিক, অনন্য খ্যাতির অধিকারী, আল্লাহর প্রিয়পাত্র মহামান্য খান মহানুভবতা-বশত চল্লিশ হাজার টাকার প্রথম পুরস্কারটি কামিল বেকের তেকিন···'

'বিচার চাই! প্রতিকার চাই!' তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার উঠল জনতার মধ্য থেকে। 'আমি মহামান্য খানের কাছে অন্যায়ের প্রতিকার চাই!'

খানের ভ্রূ কুঁচকে গেল। বিরক্তির গুঞ্জন উঠল সভাসদদের মধ্য থেকে। উৎসবের মুহূর্তে এমন বে-আদবী।

সরে গিয়ে জনতা রহিম বাইকে পথ করে দিল। নগ্ন মাথা নগ্ন পায়ে দামী পোশাক পরা রহিম বাই দু'হাতে নিজের চুল-দাড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে এগিয়ে গেল মঞ্চের দিকে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মাটিতে, মুঠো মুঠো ধুলো নিয়ে ছড়িয়ে দিল নিজের মাথায়, আর একটানা চেঁচাতে লাগল, 'আশ্রয় চাই, ন্যায়বিচার চাই।'

কোতোয়ালের সৌখিন গোঁফ ঝুলে পড়ল নিচের দিকে, মুখটা হয়ে গেল মড়ার মত সাদা।

গর্জন করে উঠলেন খান, 'তোল ওকে! ওই বদমাশটাকে তোল! নিয়ে আস আমার সামনে!'

রক্ষীরা বগলে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে গেল রহিম বাইকে মঞ্চের দিকে। তারপর শূন্যে ঝুলিয়ে মঞ্চে তুলল। রহিম বাইকে চিনতে পেরে দরবারের লোকদের অস্বস্তি বেড়ে গেল। বাণিজ্য উজীর খানের কানের কাছে ঝুঁকে কি যেন বললেন।

বিস্মিত কণ্ঠে খান প্রশ্ন করলেন, 'ধনী ব্যবসায়ী? মান্যগণ্য? তাহলে ওর এই দুর্দশা কেন? তাকে আমার আরও কাছে আন, কথা বলতে বল।'

ময়দার বস্তার মত টেনে তাকে নিয়ে যাওয়া হল খানের কাছে। তার ঠোঁট নড়তে লাগল কিন্তু কোন কথা ফুটল না মুখে। খান, দরবারের সকল সভাসদ তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। কোতোয়াল আগুন ঝরা দৃষ্টিতে দগ্ধ করতে লাগলেন তাকে।

এদিকে রেস-এর ফলাফলের খবর ছড়িয়ে পড়েছে গোটা শহরে, বাজারের, সকল চা-খানায় এবং মাথাকাটা পুলের ওপরও।

হোজা নাসিরুদ্দীন ভাবলেন, 'এবার রহিম বাই নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে। প্রথম পুরস্কারটা তো ছিনিয়ে নেয়া হল তার কাছ থেকে তারপরে বহুমূল্য ঘোড়াগুলোকে ত্যাগ করে লোকসানের মাত্রা আরও বাড়াতে অবশ্যই সে চাইবে না।'

আবারও ভুল হল তার ধারণা। রহিম বাই এল না। তার বদলে এল একদল রক্ষী, টগবগিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে। ছোঁ মেরে হোজা নাসিরুদ্দীনকে একটা খালি ঘোড়ায় তুলে নিয়ে একটি কথাও না বলে চলে গেল ঝড়ের বেগে। ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে তিনি তাঁর চীনা কেতাব, লাউয়ের খোল ইত্যাদি ঠিকমত গুছিয়ে নেয়ার সময় পেলেন না, কোনরকমে শুধু বগলদাবা করে নিলেন

মাথাকাটা পুলের ওপর অনেকক্ষণ ধরে সবাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল। তারপর জ্যোতিষীরা জল্পনা-কল্পনা শুরু করল নিজেদের মধ্যে। কোথায় নিয়ে গেল ওকে? জিন্দান খানায়? জল্লাদ খানায়? নাকি আবারও কোন নতুন রূপ নিয়ে ফিরে আসবে লোকটা? তবে দেখা গেল বেশিরভাগ জ্যোতিষীর ধারণা এবার আর লোকটার নিস্তার নেই।

ওদিকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ষীরা হোজা নাসিরুদ্দীনকে একটা বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলল খানের সামনে কার্পেটের ওপর। জনতা তখন একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছে রক্ষীদের লাঠি-ডাণ্ডার ভয়ে। হোজা এক পলক তাকিয়েই বুঝলেন যে এরইমধ্যে রহিম বাই আর কোতোয়ালের মধ্যে একদফা তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়ে গেছে। দু'জনেরই মুখ-চোখ লাল, দু'জনেই হাঁফাচ্ছে জোরে জোরে, হাত ছুঁড়ছে।

খানও রেগে আগুন। তিনি বলে উঠলেন, 'আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের সামনে এমন অশালীন ঝগড়া করার সাহস দেখায়নি। প্রকাশ্যে হাজার হাজার লোকের সামনে এমন বেআদবী! তোমরা তোমাদের নোংরা হিসাব-নিকাশের জন্য আর কোন জায়গা বা সময় পেলে না?' তারপর হোজা নাসিরুদ্দীনের ওপর চোখ পড়তে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা আবার কে?'

'একজন জ্যোতিষী, জাঁহাপনা,' মিন মিন করে বলল বাণিজ্য উজীর।

'কোত্থেকে এসেছে ও? এখানে কি করছে?'

শুকনো মুখে উজীর বললেন, 'জাঁহাপনা ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন ভেবে আমি···আমি মনে করেছিলাম···'

'তুমি মনে করেছিলে!' গর্জে উঠলেন খান। 'এরপর আরও হাস্যকর কিছু তুমি মনে করবে, আর রাজ্যের সব ঝাড়ুদার, মেথর, মাতাল ধরে আনবে আমাদের সঙ্গে খোসগল্প করার জন্য। এখন, এনেছ যখন, তুমিই ওর সঙ্গে আলাপ কর, আমাদেরকে ওই সম্মান থেকে রেহাই দাও। ওকে বল, হয় আমাদের সামনে, এখনি, এই মুহূর্তে সে অভিশপ্ত ঘোড়াগুলোকে হাজির করুক, নতুবা প্রতারণার কথা স্বীকার করে উপযুক্ত শাস্তি মেনে নিক।'

ইতোমধ্যে রহিম বাই-এর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে হোজা তাকে ইশারা করলেন। কিন্তু রহিম বাই রাগে ফোঁস করে উঠল।

বাণিজ্য উজীর বললেন, 'জ্যোতিষী' তুমি আমাদের জাঁহাপনার হুকুম শুনেছ, কাজেই আমার প্রশ্নের খোলাখুলি, স্পষ্ট জবাব দাও।'

খোলাখুলি, স্পষ্ট উত্তরই দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। হ্যাঁ, সত্যি তিনি ঘোড়ার সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এখনি, এই মুহূর্তে, খানের সামনে তিনি ঘোড়াগুলোকে হাজির করবেন। তিনি রহিম বাইকে তার দশ হাজার টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

উজীর রহিম বাইকে জিজ্ঞেস করলেন ওরকম কথা দেওয়া হয়েছিল কিনা।

রহিম বাই জবাব না দিয়ে একটা থলে উজীরের হাতে তুলে দিল।

থলেটা ঝাঁকি দিয়ে উজির বললেন, 'দেখেছ জ্যোতিষী! এতেই রয়েছে প্রতিশ্রুত টাকা। কিন্তু এটা হাতে পাওয়ার আগে তোমাকে প্রথমে ঘোড়া হাজির করতে হবে, তারপরে প্রমাণ করতে হবে যে তুমি ঘুষ খেয়ে ঘোড়ার সন্ধান দিতে দেরি করনি। আজ যদি তুমি ঘোড়া খুঁজে বের করতে পার তাহলে কাল কেন পারনি সেটাও ব্যাখ্যা করতে হবে তোমাকে। কেন তুমি রেস-এর আগে তাদের সন্ধান পাওনি এবং এখন রেস শেষ হবার পরে কেন পারছ বল। এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র থাকলে বল, কে সেই ষড়যন্ত্রের প্রেরণাদাতা?'

ইঙ্গিতটার লক্ষ্য যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কোতোয়াল, এটা স্পষ্ট বোঝা গেল। তিনি আবার বললেন, 'স্বীকার কর জ্যোতিষী, খোলাখুলি বল, কার প্রেরণায় তুমি আমাদের দীপ্তিমান সূর্য মহান খানকে ওই সুন্দর আরবী ঘোড়া দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছ! বল, কে সেই সাপ যে তার ভক্তির মুখোশের আড়ালে হিংস্র বিষ দাঁত লুকিয়ে রেখেছে? কথা বল, স্বীকার কর, তোমাকে মাফ করা হবে। তোমার পুরস্কার বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি নিজেই দু'হাজার, না, তিন হাজার টাকা দেব।'

শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য তিনি দশ হাজার টাকাও দিতেন, কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীও নেহায়েত বুদ্ধু নন। সিংহাসনের কাছে গিয়ে কোতোয়াল বললেন, 'দুনিয়ার মালিক, মহামান্য খান, এখানে যা ঘটছে সেটা লক্ষ করছেন কি? এখানে অর্থ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা হচ্ছে। এটা ঘুষ দেয়ার চাইতেও বড় অপরাধ।'

'আমি মহান খানের হুকুম পালন করছি,' খেঁকিয়ে উঠলেন বাণিজ্য উজীর। 'আমার বিরুদ্ধে ঘুষ দেয়ার বা ঘোড়া-চুরির কোন নালিশ নেই।'

'হায় আল্লাহ, কেন আমাকে এসব অপমানজনক কথা শুনতে হচ্ছে? এবং শুনতে হচ্ছে এমন সব লোকের কাছ থেকে যারা ওপরওয়ালাদের অতি বিশ্বস্ত হয়েও সেই আস্থাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগায় যেমন দেখা গেছে গত

বছরের বাণিজ্য-কেলেঙ্কারির সময় মোটা অঙ্কের অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে?'

'কোন্ আদায়ের কথা বলা হচ্ছে?' চেঁচিয়ে উঠলেন বাণিজ্য উজীর খ্যানখ্যানে গলায়। 'কোতোয়াল সাহেব কি পাহারা-চৌকি বানাবার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং একটা ইঁটও না বসিয়ে যা পুরোপুরি খরচ হয়ে গেছে বলে জানানো হয়েছিল তার কথা বলছেন?'

এবার গর্জে উঠলেন পূর্ত উজীর, কোতোয়ালের বন্ধু, 'পাহারা-চৌকির প্রসঙ্গ যখন তোলা হল তখন আমি বড় দরগাশরীফ মেরামতের জন্য চার বছর ধরে রাজকোষ থেকে যে অর্থ তোলা হচ্ছে তার কথা উল্লেখ করতে চাই। দরগা মেরামত হয়েছে কি?'

এমনি করে উজীর আর ওমরাহরা একে অপরের ওপর দোষারোপ করতে শুরু করলেন। সারা মঞ্চ জুড়ে চলল তুমুল তর্ক-বিতর্ক। মুখ-চোখ লাল করে, মুঠি বাগিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে তাঁরা ঝগড়া করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে স্বয়ং খানও জড়িয়ে পড়লেন সেই ঝগড়ায়ঃ

'পুলের কথা বলছ? ন্যাকা আর চোরের দল! পুলের জন্য কাটা পাথর যোগানর নামে যে অর্থ নেওয়া হল, কোথায় গেল সেটা? চুপ করে আছ কেন কাদির! আর দু'শ আশিটা সেগুনের খুঁটির কি হল ইউনুস? কথা বলছ না কেন?'

এই ঝগড়া বন্ধ করার জন্য হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর চীনা কেতাব দুলিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'চোরাই ঘোড়া সম্পর্কে আমার কেতাব বলছে···'

তাঁর কথাগুলো যেন আগুনের শিখার ওপর পানি ঢেলে দিল। প্রথমে নিজেকে সামলালেন খান, তারপর অন্যরা। সবাই চুপ করে গেলেন।

ভারি গলায় খান বললেন, 'আদব কায়দার চরম বরখেলাপ করেছ তোমরা। এরকম আচরণ আমি কতদিন সহ্য করব? ভেব না আজকের কেলেঙ্কারি আমি মাফ করে দেব। আগে মহলে ফিরে যাই, তারপর দেখাব। তোমাদের বোকামি ঔদ্ধত্য ঝগড়াবিবাদ চুরি জোচ্চুরির দরুন আমার সব সৎ উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সবগুলোকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদায় করব।'

এরপর বাণিজ্য উজীরকে ক্রুদ্ধ স্বরে আদেশ দিলেন, 'জ্যোতিষীকে বল তার কথা শেষ করতে। স্বীকার করুক সে তার জারিজুরির কথা, গ্রহণ করুক তার প্রাপ্য শাস্তি। বলুক, ঘোড়াগুলো কোথায়?'

বাণিজ্য উজীর প্রশ্ন করতেই হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'শহরতলীর নইমউদ্দীন মহল্লার এক বাড়িতে। বাড়িটা সহজে চেনা যায়। সামনে একটা বড় বাগান এবং খুব সুন্দর কারুকাজ করা একটা সদর দরজা আছে।'

'সুন্দর কারুকাজ করা সদর দরজা?' চেঁচিয়ে উঠল রহিম বাই। 'ওটা তো আমার বাড়ি, গরমের মরসুমে আমি ওখানে থাকি! কিন্তু এখন তো ওটা বন্ধ, খালি। ঘোড়া কেমন করে ওখানে ঢুকল?'

খান বললেন, 'ওখানে কোন ঘোড়াই নাই এবং ছিল না। এই ব্যাটা মিথ্যে বলছে। চাবুক আনাও ওকে শাস্তি দেবার জন্য, আর ও যে মিথ্যে বলছে তা প্রমাণের জন্য ওই বাড়িতে লোক পাঠাও।'

সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটল খানের হুকুম তামিল করার জন্য।

নইমউদ্দীন মহল্লা শহরের খুব কাছেই। অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এল ঘোড়সওয়ারেরা।

'ওই যে আমার ঘোড়া, ওই যে,' বলে চিৎকার করে রহিম বাই ছুটল সেদিকে সব কিছু ভুলে।

কিন্তু কোতোয়ালের ইশারায় রক্ষীরা তাকে ধরে ফেলল, কোতোয়াল কুটিল হাসি হেসে বললেন, 'আমাদের আলাপ এখনও শেষ হয়নি রহিম বাই সাহেব।'

এদিকে ঘোড়সওয়ারেরা সাদা ও কালো রঙের দুটো ঘোড়া সেখানে হাজির করল। ওই রকমের সুন্দর তেজী ঘোড়া কোকন্দের ময়দানে আগে কখনও দেখা যায়নি।

খান বললেন, 'সত্যি এগুলো দুনিয়ার অলঙ্কার।'

সভাসদরা একবাক্যে প্রতিধ্বনি করলেন, 'দুনিয়ার অলঙ্কার।'

এমন সময় হঠাৎ আবার শোনা গেল রহিম বাই-এর চিৎকার, 'ন্যায় বিচার চাই! আশ্রয় চাই! প্রতিকার চাই!'

খান বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ও ব্যাটা আর কি চায়? সে তার ঘোড়া পেয়েছে, চলে যাক ওগুলো নিয়ে।'

'আমার পুরস্কারের কি হবে জাঁহাপনা?' স্মরণ করিয়ে দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

তাঁর দিকে না তাকিয়েই খান বললেন, 'জ্যোতিষীকে তার প্রতিশ্রুত পাওনা দেওয়া হোক।'

বাণিজ্য উজীর দশ হাজার টাকার সোনার মোহর ভর্তি থলেটা ঝাঁকিয়ে সবাইকে দেখিয়ে ও শুনিয়ে ছুঁড়ে দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে বাজপাখির মত রহিম বাই দুই হাতে আঁকড়ে ধরল থলেটা। 'ঘুষ খাওয়ার ব্যাপারটা কি হবে দুনিয়ার মালিক!' বলতে বলতে প্রাণপণে চেষ্টা করল থলেটি হোজা নাসিরুদ্দীনের হাত থেকে টেনে ছিনিয়ে নিতে। 'আমি বিচার চাই! ছায়া চাই। জ্যোতিষী বলুক, কেন সে আমার ঘোড়া গতকাল খুঁজে দিল না। একদিন দেরি করার জন্য সে কত ঘুষ নিয়েছে এবং কে তাকে ঘুষ দিয়েছে!'

বলতে বলতে হঠাৎ সে দিল এক হেঁচকা টান, যার ফলে টাল সামলাতে না পেরে নিজেই পড়ে গেল চিৎ হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হোজা নাসিরুদ্দীনও পড়ে গেলেন তার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে!

কাণ্ড দেখে শিউরে উঠলেন খানের সভাসদরা। খানের সামনে এ যে অভূতপূর্ব

বে-আদবী!

রক্ষীরা টেনে দু'জনকে ছাড়িয়ে দিল। থলেটা রয়ে গেল হোজা নাসিরুদ্দীনের হাতে।

এবার এল কোতোয়ালের প্রতিহিংসা গ্রহণের পালা, তার বিজয়ের মুহূর্ত। গলা কাঁপিয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। এই ব্যবসায়ীটি আমার বিরুদ্ধে ঘুষ দেয়ার অভিযোগ এনেছে। কিন্তু প্রথমে সে ব্যাখ্যা করুক চোরাই ঘোড়া তার নিজের গ্রীষ্মাবাসের আস্তাবলে কি করে গেল?'

রহিম বাই হতবাক, কোন জবাব তার মুখে এল না।

'কোন জবাব নেই।' গর্জে উঠলেন কোতোয়াল 'আসল চক্রান্ত এখানেই। তাঁর আরবী ঘোড়া দেখতে সুন্দর, কিন্তু ওদের গতি কম। ওরা রেস-এ জিতবে না সন্দেহ করে লজ্জা এড়াবার জন্য ওদেরকে তিনি লুকিয়ে রাখলেন। শহরময় প্রচার করলেন যে তাঁর ঘোড়া চুরি হয়েছে। আমরা পাগলের মত হারানো ঘোড়া খুঁজে বেড়ালাম। রেস-এর পর মহামান্য খানের আনন্দটাকে মাটি করে দেবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত খাদেমের সুনাম নষ্ট করার জন্যে খালি পায়ে খালি মাথায় হাজির হয়ে তিনি কান্নাকাটি চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। এটা কি একটা জঘন্য কাজ নয়? খানের কাছে আশ্রয় ও বিচার চাইতে পারে কে? আমি, না ওই ফন্দীবাজ লোকটি। কে বলতে পারে, আগামীকাল আমার বিরুদ্ধে তার দোকান লুটের কিংবা তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারের নালিশ নিয়ে আসবে না? এখন কি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না ঘোড়া চোর কে? চোর এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওই সে!'

'আ···আমি চোর? আ-আমি নিজের ঘ-ঘোড়া চুরি করেছি?' তোতলাতে লাগল রহিম বাই।

'সে-ই চোর! আমার যুক্তি সে কাটাক দেখি?'

রহিম বাই-এর লাজওয়াব অবস্থা দেখে উপস্থিত অনেকেই ভাবল সত্যি সে দোষী। কিন্তু কোতোয়ালের দুশমনরা—বাণিজ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলবল রহিম বাই-এর পক্ষ নিলেন।

তাঁরা কেউ বললেন, 'নিজের জিনিস কে চুরি করবে?'

অন্যরা বললেন, 'এরকম কথা কেউ কখনও শোনেনি। এটা কল্পনাও করা যায় না। রহিম বাই একজন মান্যগণ্য লোক। কোকন্দবাসী সবাই তাঁকে চেনে, ইত্যাদি।'

কোতোয়ালের পক্ষের লোকেরা পাল্টা জবাব দিল। আবার বেধে গেল দুই দলে তুমুল ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক, চিৎকার, পাল্টা চিৎকার। খান অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নীরবে বসে রইলেন। সবাই ঘোড়া দুটো, আর জ্যোতিষীর কথা ভুলে গেলেন।

এমন সময় বুড়োমত একজন রক্ষী মঞ্চে উঠে রহিম বাই-এর কাঁধে হাত দিয়ে

তাকে নামিয়ে দিল মঞ্চ থেকে এবং 'আপনার ঘোড়া নিয়ে শান্তিতে ঘরে ফিরে যান। এখানে আপনার আর কিছুই করার নেই' বলে দু'জন জোয়ান রক্ষীর সঙ্গে তাকে বিদায় করল। এবার সে চলল একইভাবে জ্যোতিষীকে বিদায় করতে।

কিন্তু হোজা নাসিরুউদ্দীন তখন সেখানে নেই। সবার নজর এড়িয়ে কেটে পড়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি ঘোড়দৌড়ের মাঠ পেরিয়ে পৌঁছে গেছেন খালের ধারে গাছপালার আড়ালে। পেছন ফিরে দেখলেন মঞ্চের ওপর ঘুসোঘুসি, জড়াজড়ি, তরবারির ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে। মুচকি হেসে তিনি চলে গেলেন আরও দূরে। খালের পরিষ্কার পানিতে নেমে হাত-মুখ ধুলেন। তারপর একটা প্রাচীন গাছের ফোকরে তাঁর জ্যোতিষ-বিদ্যার সাজসরঞ্জাম সব লুকিয়ে রেখে তিনি গাছটাকে বললেন, 'মুরুব্বী, কাউকে যেন বলে দিয়ো না। এই শহরে একমাত্র তুমিই জানলে মাথা-কাটা পুলের মহা জ্যোতিষী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।'

বুড়ো গাছের সঙ্গে আলাপ শেষ হল। কোকন্দে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। সব পরিকল্পনা সফল হয়েছে। জোচ্চোর মুদ্রা ব্যবসায়ী রহিম বাই-এর চামড়ার থলে খুলে গেছে হোজা নাসিরুদ্দীনের সামনে। দশ হাজার টাকার সোনার মোহর ভর্তি থলেটি এখন তাঁর কোমরে গোঁজা। ওটার পাশে ঝুলছে কোতোয়ালের দেয়া দু'হাজার টাকা ভর্তি আরেকটি থলে। যে কেউ ভাববে, এখন তো তাঁর বিশ্রাম, মানে, আরাম করা উচিত। কিন্তু বিশ্রাম তাঁর নেই। নতুন চিন্তা তাঁকে তাড়া করছে।

সূর্য ডুবল। অন্ধকার নেমে এল চারদিক ঘিরে। কানাচোর গাধা নিয়ে মিলিত হল হোজা নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে। রহিম বাই-এর সোনার মোহরভর্তি থলেটা তার হাতে দিয়ে হোজা বললেন, 'এটা নিয়ে চলে যাও বিধবাটির বাড়িতে। ঘরের সামনে এমনভাবে রেখে আসবে যাতে সকালে দরজা খুললেই ওদের নজরে পড়ে। সাবধান, কেউ যেন তোমাকে না দেখে। আমি এখানেই অপেক্ষা করব তোমার জন্য।'

'আপনার হুকুম তামিল হবে,' বলে সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল কানা এবং ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরে এসে সে বলল, 'রেখে এসেছি। বিধবা তার বাচ্চাদের নিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমাকে কেউ দেখেনি।'

'চমৎকার। চল, এখন রাতটা কোথাও কাটিয়ে কাল আমরা যাই বাবা তোরা খানের মাজারে। সেখানে জিয়ারত সেরে আবার যাত্রা করব বুড়ো ফকিরের হারানো হ্রদ আর আগা বেকের খোঁজে।

রাতটা তাঁরা কাটালেন বাজারের পাশে একটা পরিত্যক্ত খালি ঘরে। সকালে ঘুম ভাঙার পর কানার হাতে কামিল বেকের দেয়া টাকার থলেটা দিয়ে হোজা বললেন, 'এটা নিয়ে বাজারে যাও। আমি যাব না, কেউ চিনে ফেলবে। আগামী-কাল রাত থেকে বাবা তোরা খানের বার্ষিক উৎসব শুরু হবে। তুমি ইতিমধ্যে

অনেক সৎ কাজ করেছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার ওপরে তাঁর রাগ আর নেই। এ কাজটা তাঁকে খুশি করে তুলবে। যাও, এ টাকা দিয়ে বাচ্চাদের জন্য যত উপহার কেনা সম্ভব কিনে আন। গভীর রাতে আমরা এগুলো ওদের জন্য রেখে আসব সকলের দ্বারে দ্বারে।'

সারাদিন ধরে কানা চোর বাজারে ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করল। বাচ্চাদের ছোট্ট জামা-কাপড়, জুতো, রঙিন টুপি, খেলনা, মিঠাই, রুপোর আঙটি আরও কত কি। বড় বস্তায় সেগুলো ভরে টলতে টলতে সে ফিরল হোজার কাছে।

হোজা বললেন, 'সাবাস! সন্ধ্যার আর দেরি নেই। এবার চল তোরা খানের মাজারে। কিন্তু বস্তাটা তো বেশি ভারী। কিছু জিনিস বের করে আমাকে দাও। গাধার পিঠে চাপাই।'

'না, আমিই নিয়ে যাব।'

হোজা আপত্তি করলেন না। মনে মনে হাসলেন। বুঝলেন, তোরা খানের প্রতি প্রবল ভক্তি-বিশ্বাসের দরুন কানা কষ্টটা করছে। এই বিশ্বাসেই সে রোগমুক্ত হবে। ওতে তোরা খানের কোন ভূমিকার দরকার হবে না।

মাজারে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দলে দলে লোক, নারী-শিশু বালক-বৃদ্ধ বেরিয়ে যাচ্ছে জিয়ারত শেষে। কানাকে নিয়ে হোজাও জিয়ারত করলেন। হঠাৎ কানা দেখল, তার লাগানো গোলাপের ডালটি বেঁচে আছে। ওতে নতুন পাতা গজিয়েছে। আনন্দে নাচতে লাগল সে ছোট্ট শিশুর মত।

ওদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ খাদেম। বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা, তোমার গোলাপ গাছ বেঁচে আছে। ওতে এবার ফুল ফুটবে। তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।'

তারপর হোজাকে বললেন, 'আজ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে এখানে। সকালের দিকে একটি মেয়েলোক, সম্ভবত বিধবা, এসেছিল। মনে হল মাথায় ছিট আছে। আমাকে বলল, আজ ভোরে নাকি সে তার ঘরের দরজায় এক থলে মোহর পেয়েছে। এটা নিশ্চয়ই বাবা তোরা খানের দয়া। তাই শুকরিয়া জানাতে সে এসেছে এখানে।'

'অলৌকিক ঘটনা,' হাসিমুখে বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন। তাঁর দিকে চোখ টিপে কানাও মুচকি হাসল।

'হ্যাঁ, অলৌকিক ঘটনাই বটে। বিধবা বলল যে অকূল সাগরে সে কূল পেয়েছে। নতুবা তিনটে বাচ্চা নিয়ে তলিয়ে যেত।'

'আমিও এরকম একটা অলৌকিক ঘটনার আশায় ঘুরছি। আগা বেক নামে একজন লোক আর একটা পাহাড়ী হ্রদের খোঁজ করছি। কেউ যদি খোঁজ দিতে পারত,' বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'কি বললেন, আগা বেক? পাহাড়ী হ্রদ? আরে ভাই, সংসারের সব কিছু ছেড়ে

এখানে চলে আসার আগে আমিই ওই হ্রদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম। আগা বেক দাবা খেলায় জিতে হ্রদটার মালিক হয়ে চাষীদের ওপর জুলুম শুরু করায় বিরক্ত হয়ে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

'আহ্, কি সৌভাগ্য আমার! এতদিন পরে আগা বেকের হ্রদের সন্ধান পেলাম!' বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন আনন্দে তাঁর মন ভরে গেল।

সে রাতে হোজা নাসিরুদ্দীন আর কানার ঘুমানো হল না। রাতের অন্ধকারে দু'জনে উপহারগুলো রেখে এলেন আশপাশের মহল্লার সকল গরীব ঘরের দরজায়। কানার মনে আনন্দ আর ধরে না। অসুরের শক্তি নিয়ে সে খাটল সারারাত।

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই হোজা বিদায় নিলেন বৃদ্ধ খাদেমের কাছ থেকে। এবার তাঁদের গন্তব্যস্থল আগা বেকের হ্রদের তীরে চোরাক গ্রাম।

একদিন একরাত পরে অনেক পাহাড়-জঙ্গল চড়াই উৎড়াই পার হয়ে শ্রান্ত দেহে তাঁরা পৌঁছলেন চোরাকের একেবারে কাছে। ছোট্ট গ্রাম। মাত্র শ'দেড়েক ঘরবাড়ি। গাঁয়ের ডান দিকে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ, বাগান, আঙ্গুরকুঞ্জ। বাঁ দিকে ডিমের আকৃতি পাহাড়ী খাদের মধ্যে শুয়ে রয়েছে হ্রদটি। পরিষ্কার টলটলে পানি ঝিকমিক করছে বিকেলের সোনালি রোদে। হ্রদের ওপারে দেয়াল ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা সুন্দর বাড়ি। হোজা নাসিরুদ্দীন বুঝলেন ওই বাড়িটাই আগা বেকের আস্তানা—ড্রাগনের বাসা।

'আমরা তাহলে পৌঁছে গেছি,' বলল কানা চোর।

'বস একটু, কথাবার্তা সব সেরে নিই,' জবাব দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'আহা কি আফসোস, এটা একটা হ্রদ, ছোট্ট কিছু হলে চুরি করা যেত। বাবা তোরা খানের মাজার দর্শন করে আসার পর ভাল কোন কাজ করার জন্য মনটা বড়ই আকুলি বিকুলি করছে।'

'ভাল কাজ করার জন্যই বটে, তবে সব ভাল কাজের চিন্তাই দেখছি চুরির দিকে যেতে চায় একটা হ্রদ দেখেও চুরির খেয়ালই তোমার মনে জাগছে, অন্য কিছুই নয়।'

'তবে কি আমরা আগা বেকের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে হ্রদটা ভিক্ষা চাইব? সে কি নিজেই ওটা উদারতা বশতঃ আমাদেরকে দিয়ে দেবে?'

'ঠিক তাই। সে নিজের হ্রদটা আমাদেরকে দিয়ে দেবে। দেখ এদিকে।' হোজা একটা ঝোপের দিকে কানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

কানা চোর দেখল একটা প্রকাণ্ড আকারের মাকড়সা একটা হলদে রঙের প্রজাপতিকে গিলে ফেলছে। প্রজাপতির পা আর ডানা দুটোই শুধু রয়েছে বাইরে, বাকি সব মাকড়সার পেটে চলে গেছে। দেখতে দেখতে সেটুকু সুদ্ধ গিলে মাকড়সাটা তার জালের এক প্রান্তে চলে গেল এবং একটা পাতার আড়ালে গিয়ে আবার ওঁৎ পাতল নতুন শিকার ধরার আশায়

হোজা কানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বুঝতে পারছ কিছু?'

'বোঝার আর কি আছে এখানে? একটা মাকড়সা একটা প্রজাপতিকে গিলে ফেলল, এই তো ব্যাপার।'

'এখন দেখ,' বলে হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর গোল টুপিটা হাতে বাগিয়ে ধরে ঝোপের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগলেন, দু'একবার নিশানা করলেন এবং ব্যর্থ হলেন। শেষে খপ করে চাপা দিয়ে ফেললেন যাকে ধরার চেষ্টা করছিলেন তাকে। টুপির ভেতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ গম্ভীর গুঞ্জন শোনা গেল।

ওটা হল এক বলিষ্ঠ সুন্দর বোলতা। বাচ্চা বা আনাড়ী বোলতা নয়—অভিজ্ঞ, পূর্ণবয়স্ক এবং বিষে ভর্তি। হোজা নাসিরুদ্দীন সাবধানে ওটাকে বের করে উল্টেপাল্টে দেখে তারিফ করতে লাগলেন।

'ওটা দিয়ে কি করবেন আপনি? আগা বেকের পাজামার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন নাকি?'

কোন জবাব না দিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন বোলতাটাকে মাকড়সার জালের মধ্যে ভাল করে জড়িয়ে দিলেন। বোলতা ছাড়া পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগল, ফলে জালটি কাঁপতে লাগল থরথর করে। পাতার আড়াল থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল মাকড়সাটি। এগিয়ে এল বোলতার কাছে, দেহ-নিঃসৃত সূক্ষ্ম সুতার দ্বারা আরও ভাল করে জড়াল বোলতাকে। একটুখানি থেমে হয়ত ভাবল, কি মোটাতাজা প্রজাপতি ধরেছি এবার! তারপর শিকারকে বাহুগুলো দিয়ে চেপে ধরে গিলবার জন্য হা করল। এমন সময় বোলতাটি হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে জাল থেকে এবং তার বিষমাখা হুলটা পুরোপুরি বিঁধিয়ে দিল মাকড়সার মোটা পেটে ঢেলে দিল সবটুকু বিষ। এই আকস্মিক আঘাতে অসাড় হয়ে গেল মাকড়সাটি, কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল চিৎ হয়ে। তারপর স্থির হয়ে গেল। বোলতা জাল থেকে ডানা মুক্ত করে গুন্‌গুন্ রবে নিজের বিজয় গান গেয়ে উড়ে গেল।

কানা বলল, 'এখন আমি বুঝেছি।'

দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে তাঁরা আলাদা হয়ে গাঁয়ে প্রবেশ করবেন চা-খানা কিংবা অন্য কোথাও দেখা হলেও একে অপরকে না চেনার ভান করবেন।

এরপর কানাকে ওখানে রেখে হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর প্রিয় গাধার পিঠে চেপে এগিয়ে গেলেন সবুজ ঘেরা চোরাকের দিকে।

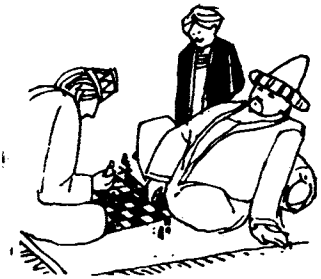

দশ

দাবার চালে কিস্তিমাত

ছোট্ট গ্রাম চোরাক ও তার আশপাশের গাঁয়ের লোকেরা একদিন বড় সুখে এবং শান্তিতে ছিল। তাদের জীবনের উৎস এই হ্রদটির মালিক ছিলেন নামাঙ্গানের এক ধনী লোক। তিনি ছিলেন ভোগবিলাসে মত্ত (তারকা-বিহারী দরবেশদের দলে যোগ দেবার আগে)। দূর পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই হ্রদটির খোঁজ-খবরও তিনি নিতেন না। এক দয়ালু বুড়ো হ্রদটির তত্ত্বাবধান করতেন (তোরা খানের মাজারের বর্তমান খাদেম)। সেচের পানির বদলে লোকেরা স্বেচ্ছায় যা দিত তাই তিনি নিতেন। মালিককে বছর শেষে দু'এক শ' টাকা পাঠিয়ে বাকি যা থাকত সেটা খরচ করতেন গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের জন্য। তারপর যেদিন আগা বেক হ্রদের মালিক হয়ে এল সেদিন থেকেই শুরু হল চোরাকের দুর্দিন।

হোজা নাসিরুদ্দীন যখন গাঁয়ের বাইরে পৌছে বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং কানার সঙ্গে পরামর্শ করছেন তখন চা-খানায় গ্রামবাসীদের বৈঠক বসেছে। সেদিন সকালে আগা বেক গ্রামবাসীদের জানিয়েছে বসন্তকালীন সেচের পানির দাম হিসেবে বুড়ো চাষী মোহাম্মদ আলীর সুন্দরী মেয়ে জুলফিয়াকে তার হাতে তুলে দিতে হবে। জুলফিয়াকে তার সাদী করার প্রস্তাব গ্রামবুড়োরা অগ্রাহ্য করলে মুচকি হেসে সে বলেছে, সেই ক্ষেত্রে সেচের পানির জন্য এবার তাদেরকে চার হাজার টাকা দিতে হবে।

চার হাজার! চোরাকের সকল বাসিন্দার পুঁজিপাটা একত্র করেও চার হাজার টাকা হবে না। অনেকক্ষণ ধরে কাকুতি-মিনতি করেও বুড়োরা আগা বেকের দাবি কমাতে পারেনি।

বৈঠকে প্রথমে অনেক উত্তেজনা, হম্বিতম্বি হল। ক্রমে সবাই নীরব হয়ে' এল। সবাই আপন স্বার্থের কথা চিন্তা করতে লাগল। মোহাম্মদ আলী আর তার মেয়ের

জন্য সবাই বিপদে পড়বে কেন? সে তার মেয়েকে আগা বেকের হাতে তুলে দিক, নয়ত চার হাজার টাকা জোগাড় করুক। গ্রামবাসীদের এই ভাবগতিক দেখে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল মোহাম্মদ আলী নীরবে।

কেবল তরুণ সাইদ—জুলফিয়ার প্রেমিক—সহ্য করতে পারল না গ্রামবুড়োদের এই স্বার্থপরতা আর কাপুরুষতা। রাগে দুঃখে সে বৈঠক থেকে উঠে চলে গেল।

ঠিক এই সময় হোজা নাসিরুদ্দীন সদর রাস্তা এড়িয়ে একটা সরু হাঁটা পথে গাধায় চড়ে গ্রামে প্রবেশ করলেন। একটা ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দেখলেন এক যুবক চোখ বন্ধ করে একটি মরা গাছের গুঁড়ির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শব্দ করে দোয়া-দরুদ পড়ছে। গুঁড়িটির ফাটলে একটা লম্বা ছুরি আটকানো এবং তার তীক্ষ্ণ ফলাটি উপরের দিকে। হোজা নাসিরুদ্দীন বুঝলেন ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে। গাধার পিঠ থেকে নেমে তিনি নিঃশব্দে গিয়ে ছুরিটি ফেলে দিয়ে বসে রইলেন গুঁড়িটির ওপর। প্রার্থনা শেষ করে উঠে দাঁড়াল যুবকটি এবং চোখ বন্ধ অবস্থাতেই গুঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই হোজা নাসিরুদ্দীন ধরে ফেললেন তাকে। মিনিট খানেক হোজা নাসিরুদ্দীনের বুকে লেপ্টে রইল যুবকটি। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'আপনি কে? কেন আমাকে বাঁচালেন? এ দুনিয়ায় বেঁচে থেকে আমার কোন লাভ নেই।'

'তোমার জীবন কিভাবে কাটবে, সুখে না দুঃখে, তা তুমি জান না। আমাকে বল, কি হয়েছে তোমার। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'আপনাকে বলে কি হবে? আপনি তো আর খলিফা হারুনুর রশীদ নন যে চার হাজার টাকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন।'

'চার হাজার টাকা দিয়ে তুমি কি করবে?'

'আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি। ওকে বিয়ে করতে চাই। ওর বাবারও এতে আপত্তি নেই। কিন্তু বাধ সেধেছে হ্রদের মালিক আগা বেক।'

'আগা বেক? তাহলে তোমার আমার দেখা হয়ে ভালই হয়েছে। আমাকে বল তোমার কাহিনী।'

জুলফিয়ার প্রেমিক সাইদের কাহিনী শুনে হোজা নাসিরুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন জমিতে সেচ দেয়ার আর ক'দিন বাকি আছে। সাইদ জানাল যে আরও দশদিন বাকি আছে।

হোজা বললেন, 'দশ দিন যথেষ্ট সময়। চিন্তা কোরো না। তোমার প্রেমিকা তোমারই হবে। আগা বেক তোমাদের ব্যাপারে নাক গলিয়েছে, আমিও তার ব্যাপারে নাক গলাব।'

সাইদ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এই অপরিচিত লোকটা কে এবং কেন তার হৃদয় লোকটার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

'দেখুন, আগা বেককে আপনি চেনেন না। সে সাংঘাতিক লোক। আর, সেচের পানির জন্য বছরে কেবল একবার নয়, কয়েকবার আমাদেরকে তার কাছে যেতে হয়। তার দাবি না মানলে প্রত্যেক সেচের জন্য সে বেশি বেশি দাম চাইবে।'

'তুমি একথা ভেব না যে তোমাদের আগা বেককে প্রতি সেচের জন্য চার হাজার টাকা দিতে আমি এসেছি। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন। কিন্তু সে সব ভবিষ্যতের ব্যাপার। এখন এস, তোমার সঙ্গে আমার চুক্তি হোক। আমার সঙ্গে তোমার দেখা আর আলাপের কথা কাউকে জানাবে না। এটা হচ্ছে আমার পয়লা শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে...'

এই সময়ে হোজার নজরে পড়ল যে সাইদের পেছনে ভাঙা পাঁচিলের ওপাশ থেকে তাঁর কানা সঙ্গী তাঁকে হাত দিয়ে ইশারা করছে।

'দ্বিতীয় শর্তের কথা তোমাকে বলব একটু পরেই। এখন তুমি চোখ বন্ধ করে বসে থাক, পেছন ফিরে তাকিয়ো না কিন্তু।'

নির্দেশ মানল সাইদ, কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহল জাগল তার মনে, এই রহস্যময় মানুষটি কার সঙ্গে কি বিষয়ে আলাপ করছে?

কানা চোরকে হোজা বললেন তাঁর হঠাৎ চার হাজার টাকার দরকার হয়ে পড়েছে।

'চার হাজার! এখানে চল্লিশ টাকাও কারও কাছে পাওয়া যাবে না,' বলল কানা

'তোমাকে কোকন্দে ফিরে যেতে হবে সেখান থেকে চার হাজার টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসবে। যেতে আসতে লাগবে ছয় দিন, কোকন্দে থাকবে তিন দিন আজ থেকে নয় দিন পরে তুমি এখানে ফিরে আসবে।'

'তারমানে একটুখানি বিশ্রামও না নিয়ে এখনি আমাকে যাত্রা করতে হবে।'

'হ্যাঁ, এখনি।'

'আরেকটা কথা—আমি যদি আমার কায়দায় চার হাজার টাকা জোগাড় করে আনি তাহলে তো আবার সৎ পথ থেকে সরে যাব।'

'না, সৎভাবে, চুরি না করে ওটা জোগাড় করবে।'

'হায় আল্লাহ! সৎভাবে? হালাল পথে? চার হাজার টাকা? আমি কি ভিক্ষা করব কোন মসজিদে গিয়ে?'

'আমার যা বলার বলেছি এবং তোমার যা শোনার শুনেছ। বাবা তোরা খানের মহিমা বৃদ্ধির জন্য একটা কাজ তোমাকে করতে হবে কোকন্দে গিয়ে। যাও, কাজটা খুঁজে বের করে এস।'

কানার মনে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল বটে, কিন্তু হোজা নাসিরুদ্দীনের আদেশ অমান্য করার চিন্তা এল না তার মাথায়। সে চোর হলেও বিশ্বাসী,

বিশ্বাসঘাতক নয়। কাজেই, মাথা নিচু করে চলে গেল।

সাইদের কাছে ফিরে গিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'আমার দ্বিতীয় শর্তটা শোনঃ আমি কে, কি করতাম অতীতে এবং কেন এসেছি এখানে—এসব কখনও জানার চেষ্টা কোরো না।'

সাইদ ঠিক এই প্রশ্নগুলোই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু রহস্যময় লোকটি তা আগেই টের পেয়ে গেছে।

'আমি এখন চা-খানায় যাচ্ছি। পরে সুযোগ মত তোমার সঙ্গে আবার কথা বলব।'

সেদিন রাতে সাইদের সঙ্গে আবার আলাপ করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'যে সাহস হারায় সে জীবনও হারায়। হোজা নাসিরুদীন—আল্লাহ তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুক—প্রায়ই বলতেন…'

'কেন, তিনি কি মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, মারা গেছেন। বোগদাদের খলিফা, নাকি বোখারার আমীর, তাঁকে মেরে ফেলেছে বলে শুনেছি কোকন্দে।'

'কথাটা মিথ্যাও তো হতে পারে?'

'হ্যাঁ, পারে। যাকগে সেকথা। তিনি বলতেন যে দুঃখের পর সুখ আসে, এবং সেটাই জীবনের রীতি।'

হোজা নাসিরুদ্দীনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইদ গেল জুলফিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। জুলফিয়া বলল যে তার বাপ তাকে আগা বেকের হাতে তুলে দেবে বলে স্থির করেছে, কাজেই ওদের পালিয়ে যাওয়া উচিত।

সাইদ ওকে জানাল যে ওরা একজন বন্ধু ও রক্ষক পেয়েছে। তাঁর নাম-ধাম না জানলেও সাইদ বিশ্বাস করে যে ওদেরকে তিনি রক্ষা করবেন। অন্তত এখনি না পালিয়ে ক'দিন অপেক্ষা করে দেখা উচিত ওদের।

জুলফিয়া মেনে নিল সাইদের যুক্তি।

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে সাইদ হোজা নাসিরুদ্দীনকে জানাল, কয় বছর ধরে হ্রদ দেখাশোনার জন্য আগা বেক কোন লোক রাখে না সেচের পানি সে নিজেই দেয়। আগে একজন ভাল মানুষ ছিল, কিন্তু লোকটা চলে গেছে। আগা বেক স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস করে না।

'সে চা-খানায় আসে না?'

'আসে প্রতিদিন দুপুরে। দাবা খেলতে খুব ভালবাসে। আর, এ গাঁয়ে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ দাবা খেলা জানে না। তাই সে আসে।'

'এখন আরেকজন হল।'

'আপনি দাবা জানেন?'

'শুধু দাবা নয়, আরও কত মজার মজার খেলা জানি—যেমন মাকড়সা আর

বোলতার খেলা…'

'ওরকম খেলার কথা তো আমি শুনিনি কোনদিন।'

'এবার শুনবে এবং দেখবেও।'

দুপুর হয়ে এল। ঘর্মাক্ত ক্লান্ত দেহে গ্রামবাসীরা কাজকর্ম থেকে ফিরতে লাগল। খদ্দেরদের দেখাশোনার ফাঁকে ফাঁকে সাইদের পালক বাপ সফর হোজা নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে কথা বলছে। এমন সময় দেখা গেল আগা বেক তার বিরাট বপু নিয়ে এগিয়ে আসছে সেদিকে। ওকে দেখেই খদ্দেররা সব ত্রস্ত হয়ে বিদায় নিল। আগা বেকের চেহারা ভাবভঙ্গি লক্ষ করে হোজা নাসিরুদ্দীন বুঝলেন লোকটা অতীতে কোন সরকারী চাকরি করেছে, তবে খুব উঁচু পদে নয়—মাঝারি পদে। হয়ত কোন বড় রকমের দুর্নীতি বা দোষ করে সে এখানে এই অজ্ঞাত জায়গায় পালিয়ে এসে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে।

আগা বেক এসে বেশ আরামে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসল। হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেন তিনি একটা মাছি।

সফর দাবার ছকটি এনে বসল মুখোমুখি হয়ে। শুরু হয়ে গেল খেলা।

সফর খেলতে লাগল ভীরু আনাড়ির মত। সে কাঁপা হাতে একবার এ ঘুঁটি, একবার ও ঘুঁটি ধরে, শেষে মরীয়া হয়ে একটাকে দেয় এগিয়ে। টিনের কৌটায় ধরা পড়া ইঁদুরের মত তার হাত ছোটাছুটি করে ছকের ওপর। এবং স্বভাবতই প্রত্যেকবারই সে হারে।

অন্যদিকে, আগা বেক ওঁৎ পেতে থাকে বাজপাখির মত। ছোঁ মেরে সে নিয়ে যায় সফরের হাতি, ঘোড়া, সৈন্য, একের পর এক। ছোঁ মারায় এতই মত্ত যে দুই দুইবার সে কিস্তিমাতের নিশ্চিত সুযোগ লক্ষ করল না।

সফর খেলছে সাদা ঘুঁটি নিয়ে। আধঘন্টার মধ্যে তার রইল কেবল একটি মাত্র সৈন্য আর রাজা, মন্ত্রী ও নৌকা। বাকি সব ঘুঁটি আগা বেক ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে। সফরের রাজা নিজের কোণটি ছেড়ে বেরুতেই দুশমনরা তাকে ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে।

আগা বেক চেঁচিয়ে উঠল, 'হার মান সফর, হার মান।' উৎকট আনন্দে ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসতে হাসতে সে বলল, 'তোমার সব ঘুঁটি আমি খেয়ে ফেলেছি। চাল দাও না, তোমার মন্ত্রী, নৌকা যেটাই চাল, রক্ষা নাই। তোমার রাজা ধরা পড়বে আমার মন্ত্রীর মরণ আলিঙ্গনে।'

আগা বেকের বিদ্রূপে রেগে উঠল সফর আলী। এক একটা ঘুঁটি হাতে তুলে নিয়ে আবার রেখে দিতে লাগল আগের জায়গায়। কোনটা চালবে বুঝতে পারল না সে।

'আরে চাল দিচ্ছ না কেন? খেলাটা তো ভালই চলছিল,' খেঁকিয়ে উঠল আগা বেক।

'হ্যাঁ, দ্বিগুণ বাজি রেখে বলা যায় খেলাটা ভালই চলছিল,' হঠাৎ মন্তব্য করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর কোণের আসন থেকে।

'দ্বিগুণ! কেন, দাবা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে এমন যে কোন লোক পাঁচগুণ বাজি রেখেও বলতে পারে সেকথা। ভাগ্য ভাল তোমার সফর, আমরা বাজি রেখে খেলছি না। নইলে আজ তোমার গায়ের কাপড় সুদ্ধ খুলে নিতাম,' মন্তব্য করল আগা বেক।

হোজা নাসিরুদ্দীন দু'জনের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'বাজির ওপর খেলতে আমার আপত্তি নাই। এ খেলার বাকিটা আমি দুই শ' টাকা বাজি রেখে খেলতে চাই।'

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল আগা বেক। 'মনে হচ্ছে রাস্তার আনাড়ি লোকদের খেলায় মাতিয়ে ফতুর করে দেয়াই তোমার পেশা। ঠিক আছে, আমি এখানে বসেই কালো ঘুঁটির ওপর পাঁচ শ' টাকা বাজি রাখতে পারি, যদি এরকম বোকা কাউকে পাওয়া যায় যে সাদা ঘুঁটির ওপর এক শত টাকা বাজি রেখে খেলতে রাজি।'

'ওরকম বোকা একজন এখানে রয়েছে। আমি সাদার ওপর দুই শ' টাকা বাজি রাখছি।'

আগা বেক ভাবল, সাদার ওপর? কোন্ ভরসায়? এরকম বেকায়দা অবস্থায় সত্যি কি লোকটা জিতবার আশা করে?

না, জিতবার আশা হোজা নাসিরুদ্দীন করেন না। দুই শ' টাকা তিনি দণ্ড দেবেন আগা বেকের সঙ্গে পরিচয় করার উদ্দেশ্যে।

সফরকে প্রশ্ন করল আগা বেক, 'কোত্থেকে এসেছে এই লোকটা? ওকি পাগল, না তোমার দোকানে বসে গাঁজা খেয়ে বুদ্ধি-সুদ্ধি সব হারিয়েছে?'

থালার ওপর দুই শ' টাকা রেখে হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। ভয় না পেয়ে থাকলে বাজি রাখুন।'

কোমর থেকে একটা মোটা চামড়ার থলে বের করে আগা বেক রাখল থালায়। বলল, 'আমি ভয় পাব? মুখ সামলে কথা বল মিয়া। এই নাও, এখানে সাড়ে সাত শ' আছে।'

'খেলা শুরু হচ্ছে,' ঘোষণা করলেন হোজা।

সফর সরে গেল এক পাশে। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে তাকাল হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে। ভাবল, লোকটার কি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেল? হঠাৎ তার খেয়াল হল যে লোকটা রাতের ভাড়া আর চা-নাস্তার দাম দেয়নি। অমনি সে বলল, 'মুসাফির, আমার পাওনা মেটাবে কি দিয়ে?'

'চিন্তা কোরো না, যদি হেরে যাই তাহলে আমার জুতা জোড়া খুলে দেব

'না, তোমার পাওনা আমিই মিটিয়ে দেব,' বলল আগা বেক। থালা থেকে দশ

টাকার একটা মুদ্রা তুলে সফরকে দিল সে।

হঠাৎ দাবার ছকের দিকে ভাল করে তাকিয়ে হোজার দম বন্ধ হয়ে এল বিস্ময়ে। তিনি দেখলেন—ভাগ্য তাঁর প্রতি অতি সদয় হয়ে উঠেছে। দেখলেন জয় তাঁর নিশ্চিত!

'আপনার দেখছি আর তর সইছে না জনাব। কিন্তু পরের পয়সায় দয়া দেখানো ভদ্রলোকের উচিত নয়,' খোঁচা দিয়ে মন্তব্য করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'পরের পয়সায়!' আরক্ত মুখে জবাব দিল আগা বেক। 'ঠিক আছে, ভবঘুরে, তোমাকে আমি ভদ্রতা শিখিয়ে ছাড়ব। সফর, মুদ্রাটা থালায় রেখে জুতা খুলে নাও। খালি পায়ে ব্যাটা বেরিয়ে যাক আমাদের গ্রাম থেকে। ভেবেছিলাম খেলা শেষে কিছু দিয়ে দেব তোমাকে। এখন এক কানাকড়িও দেব না।'

'আমি কিচ্ছু চাচ্ছি না।' জুতা জোড়া খুলে সফরকে দিয়ে দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। তারপর, নিজের মন্ত্রীকে গোটা ছক ডিঙিয়ে একেবারে বিপরীত দিকের কোণে নিয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, 'কালো রাজাকে সামলান এবার।'

'কি সর্বনাশ!' নাক সিটকে বলল আগা বেক। 'ভয়ে আমার বুক ফেটে যাবে দেখছি। কি প্রচণ্ড আঘাত! কিন্তু মিয়া, তুমি কি অন্ধ হয়েছ? দেখছ না ওখানে আমার নৌকা পাহারায় আছে? কোথায় তোমার মন্ত্রী এখন?' বলতে বলতে নৌকা দিয়ে সাদা মন্ত্রীকে খেয়ে ফেলল সে। তারপর আবার বলল, 'এখন কি করবে তুমি বেআদব বাউণ্ডুলে? মন্ত্রী হারিয়ে আর একটি মাত্র চাল দেবার সুযোগ পেয়েছ তুমি!'

জবাবে হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর নৌকাটাকে কালো ঘর থেকে সাদা ঘরে সরিয়ে একটি মাত্র কথা বললেন, 'কিস্তিমাত।'

নির্বিকারভাবে বসে রইল আগা বেক ছকের দিকে তাকিয়ে। কি হয়েছে বুঝে উঠতে তার সময় লাগল। তারপর ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই মুখটা তার নীল হয়ে গেল।

'খেল খতম।' বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সফর থালাটি বাড়িয়ে ধরল হোজার সামনে। তিনি আগা বেকের সাড়ে সাত শ' টাকা নিজের থলেতে ভর্তি করলেন এবং জুতো জোড়া আবার পরলেন।

আগা বেক চোখ গোল করে তাকিয়ে রইল ছকের দিকে একটি কথাও না বলে। মুখের নীল রঙ বদলে হয়ে গেল গভীর কালো।

'সফর মিয়া, গাঁয়ে হেকিম-বৈদ্য নাই? মৃগীরোগের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য এ ভদ্রলোকের এখনি রক্ত মোক্ষণ দরকার।' হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন চা-খানার মালিককে।

কিন্তু বিপদটি কেটে গেল ধীরে ধীরে। আগা বেক সুস্থির হয়ে উঠল। একটা

শরীর-কাঁপানো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কি আশ্চর্য, আমি ওটা লক্ষ করিনি। সত্যি, মুসাফির, তুমি আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছ।'

'তাহলে আসুন আরেকবার খেলি।'

'তোমার সঙ্গে ওই ছক নিয়ে আবার বসার আগে ইবলিস যেন আমাকে গিলে খায়! যা পেয়েছ সেটা নিয়ে এখনি বিদায় হও এ গ্রাম থেকে।'

কিন্তু এত শিগগির বিদায় নেবার মোটেও ইচ্ছে নেই হোজা নাসিরুদ্দীনের। তিনি বিষণ্নভাবে মাথা নিচু করে বলে উঠলেন, 'আপনি বলছেন—বিদায় হও। একথাও বলতে পারতেন—ভাগ, পালাও। হায়রে নিষ্ঠুর ভাগ্য আমার!'

আগা বেক কান খাড়া করে প্রশ্ন করল, 'তোমাকে কি কেউ পেছন থেকে তাড়া করছে?'

'আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে আমার মন্দভাগ্য, বিপদ-আপদ, ব্যর্থতা।'

'তোমার ব্যর্থতাগুলো যদি আজকের মত হয় তাহলে তো তোমাকে ঈর্ষা করা উচিত।'

'এটা তো একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র।'

'তুমি যাবে কোথায়?'

'জানি না। যেদিকে দু'চোখ যায় আমিও সেদিকে যাই, পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ বিচার করি না।'

'কিন্তু তোমার এই সফরের নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে। মনের আনন্দে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবার মত ধনী লোক তো তুমি নও।'

আগা বেকের এসব প্রশ্নের পেছনে একটা মতলব ছিল সেটা হচ্ছে মুসাফিরটি কোন অপরাধ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কিনা জেরার মাধ্যমে তা জেনে নেয়া। তাহলে ওকে ধরে ওর কাছ থেকে তাঁর সাড়ে সাত শ' টাকা উদ্ধার করে ওকে পাহারাদারদের হাতে তুলে দেয়া যাবে। আগা বেকের মতলব আঁচ করে হোজা হাসলেন মনে মনে। তিনি জবাব দিলেন, 'হায়, আনন্দ কোথায় পাব আমি। আপনাকে বলি হুজুর, এই সেদিনও আমার বাড়ি ছিল, সচ্ছল অবস্থা ছিল, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে হঠাৎ সব কিছু হারিয়ে আমি পথের ভিখারী হয়েছি।'

'কি দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েছিলে তুমি?'

'আমার জীবনের কাহিনী হাজারো দুঃখের সুতোয় বাঁধা আমি হিরাতে থাকতাম। সেখানে বাজার তত্ত্বাবধায়কের কেরানি ছিলাম।'

'হিরাত? ওখানে আমিও ছিলাম এক সময়। বলে যাও।'

'আমার কর্তা আমার ওপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। আমি তাঁর হয়ে খাজনা আদায় করতাম অত্যন্ত চড়া হারে। চাষা আর কারিগরদের নিংড়ে বের করা প্রতিটি পয়সা আমি তাঁর হাতে তুলে দিতাম। আমার প্রভু সব সময় বলতেন, "উজাক বাই, আমার হাজার মটকা-ভর্তি সোনা থাকলেও নির্ভয়ে তোমার হাতে ঘরের

চাবিটা তুলে দিতে পারি।" এবং তিনি ভুল বলতেন না। তাঁর সম্পত্তি আমার কাছে আমার নিজের সম্পত্তির চেয়েও পবিত্র ছিল। আমার বাপ ছিলেন এক উমরাহের গোমস্তা। তাঁর কাছেই আমি এ শিক্ষা পেয়েছিলাম এবং আজও তা মেনে চলি। আমার প্রভু আয়ের বিশভাগের এক ভাগ আমাকে দিতেন আমার বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসেবে।'

'অতি সামান্য।' মন্তব্য করল আগা বেক।

'তা সত্ত্বেও আট বছরে বেশ কিছু জমিয়েছিলাম। আমি একটা বিদ্যার চর্চা করি। এ সঞ্চয়টা সেই কাজে ব্যয় করব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার কর্তা বিপদে পড়ে গেলেন। তিনি একটা ভুল করে বসলেন।'

আগা বেক গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। বাঁ হাতে কিছু নিয়ে পকেটে ঢোকাবার ভঙ্গি করে সে বলে উঠল, 'এই ব্যাপার তো?'

'তাঁর দুশমনরা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল ওপরে। ফলে তাঁর চাকরি গেল, বিষয় সম্পত্তি আর সঞ্চিত অর্থ সবই বাজেয়াপ্ত হল।'

'বুঝেছি,' সহানুভূতির সঙ্গে মাথা দুলিয়ে বলল আগা বেক। 'এসব ভুলের পরিণাম একেক সময় খুবই মারাত্মক হয়!'

আগা বেকের এই উক্তি তার নিজের জীবনের অতীত ইতিহাসের আরেকটা অধ্যায় উন্মুক্ত করে দিল হোজা নাসিরুদ্দীনের সামনে।

'আমার প্রভুর দুর্ভাগ্য আমাকেও স্পর্শ করল। ফলে আজ আমি ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার পুঁজিপাটা শেষ হয়ে এসেছিল। হঠাৎ আপনার সঙ্গে এই মোলাকাত এবং সাড়ে সাত শ' টাকা লাভ। এটা আমি বেশ বুঝে সুঝে ব্যয় করব।'

'আর কারও সঙ্গে দাবা খেলবে?'

'না হুজুর, ওরকম বদখেয়াল আমার যেন আর না হয়। আমি আমার মনের মত একটা কাজ বেছে নেব।'

'সেটা কি, ব্যবসা?'

'ব্যবসা আমার পছন্দ নয়। আমি চাই নির্জন জায়গায় একটা চাকরি, যেখানে আমি আমার বিদ্যাচর্চা নিয়ে পড়ে থাকতে পারব। কিন্তু জামানত ছাড়া কে আমাকে অমন চাকরি দেবে? এখন অবশ্য জামানত দেবার ক্ষমতা আমার হয়েছে...'

'তুমি তাহলে চাকরি খুঁজবে এখন?'

'আমি তো এখানে আর বসে থাকতে পারি না। বিশ্রাম হয়েছে, এবার যাত্রা করব। সাড়ে সাত শ' টাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, হুজুর। সফর মিয়া, তোমার কত পাওনা হয়েছে?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও মিয়া, যেয়ো না। তোমার সঙ্গে আমার জরুরী আলাপ

আছে।'

হোজা বুঝলেন, 'এতক্ষণ সুকৌশলে যে লোভের দড়িতে তিনি আগা বেককে জড়াচ্ছিলেন এবার তাতে টান পড়েছে।

'তুমি তো চাকরি খুঁজছ, তাই না? আমি সেই ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

'আপনার খোঁজে ওরকম চাকরি আছে হুজুর? আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

'চাকরি আছে একটা এবং হাতের কাছেই।'

মুখে বিনম্র বিভ্রান্তির ভাব ফুটিয়ে হোজা বললেন, 'হাতের কাছেই? হুজুরের ধাঁধা আমি বুঝতে পারছি না।'

'প্রথমে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও, পরে আমি তোমাকে ধাঁধার মানে বলব। তুমি কি এর আগে কখনও আমাদের গাঁয়ে এসেছ?'

'আসিনি।'

'এখানে তোমার কোন আত্মীয় আছে?'

'কেউ নাই। আমার আত্মীয়রা সবাই হিরাতে

'কোন বন্ধু-বান্ধবও নাই এখানে?'

'বন্ধু-বান্ধবও কেউ নাই, সবাই হিরাতে।'

'তোমার হিরাতবাসী বন্ধু-বান্ধবদের কোন আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব?'

'তা-ও নাই হুজুর। আমার আত্মীয় বান্ধবরা চোরাকের নামও কোনদিন শোনেনি।'

'আরেকটা প্রশ্ন, পরের জন্য কি তোমার হৃদয়ে দয়ামায়া জাগে?'

'আমার হৃদয়ের দয়ামায়া কেবল নিজের জন্য, সেখানে অন্যের হিস্যা নাই

'চমৎকার বলেছ। এখন শোন ওই হ্রদটা দেখছ? ওটার মালিক আমি তুমি জামানত রেখে পেট চলার মত চাকরি চাও। আমি তোমাকে ওই হ্রদের চৌকিদার করতে চাই, কি বল তুমি?'

ঠিক এই প্রস্তাবটিই শোনার অপেক্ষা করছিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন অনেকক্ষণ ধরে। শেষপর্যন্ত কথাটি বেরুল আগা বেকের মুখ থেকে।

দশ মিনিটের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল গোটা গ্রামে। হ্রদের নতুন চৌকিদারকে নিয়ে আগা বেক বেরিয়ে গেল চা-খানা থেকে

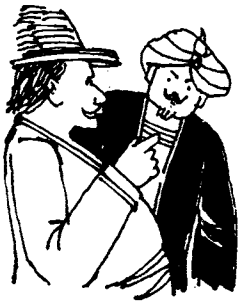

এগারো

রহস্যের টোপ গিলল আগা বেক

আগা বেক হোজা নাসিরুদ্দীনকে নিয়ে গেল হ্রদের শেষ প্রান্তে সেচের পানি দেয়ার নালার কাছে। সেখানে মস্তবড় এক কাঠের বেড়া বেড়ার মাঝখানে ছোট্ট একটা দরজা। দরজাটি ওপর থেকে শেকল টেনে খোলা ও বন্ধ করা যায়। খুলে দিলে পানি গড়িয়ে পড়ে নালায়। দরজায় এক মস্তবড় তালা লাগানো।

আগা বেক বলল, 'দেখ, তোমাকে এটা পাহারা দিতে হবে। আমার অনুমতি ছাড়া কারও জন্য এটা খুলবে না। বিশ্বাসের ওপর কাউকে এক ফোঁটা পানিও দেবে না এই রইল চাবি, এটা সামলে রাখ। না হলে, কোন বদমাশ ওটা দেখে নকল চাবি বানিয়ে ফেলতে পারে।'

হোজা চাবিটি পকেটে পুরে সাড়ে সাত শ' টাকার থলেটি আগা বেককে দিয়ে বললেন, 'নিন, এটাই আমার জামানত।'

কাছেই উঁচু ঢিবির ওপর একটা মেটে কুঁড়েঘর দেখিয়ে আগা বেক বলল, 'তুমি ওই ঘরে থাকবে প্রতি রাতে বেরিয়ে দেখবে কাঠের বেড়ার দরজা এবং তালাটা ঠিকমত লাগানো আছে কিনা। বুঝতে পেরেছ? মনে থাকবে তো?'

হোজা নাসিরুদ্দীন মাথা নেড়ে জানালেন যে তিনি বুঝেছেন এবং তাঁর মনে থাকবে।

এমনি করে হোজা নাসিরুদ্দীনকে নতুন চাকরিতে বহাল করে আগা বেক চলে গেল বাড়ির পথে। গোঁফের আড়ালে তার হাঁসির রেখা, কোমরবন্ধে ঝুলছে সাড়ে সাত শ' টাকার থলে 'মাস দেড়-মাসের মধ্যেই কোন এক অজুহাতে আমি এ ব্যাটাকে বরখাস্ত করব, আর জামানতটা রেখে দেব। হ্রদের জন্য লোক রাখার দরকার কি? আমি নিজেই তো এতবছর একটা শক্ত মোটা তালার সাহায্যে কাজ চালিয়ে এসেছি'—মনে মনে বলল সে।

গোটা বিকেলটা হোজা নাসিরুদ্দীন কাটালেন তাঁর নতুন ঘর ঠিকঠাক করার কাজে। গাছের ডাল কেটে ঘরের মাঝখানটায় বেড়া দিয়ে দুটো কামরা বানালেন। এক কামরা তাঁর, অপরটা তাঁর গাধার। গাধাকে খাবার দিতে দিতে তিনি বললেন, 'কি রে, নতুন ঘর পছন্দ হয়েছে তোর? এখন প্রশ্নটা দাঁড়াল এই যে, এক ছাতের নিচে একত্রে থাকা–এটাকে আমরা কিভাবে নেব আমি গাধার স্তরে নেমে যাচ্ছি, নাকি, তুই মানুষের স্তরে উন্নীত হচ্ছিস?'

তাঁর এ কথাগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহের এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল

রাতের অন্ধকার নেমে আসতেই পেছনে একটা খসখস আওয়াজ শুনে হোজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'আমি সাইদ। শুনলাম আপনি চাকরি পেয়েছেন, কথাটা ঠিক কিনা দেখতে এলাম।'

'মনে হচ্ছে এতে তুমি চিন্তিত হয়ে পড়েছ?'

'এখন যদি আপনি আমাদের কথা…'

'ভুলে যাই, তাই না? শোন বোকা ছেলে, বন্ধুর ওপর আস্থা রাখার শক্তি অর্জন কর, বিশ্বাস করতে শেখ, জীবনে বিশ্বাসের বড়ই প্রয়োজন।'

'আমাকে মাফ করুন।'

'আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কোরো না। আমাদের দু'জনকে কেউ যেন একত্রে না দেখে। আমার খেলাটা নষ্ট করে দিয়ো না। ডাকলে আসবে, নতুবা নয়, বুঝলে? এখন যাও।'

সাইদ বিদায় নিল।

বাইরে নিস্তব্ধ রাত ঘুমন্ত বাগান। রূপোলী কুয়াশা। বুলবুলির ভরাট গলার গান, টিকটিকি গিরগিটির আনাগোনার সরসর আওয়াজ গ্রামের প্রান্তে গাছ-গাছালির ছায়ার অন্ধকারে ফিসফাস আলাপের গুঞ্জন, 'আমি গতকাল আমাদের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাঁকে দেখেছি। আগা বেকের সঙ্গে চা-খানা থেকে বেরিয়ে তিনি এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কি কঠোর এবং দেমাকি তাঁর মুখের ভঙ্গি। আমাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি কি তিনি রাখবেন?'

'ও জুলফিয়া, বন্ধুকে বিশ্বাস করার মত মনের জোর তোমার নেই কেন? বিশ্বাস করতে শেখো আমাদের জীবনে বিশ্বাসের বড় প্রয়োজন। তুমি কি জান না যে ভাগ্য হচ্ছে আরবী ঘোড়ার মত? ভীরু সওয়ারকে সে আছড়ে ফেলে দেয় মাটিতে, আর সাহসী সওয়ারের বশ্যতা স্বীকার করে!'

'সাইদ, কি চমৎকার করে কথা বল তুমি–আমাদের বুড়ো মোল্লাও অত সুন্দর করে কথা বলতে পারবেন না।'

'জুলফিয়া, কঠোর শীতের পরই আসে বসন্তের সোনালি দিন। সব সময় মনে রেখ এ কথাগুলো, দুর্দিনের কথা ভুলে যাও।…'

'আরে, এ যে কবিতা! সাইদ, তুমি কি নিজেই রচনা করেছ এটা, আমার জন্য?'

বুলবুলির গান স্তব্ধ হল। টিকটিকি গিরগিটিরা গাছের গুঁড়ির ফোকরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল। আকাশের তারা অবস্থান বদলাল। কালো জলরাশির ওপর জমাট বেঁধে উঠল ঘন কুয়াশার পুঞ্জ। রাত বিদায় নিল ধীর পদক্ষেপে।

দু'দিন পরে হ্রদের নতুন চৌকিদার বা তত্ত্বাবধায়ক চা-খানায় এল সময়টা তখন দুপুরের পর আগা বেক সফরের সঙ্গে দাবা খেলে চলে গেছে। এসেই লোকটা কারও দিকে না তাকিয়ে এবং কারও সালামের জবাব না দিয়ে সোজা চলে গেল তন্দুরঅলার কাছে। তারপর এক ঝুড়ি তন্দুরী রুটি আর এক ঝুড়ি খোবানি কিনে নিয়ে ফিরে গেল আপন আস্তানায়।

হোজা নাসিরুদ্দীনের এই কাণ্ড দেখে বিস্মিত হল সব খদ্দের। এত রুটি, এত খোবানি দিয়ে লোকটা করবে কি? খাবে? ও তো পাঁচ জনের খাবার। কয়েকদিন ধরে খাবে? কিন্তু রুটি তো কালই বাসী হয়ে যাবে এবং খোবানি পঁচে যাবে। তবে কি লোকটা কুঁড়ে স্বভাবের? খদ্দেররা বলাবলি করতে লাগল এসব কথা।

পরদিনও একই ব্যাপার ঘটল। লোকটা যথাসময়ে এল, এক ঝুড়ি রুটি ও এক ঝুড়ি খোবানি নিয়ে চলে গেল।

এবার চা-খানার খদ্দেরদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। গতদিনের রুটি খোবানি লোকটা কি করল? একাই খেয়ে ফেলল? এটা কি করে সম্ভব? জ্বীন ভর করেছে নাকি ওর ওপর?

চা-খানার এসব জল্পনা-কল্পনার আগুনে এক রাখাল ছেলে এসে ঘি ঢেলে দিল। সে যা বলল তাতে সবার আক্কেল গুড়ুম! রাখালটা মঠ থেকে আসছিল রুটি কেনার জন্য। হঠাৎ নয়া চৌকিদারের ঘরের দিকে তাকাতেই দেয়ালের ছিদ্র পথে সে দেখল এক অদ্ভুত কাণ্ড! লোকটা তার গাধাকে সাদা রুটি খাওয়াচ্ছে, ছুরি দিয়ে খোবানি কেটে কেটে বীচি ও পোকা বেছে ফেলে গাধার মুখে তুলে দিচ্ছে! এই কাণ্ড দেখে সে ছুটে এসেছে এখানে সবাইকে বলার জন্য।

গাধাকে তন্দুরী আর খোবানি খাওয়াচ্ছে! শুনে সফরের মুখ হা হয়ে গেল। রহমতুল্লাহ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে, আটাঅলা আর মাখনঅলা বিশ্বাস করল না এই আজগুবি কথা।

চা-খানার শ্রোতাদের মধ্যে এক যুবক ছিল বেশ সাহসী। সে বলল সন্ধ্যার সময় চুপিচুপি গিয়ে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে আসবে। সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে সত্যি সে গিয়ে উঁকি মারল চৌকিদারের ঘরের মধ্যে।

গাধার তখন নৈশ আহারের সময়। পরম আরামে সে সাদা রুটি আর খোবানি খাচ্ছে। নতুন চৌকিদার বারে বারে কুর্নিশ করে তাকে বলছে, 'এটা খান মহামান্য

প্রভু'···'ওটা একটু মুখে দিন শাহজাদা' বলে একবার রুটি, একবার খোবানির কাটা টুকরা নিজ হাতে গাধার মুখে তুলে দিচ্ছে।

যুবকটি ফিরে এল চা-খানায়। আদ্যোপান্ত বর্ণনা করল সে যা দেখেছে। আবার শুরু হল জল্পনা-কল্পনাঃ ব্যাপারটা তাহলে সত্য! কিন্তু এর মানে কি? লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তা যদি হয় তবে আগা বেক কেন সেটা ধরতে পারল না? আর পাগল হলে সে দাবা খেলল কি করে অমন দক্ষতার সঙ্গে? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গভীর রহস্য আছে। আচ্ছা, আগা তার নতুন চৌকিদারকে নিয়ে কোন গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁদছে না তো! গাধাকে নিয়ে এসব কাণ্ড হয়ত সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ হয়ত নতুন চৌকিদারকে দিয়ে এসব পাগলামির অভিনয় করিয়ে গাঁয়ের লোকদের বোকা বানিয়ে ওদের জমিজমা, বাগান, সবকিছু হাতিয়ে নিতে চায় আগা বেক।

গাঁয়ের লোকদের হাবভাব লক্ষ করে হোজা নাসিরুদ্দীন বুঝলেন, সবকিছু তাঁর পরিকল্পনা মতই এগিয়ে যাচ্ছে। পরদিন দাবা খেলতে খেলতে সফর আগা বেককে জানাল তার চৌকিদারের গাধা-ভোজের কাহিনী। শুনে হতভম্ব হয়ে গেল আগা বেক। খেলা শেষে অন্য দিনের মত চলে না গিয়ে সে বসে রইল চৌকিদারের রুটি খোবানি কেনার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার জন্য।

এইদিন হোজা নাসিরুদ্দীন উদ্দেশ্যমূলকভাবে এক নয়, দুই নয়, একেবারে চার ঝুড়ি রুটি আর খোবানি কিনলেন। রুটিঅলার সহকারীর মাথায় চাপিয়ে সেগুলো নিয়ে গেলেন তাঁর আস্তানায়। তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন, আগা বেককে দেখেননি ওখানে। মনে মনে বললেন, 'আগা বেক, আজ তুমি আমার ঘরে আসবেই।

সন্ধ্যার দিকে হোজা নাসিরুদ্দীন কুঁড়েঘরের মেঝেতে পানি ছিটিয়ে দিলেন, কিছু ডালপালা কেটে এনে গাধার জন্য বিছানা তৈরি করলেন। তারপর খোবানিগুলো দু'টুকরো করে বীচি ছাড়িয়ে আট টাকা দিয়ে কেনা নতুন নকশা আঁকা থালায় সুন্দর করে সাজালেন।

কিছুক্ষণ পরে আধখোলা দরজা দিয়ে তিনি আড়চোখে লক্ষ করলেন যে আগা বেক তাঁর কুঁড়েঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

হোজা নাসিরুদ্দীন তন্দুরী রুটির ঝুড়ি আর খোবানির থালা হাতে গাধার দিকে মুখ ও দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়ালেন।

ওদিকে আগা বেক তার ভারী দেহ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। আড়চোখে সেটা লক্ষ করে হোজা নাসিরুদ্দীন গাধার দিকে একটা রুটি বাড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'হে আমার মহামান্য প্রভু, হে শাহী খান্দানের উজ্জ্বল মুকুট, এই অজ গাঁয়ে এর চাইতে ভাল কিছু আমি খুঁজে পাইনি এখানকার রুটিঅলারা শাহী মহ ব রুটিঅলাদের ধারে কাছেও কোনদিন ঘেঁষতে

পরেনি! কাজেই এদের কাছ থেকে এর চাইতে ভাল কি আশা করা যেতে পারে? তবে হাঁ, খোবানিগুলো চমৎকার, পোকায় ধরা না। আমার বিশ্বাস, ওগুলো মহামহিমের অনুমোদন লাভ করবে।'

খোবানিগুলো ছিল সত্যি অনুমোদনের যোগ্য। পলকে সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল থালা থেকে। খোবানি সাবাড় করে গাধা রুটির ঝুড়ি থেকে এক সঙ্গে চারটা রুটি কামড়ে নিয়ে কোঁৎ করে গিলে ফেলল।

এমন সময় দরজার বাইরে আগা বেক নড়েচড়ে উঠল। খসখস শব্দে চমকে ওঠার ভান করে হোজা নাসিরুদ্দীন পেছন ফিরে তাকালেন এবং চোখে মুখে হতভম্ব ভাব ফুটিয়ে তুললেন। ইচ্ছাকৃত আনাড়ীপনার সঙ্গে তিনি গাধাকে আগা বেকের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে চাইলেন।

আগা বেক প্রবেশ করল ঘরের ভেতর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল হোজা নাসিরুদ্দীনকে। তারপর যেন সবকিছু বুঝে ফেলেছে এমন ভাব দেখিয়ে ভারিক্কি চালে বলল, 'বুঝলাম ব্যাপারখানা। ঝুড়িভর্তি খোবানি আর রুটি দিয়ে তুমি তাহলে এই কাণ্ড কর।'

হোজা নাসিরুদ্দীন তোতলাতে তোতলাতে বললেন, 'আ···আমি কিছুই করছি না, আমি এ···এগুলো খাই।'

'তুমি এগুলো খাও!' নাক সিঁটকে দাড়ি চুমরে আগা বেক বলল, 'দিনে দুই ঝুড়ি রুটি আর দুই ঝুড়ি খোবানি! মিথ্যে বোলো না, সত্য কথা বল!' হোজা নাসিরুদ্দীনের বিব্রত ভাবের মধ্যে কোন লুকানো কুমতলবের আঁচ পেয়ে আগা বেক হুঙ্কার দিল, 'সত্য বল, আমি দেখেছি তুমি খোবানি আর রুটি খাওয়াচ্ছ তোমার গাধাকে।'

হোজ্জা নাসিরুদ্দীন চোখ কপালে তুলে জিহ্বা কামড়ে বললেন, 'আস্তে! আপনার আল্লাহ্‌র দোহাই হুজুর, আস্তে! ওই কর্কশ শব্দটা উচ্চারণ করবেন না, ওটা এখানে বেমানান।'

'বেমানান? ফুঃ! এখানে একটা গাধা দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটা গাধা দেখছি এবং ওটাকে আমি গাধাই বলি!'

'তিন তিনবার উচ্চারণ করলেন? হায়-হায়-হায় খোদা, আমার কি হবে? চলুন মালিক, আমরা বাইরে যাই, দরজা বন্ধ করে দিয়ে নির্জনে কথাবার্তা বলি।'

'আমরা এখানেই নির্জনে কথা বলতে পারি না? সত্যি কি তুমি ওই গাধাটাকে একজন তৃতীয় ব্যক্তি বলে গণ্য করেছ?'

'আবার? কি মুশকিল! চলুন, চলুন কর্তা, আসুন!'

আগা বেককে কোন রকমে ঘর থেকে বের করে হোজা দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আগা বেকের জেরা। হোজা অনুনয় করে বললেন, 'আমাকে প্রশ্ন করবেন না মালিক। এটা অত্যন্ত গোপন ব্যাপার। এ দুনিয়ার অনেক

রুই-কাতলা এর সঙ্গে সঙ্গে জড়িত।'

'রুই কাতলা? তাহলে আমাকেও গোপন কথা বলতে পার, কারণ আমিও তাদের একজন।'

'আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে হুজুর। অবশ্যই এখানে, এই চোরাকে আপনি বড়, কিন্তু ওঁদের সঙ্গে তুলনায় আপনি একটা মাছি, না, একটা পিঁপড়া মাত্র।'

'কি বললে? আমি একটা পিঁপড়া?'

'আমাকে মাফ করুন, হুজুর, আমি রাজা-বাদশাহদের কথা বলছিলাম কিনা…'

'রাজা-বাদশাহ?' আগা বেকের হৃদয়ের হুঁকোর কলকেতে অধৈর্যের আগুন জ্বলে উঠল এবং ধোঁয়া উঠতে লাগল তা থেকে। 'তুমি আমার কর্মচারী—আমার কাছে কিছু লুকানো তোমার উচিত নয়।'

যেন মহা দ্বিধায় পড়েছেন এমন ভঙ্গিতে হোজা নাসিরুদ্দীন মাথা নোয়ালেন।

'হায় আল্লাহ! আমি কি করব? একদিকে, আমার উপকারী মনিবের কাছ থেকে কিছু গোপন করা আমার উচিত নয়—আমার বেহেস্ত-নসীব-আব্বা আমাকে সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।'

'তিনি ভাল শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।'

'অন্যদিকে রয়েছে অতি গোপন তথ্য ফাঁসের দায়ে প্রবল প্রতাপশালীদের ক্রোধের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার আশঙ্কা। আর প্রবলের সেই ক্রোধ এমন ভয়ঙ্কর যে আমার সাথে আপনিও তাতে ধ্বংস হয়ে যাবেন।'

'আমি কাউকে বলব না।'

'বেআদবী না নিলে আপনাকে আমি অনুরোধ করব, শপথ করে বলুন কথাটা।'

'শপথ করে বলছি, গোপন কথা প্রকাশ করলে আমি যেন রোজ হাসরে রসুলের সাফায়াত না পাই।'

মহা গোপন কথা জানার জন্য তৈরি হয়ে আগা বেক হোজা নাসিরুদ্দীনের গা ঘেঁষে বসল।

কিন্তু হোজার পরিকল্পনা অনুযায়ী গোপন কথা বলার সময় তখনও আসেনি, ফল তখনও পাকেনি। কাজেই আগা বেকের শত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি অনড় রইলেন। বললেন, অন্তত আরও এক সপ্তাহ যাক তার আগে তিনি মুখ খুলতে পারবেন না। এ জন্য চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হলেও যাবেন।

'চাকরি ছেড়ে চলে যাবে? কেন, কেন? তুমি থাক, এখন না পারলে এক সপ্তাহ পরে বলবে। আমি অপেক্ষা করে থাকব,' বলল আগা বেক।

রহস্যের কীট দিয়ে তৈরি টোপ কোঁৎ করে গিলে আগা বেক ধরা পড়ে গেছে বড়শিতে।

বারো

সিন্দুকে বন্দী কোতোয়াল আর কানা চোর

এখন কানা চোর কবে ফিরবে সেটাই হল হোজা নাসিরুদ্দীনের প্রধান চিন্তার বিষয়। কানা কেমন আছে, কি করছে কোকন্দে, সে কি পারবে চার হাজার টাকা জোগাড় করে আনতে?

উদভ্রান্তের মত দু'দিন যাবত ঘুরে বেড়াচ্ছে কানা কোকন্দের পথে পথে। চার হাজার হালাল টাকা সে কোথায় পাবে? শত শত মোটা পকেট, ভারী থলে সে দেখছে চারপাশে। ইচ্ছে করলেই হাত সাফাই করে তুলে নিতে পারে, কিন্তু ওটা তো হবে চুরি। তবে সে কি করবে? ভাবতে ভাবতে তৃতীয় দিন সে চলে গেল রহিম বাই-এর দোকানের সামনে। হোঁৎকা রহিম বাইকে দেখেই তার মনে হলঃ এই হারামীটার কাছেই পাওয়া যাবে হালাল টাকা।

সারা দিন গা ঢাকা দিয়ে রহিম বাই-এর দোকানের ওপর নজর রাখল সে সন্ধ্যা হতেই দোকান বন্ধ করে সোনা-রূপো ভর্তি একটা মোটা থলে কোমরে ঝুলিয়ে রহিম চলল বাড়ি। কানাও চলল তার পিছু পিছু। বাড়ির সামনে গিয়ে সদর দরজায় ঘা দিতেই এক বুড়ো দারওয়ান দরজা খুলে দিল। রহিম বাই ভেতরে চলে গেলে দরজা আবার বন্ধ হল। কানা একটু দূরে এক গাছতলায় টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে রইল ঘুমের ভান করে।

কিছুক্ষণ পরেই দরজা আবার খুলে গেল রেশমী পোশাক পরে বেরিয়ে এল রহিম বাই। এবার থলেটি তার সঙ্গে নেই, তবে ভারী পকেট দু'টি ঝুলে আছে হাঁটুর নিচে। তার পেছনে এসেছেন রূপবতী আরজু বিবি। স্বামীকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কখন ফিরবে তুমি, কতক্ষণ রাত জেগে বসে থাকব?'

'আরে, ভাবনার কি আছে? ওয়াহিদের বাসায় যাচ্ছি একটু পাশা খেলতে। গতকাল তিনশ' সত্তর টাকা জিতে নিয়েছে আমার কাছ থেকে, ওটা উদ্ধার করতে

হবে না?'

'তুমি আছ তোমার পাশা, ঘোড়া, আর বাজার নিয়ে–আমার জন্যে কোন জায়গা নাই তোমার পাষাণ দীলে।'

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন আরজু বিবি।

কিছুক্ষণ পর দরজাটা আবার খুলল। বেরিয়ে এল বুড়ো দারওয়ান আর এক ছোকরা চাকর। বুড়ো বলল, 'দেখো তো কাণ্ড! এখন মনিবানীর আবার সখ হয়েছে তাজা খেজুর খাওয়ার। এই রাতের বেলায় কোথায় পাব তাজা খেজুর?'

ছোকরা বলল, 'আমাকে পাঠাচ্ছেন হিন্দুস্থানী সরবত আনতে। ঘুমের সময়টাও দিলেন নষ্ট করে।'

বুড়ো বলল, 'আরে ধুত্তোরি, চলো, কোন চা-খানায় বসে বসে আড্ডা দিই। পরে গিয়ে বলব কোথাও ওগুলো পাইনি।'

এরা চলে যেতেই আবার দরজা খুলে বেরিয়ে এল কয়েকজন দাসী। সবাই কথা বলছে কলকল করে।

'মনিবানীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে আজ! আমাকে পাঠাচ্ছেন করমালী মহল্লায় তাঁর জরীওয়ালীর বাসায় যেন কাল সকালে গেলে হত না।'

'আর আমি যাচ্ছি আরবী মহল্লায় ওড়নাওয়ালীর কাছে। বুঝি না এত তাড়া কিসের।'

'বুঝিস না? আরে ছুঁড়ি, মান্যবর কামিল বেকের কথা ভুলে গেছিস?' জবাবে খিক্ খিক্ করে হেসে উঠল সবাই।

'চল্, কেউ কোথাও না গিয়ে আমার খালার বাড়িতে যাই। এই তো, কাছেই। সেখানে ঘন্টা দুই কাটিয়ে এসে কিছু একটা বানিয়ে বলে দেব। ততক্ষণ বেটি বসে থাকুক একা।'

একা? তড়াক করে উঠে বসল কানা। দাসীদের কণ্ঠ মিলিয়ে গেল দূরে। এমন সময় দরজাটা আবার খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন লম্বা বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে স্বয়ং আরজু বিবি ভারী নিতম্ব দুলিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন বাজারের দিকে।

কানা উঠে দাঁড়াল। এই তো সময় এই তো সুযোগ! পলকের মধ্যে সে ঢুকে পড়ল বাড়িতে! একটার পর একটা কামরায় ঢুকে সে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল কোথায় সেই চামড়ার মোটা থলেটি, কোথায় রেখে গেল রহিম বাই? তার হাতের অপূর্ব কৌশলে খুলে যেতে লাগল বাক্স-পেঁটরা দেরাজসিন্দুক কিন্তু থলেটি নেই কোথাও। সব শেষে সে ঢুকল একটা বেশ বড় কামরায়। এটা সবচেয়ে বেশি সাজানো গোছানো। দামী গালিচা, রেশমী চাদর, ভেলভেটে মোড়া আসন, টেবিলে নানা ধরনের প্রসাধনী ও আতর। এসব দেখে কানা বুঝল এটা আরজু বিবির শোবার ঘর। এখানে একটা সুন্দর কারুকাজ করা কৌটোর মধ্যে সে পেয়ে গেল একসেট চুনী পান্না বসানো সোনার গয়না। দেখামাত্রই সে চিনতে পারল। ওগুলো

সেই অসহায় বিধবাটির জিনিস। খুশিতে নেচে উঠল কানার মন।

তার উচিত ছিল এগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাওয়া। কিন্তু রহিম বাই-এর মোটা চামড়ার থলেটির লোভ ছাড়তে পারল না সে। কোথায় সেটা? খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে উঠল কানা। সময় কতটা কাটছে সেদিকে খেয়াল ছিল না তার।

হঠাৎ 'খুট্' করে একটা আওয়াজ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে কানার মনে হল কেউ যেন দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে সেই কামরার দিকে। কি করবে সে এখন? কোথায় পালাবে? পালাবার জন্য একটা জানালা সে খুলে রেখেছিল কিন্তু ওটা দুই কামরা পরে। আহ্ সিন্দুক।—ওই বড় সিন্দুকটার ভেতরেই ঢুকে বসে থাকবে সে আপাতত কিছুক্ষণ। নিঃশব্দে ডালা খুলে তাই করল সে।

দরজা খুলে কামরায় ঢুকলেন আরজু বিবি এবং তাঁর পেছনে একজন পুরুষ। কিন্তু কে এই পুরুষটি? গলার আওয়াজে, তরবারিমেডেল ইত্যাদির ঠুং ঠুং শব্দে কানা বুঝল পুরুষটি স্বনামধন্য কোতোয়াল কামিল বেক।

কামিল বেক বললেন, 'কি নিষ্ঠুর আর অন্যায় অভিযোগ করছ তুমি। আমি বারে বারে বলছি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি না।'

'আরে থামো, মিথ্যুক কোথাকার। আমাদের এই শেষ দেখার সময় অন্তত একবার সত্য কথা বল।'

'শেষ দেখা? কেন গো আমার দীলের সুলতানা?'

'কেন, তা তুমি জানো'

'অত চেঁচিয়ো না, আরজুমনি। কেউ শুনে ফেলবে।'

'বাড়িতে কেউ নেই এখন।'

'তুমি ঠিক জানো তো?'

আরজু বিবি হেসে বললেন, 'কি ভীতু তুমি। খুঁজে দেখ না বাক্স-পেটরা সিন্দুক কৌটার মধ্যে।'

'আমি ভীতু নই, সাবধানী। তুমি তো জানো, ধরা পড়লে কি সাংঘাতিক শাস্তি···।'

ফুঁসে উঠলেন আরজু বিবি, 'প্রেমের খেলায় নেমে আমি শাস্তির কথা ভাবি না। ফরহাদ আর মজনুও ভাবেনি। তবে হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে কামিল বেকের তুলনা করতে আমি পারি না। যাক, আমি তোমাকে ডেকে এনেছি অন্য কথা বলার জন্য—আমি সত্য কথা জানতে চাই

'সত্য হল এই যে আমাদের দু'জনেরই উচিত সাবধান হওয়া।'

'এ জন্যই কি তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাও? দু'সপ্তাহের মধ্যে একবারও দেখা করনি? আজ লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে নিজে গিয়ে তোমাকে ধরে আনলাম আসল কথা কি? আর কারও সঙ্গে সম্পর্ক পাতাওনি তো?'

'না, আরজু তা নয়। আসি না তোমার স্বামীর ভয়ে।'

'আমার স্বামীর ভয়ে? কেন, সে কি আগে ছিল না?'

'আগে সে সন্দেহ করত না। ঘোড়া চুরির পর থেকে এক জ্যোতিষীর কথায় তার মনে সন্দেহ জেগেছে।'

'কি আবোল তাবোল বকছ! ঘোড়া, জ্যোতিষী, এসবের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?'

এমনিভাবে বাদানুবাদ চলল অনেকক্ষণ ধরে শেষে আরজু বিবি কিছুটা নরম হলেন এবং তাঁর অনুরোধে কামিল বেক তলোয়ার, পোশাক, উষ্ণীশ, জুতা খুলে পালঙ্কের ওপর আরজু বিবির পাশে এসে বসলেন।

এদিকে সিন্দুকের ভেতরে কানার অবস্থা কাহিল। গরমে, ঘামে, বাতাসের অভাবে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। আরজু বিবি আর কামিল বেকের অন্যমনস্কতার সুযোগে সিন্দুকের ডালাখানি একটু ফাঁক করে সে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ বাইরে শোনা গেল দরজার খট্‌খট্ এবং রহিম বাইয়ের গলার আওয়াজ, 'দরজা খুলছে না কেন কেউ! সবাই কি ঘুমিয়ে পড়ল?'

সঙ্গে সঙ্গে কামরার মধ্যে আতঙ্কের ঝড় উঠল। ওলটপালট হয়ে গেল সব কিছু। খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে কামিল বেক ঘরময় ছুটাছুটি করতে লাগলেন ভীত খরগোশের মত। চাপা গলায় বলতে লাগলেন, 'তোমার স্বামী, রহিম বাই, কি বিপদ, আমরা ধরা পড়ে গেছি, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল, আমি শেষ হয়ে গেলাম···

কিন্তু আরজু বিবি দিশেহারা হলেন না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সুস্থির হয়ে তিনি কাজে লেগে গেলেন। জানালায় মুখ বাড়িয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে কৃত্রিম যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বললেন, 'দাঁড়াও একটু! আমার ভীষণ মাথা ধরেছে।' চাপা স্বরে কামিল বেককে বললেন, 'চুপ! শব্দ কোরো না, ও শুনে ফেলবে। পাজামা পর···আরে···আরে, ওটা তো আমার সালওয়ার··· আবার স্বামীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর, চটি জোড়া কোথায় গেল! চটিগুলো খুঁজে পাচ্ছি না কেন?' আবার কামিল বেককে বললেন ফিসফিস করে, 'সিন্দুকের ভেতরে ঢুকে পড়। আধঘন্টার মধ্যে আমি ওকে কোন অজুহাতে সরিয়ে দেব। শিগগির ঢোকো সিন্দুকে।'

আতঙ্কে দিশেহারা কামিল বেক ডালা খুলে বললেন, 'ভেতরে আরও কি যেন আছে মনে হচ্ছে?'

'কি থাকবে? কাপড়-চোপড় আর কি, ঢুকে পড়।'

কামিল বেক ধীরে বসে পড়লেন। ডালাটা বন্ধ হয়ে গেল। আরজু বিবি ছুটে গেলেন নিচে।

দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখ রেখে উবু হয়ে বসলেন কামিল বেক। কিন্তু আরাম করে বসতে পারছে না। নিচে উঁচু নরম কি যেন আছে। সিন্দুকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে বসার চেষ্টা করতেই অন্ধকারে কে যেন চাপা স্বরে বলে উঠল, 'এই, আমার পেটে লাগছে!'

ভয়ে পিলে সুদ্ধ চমকে গেল কামিল বেকের। পাগলের মত হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর মাথা ঠুকে গেল সিন্দুকের ডালায়। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে, কে এখানে, অ্যাঁ?'

অন্ধকারে কার দু'টি শক্ত হাত তাঁর টুঁটি টিপে ধরে বলল, 'চুপ! আর একটি শব্দও নয়। কথা বললে ছুরি ঢুকিয়ে দেব পেটে। আমাকে ভয় করার কারণ নেই। ওরা আসছে!'

দম বন্ধ করে মরার মত পড়ে রইলেন কামিল বেক।

রহিম বাই আর আরজু বিবি প্রবেশ করল ঘরে।

'তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ভালই করেছ,' বললেন আরজু বিবি।

'ওয়াহিদ বাড়িতে নেই। কোন জরুরী কাজে কোথায় নাকি গেছে, বলতে বলতে ধপাস করে রহিম বাই বসে পড়ল সিন্দুকের ডালার ওপর। তার মোটা দেহের ভারে ডালাটা নেমে গেল। কানা চোর আর কোতোয়ালের বাইরে থেকে আর একফোঁটা বাতাসও পাওয়ার উপায় রইল না।

'আমি অসুস্থ। তুমি একটু হেকিম সাইদুল্লার কাছে যাও,' যন্ত্রণাকাতর স্বরে বললেন আরজু বিবি।

'চাকরগুলো কোথায় গেল?'

'সবগুলোকে আমি ছুটি দিয়েছি। ওদের বকবকানির চোটে আমার ব্যথা আরও বেড়ে যাচ্ছিল। আমি একটু ঘুমিয়ে নেব ভেবেছিলাম।'

'আর আমি এসে তোমার ঘুমটা ভেঙে দিলাম। ঠিক আছে, আমি হেকিমের কাছে যাচ্ছি।'

সে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এমন সময় সিন্দুকের ভেতরে বসে থাকতে অনভ্যস্ত বেচারা কোতোয়াল নড়ে উঠলেন।

কানা সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল কোতোয়ালকে, কিন্তু তার আগেই শব্দটা শুনে ফেলল রহিম বাই।

'ওটা কিসের আওয়াজ?'

'ইঁদুর-টিদুর হবে আর কি,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিলেন আরজু বিবি।'

সত্যি, আরজু বিবির আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রসংশার যোগ্য। তাঁকে রাজা-বাদশার ঘরে কুট-চালবাজী আর গোপন ষড়যন্ত্রের পরিবেশেই মানাত ভাল। রহিম ভাইয়ের ঘরে তিনি বেমানান।

'আরে খবর শুনেছ আরজু? জবর খবর আছে একটা। নিয়ামতুল্লাকে তো মনে

আছে তোমার–ওই চামড়ার কারবারী নিয়ামতুল্লা? বড় মসজিদের উল্টো দিকে বসে? তার বিবির শোবার ঘরে সে একজন লোককে ধরে ফেলেছে। জানো, লোকটা কে? আমাদের রাজ্যের সেচ বিভাগের বড় কর্তা।'

'কি বললে? একজন পরপুরুষ?' ঘৃণায় বিস্ময়ে দুই চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করলেন আরজু বিবি।

'হ্যাঁ, পরপুরুষ। ভয় হচ্ছে, মামলাটা খানের কাছেই যাবে। লোকটার কপালে বড় দুর্ভোগ আছে।'

'ঠিক হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষা হোক লুচ্চা বেটার।'

'বেচারি মেয়েলোকটির কপালে রয়েছে আরও বড় দুর্ভোগ–বেত্রাঘাত। গুনে গুনে পাঁচ শ' ঘা বেত। একটিও কম নয়।'

'ওটাও যথেষ্ট নয়। অমন মেয়ে মানুষকে আগুনে পুড়ে মারা কিংবা ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ফেলে দেয়া উচিত!' মন্তব্য করলেন আরজু বিবি।'

'তুমি বড় কঠোর, আরজু বিবি। এক শ' বেতই ওর জন্য যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। নিয়ামতুল্লা বেশি হৈ-চৈ করে ফেলে এখন দুঃখিত। এখন বৌকে বাঁচানর চেষ্টা করছে সে।'

'অসতীর জন্য অমন দয়া দেখানওয়ালার মুখে ঝাঁটা মারি।'

'তুমি যদি আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হও,' ঠাট্টার সুরে বলল রহিম বাই, 'আমি তোমাকে শাহী জল্লাদদের হাতে তুলে দেব না। বেচারা নিয়ামতুল্লা! আবার সেই খুট খুট আওয়াজটা না? মনে হচ্ছে সিন্দুকের ভেতর থেকে আওয়াজটা আসছে।'

'সিন্দুকের ভেতর থেকে নয়, মেঝের নিচে থেকে। ইঁদুরগুলো ছুটোছুটি করছে।'

'একটা বেড়াল দরকার আমাদের। দেখি, হেকিমের বাড়িতে আছে কিনা। থাকলে এখনি একটা নিয়ে…,' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল রহিম বাই। মনে হল কেউ যেন তার জিহ্বাটা হঠাৎ টেনে ধরেছে।

তারপর সব চুপচাপ। সিন্দুকের ভেতর বসে কানা চোর ভাবল কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু সেটা কি তা বুঝে উঠতে পারল না সে।

কয়েক মিনিট পরে আবার শোনা গেল রহিম বাই-এর গলা। ক্রুদ্ধ চাপা স্বরে রহিম বাই বলছে, 'এসব কি? এই কিংখাবের পোশাক, এই সোনালি তলোয়ার, এগুলো কোত্থেকে এল?'

'এগুলো…এগুলো…,' এতক্ষণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারালেন আরজু বিবি। 'এগুলো উপহার, তোমার জন্য আমি কিনে এনেছি।'

'আমার জন্য উপহার? এই তলোয়ার, সোনার মেডেল, কিংখাবের পোশাক, সোনার তাজ? সত্যি করে বল এগুলো কার।'

'ওগুলো তোমার। চেঁচামেচি কোরো না, প্রতিবেশীরা শুনবে।'

'শুনুক। জানুক ওরা আমার ঘরে কি চলছে। নিয়ামতুল্লার ঘরে যে শয়তানী কারবার ঘটেছে সেই একই কারবার চলছে আমার ঘরেও। বেঈমান, ইবলিসের ডিম, বল্ কে এসেছিল আমার ঘরে।'

আরজু বিবি চুপ, একেবারে লাজবাব

সিন্দুকের ভেতরে আতঙ্কে মূর্ছিত কামিল বেক মরার মত ঢলে পড়লেন কানার দেহের ওপর।

কানা চোরও ঘাবড়ে গেল ভীষণ। এই বুঝি রহিম বাই লোকজন ডেকে ঘরদুয়ার তছনছ করে খুঁজবে সেটা হলেই সর্বনাশ। জেল, জরিমানা, ফাঁসি! হোজা নাসিরুদ্দীনকে স্মরণ করে কানা মনে মনে বলতে লাগল, 'রক্ষা করুন, বাঁচান আমাকে এ বিপদ থেকে! একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে আমাকে উদ্ধার করুন হোজা নাসিরুদ্দীন!'

ঠিকই অলৌকিক ঘটনা একটা ঘটল। হঠাৎ তীক্ষ্ণ সূচীমুখ বিদ্যুৎরেখার মত একটা বুদ্ধি তার মাথায় ঝলকে উঠল। বুদ্ধিটা যেন তার মাথায় গজায়নি, বাইরে থেকে এসেছে! এর পর সে যা করল সবই সেই বুদ্ধির নির্দেশে। হুস্ করে সিন্দুকের ডালা তুলে বেরিয়ে এল সে বিস্ময়ে হতবাক রহিম বাই আর আরজু বিবির সামনে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন আরজু বিবি দুই চোখ কপালে তুলে। তিনি সিন্দুকে লুকিয়েছেন সুন্দর সুপুরুষ কামিল বেককে, তার জায়গায় এখন বেরিয়ে এল বোঁচা নাক চ্যাপ্টা মুখ এক বিশ্রী বিদঘুটে চেহারার কানা! তাজ্জব কাণ্ড বৈ-কি।

সেই অজানা বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে কানা বলে উঠল, 'আরজু বিবি, সবকিছু ফাঁস হয়ে গেছে। তোমার মাননীয় স্বামীকে আর প্রতারণা করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের উচিত অনুতপ্ত হওয়া এবং বিনীতভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া।'

দাঁতে দাঁত ঘষে লাফিয়ে উঠল রহিম বাই। সারা দেহ তার থরথর করে কাঁপতে লাগল দারুণ ক্রোধে।

আরজু বিবি পিছিয়ে দেয়ালের কাছে সরে গেলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'এটা কে···কে এটা?'

'কে ওটা, তুই জানিসনে?' হুঙ্কার দিয়ে প্রশ্ন করল রহিম বাই।

'কসম করে বলছি, কোনদিন এই লোকটাকে আমি দেখিনি।'

কানা বলে উঠল, 'আমি দেখলাম, কি দয়ালু, কি ভালমানুষ তোমার স্বামী। লজ্জায় অনুতাপে আমার মন ভরে গেছে।'

'বিশ্বাস কোরো না ওর কথা, ও মিথ্যে বলছে, এ মুহূর্তের আগে কখনও ওকে আমি দেখিনি।'

'মিথ্যে বলো না আরজু বিবি। তুমি নিজেই আমাকে ডেকে আনলে, বললে যে তোমার স্বামী ওয়াহিদের বাসায় গেছে পাশা খেলে তিন শ' সত্তর টাকা উদ্ধার করতে। আমাদের এখন সব কিছু স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি আর এই

বাড়িতে কোনদিন আসব না। এই মিথ্যাবাদী মহিলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না। আমি যাই।'

এই বলে কানা কামিল বেকের তলোয়ার, কিংখাবের পোশাক আর উষ্ণীষটা তুলে নিয়ে চট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে যে অজানা শক্তি এতক্ষণ তাকে পরিচালিত করেছে তা চলে গেল তাকে ছেড়ে। আবার ভয় তাকে গ্রাস করল। প্রাণপণে সে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে নগরের বাইরে পতিত জমি পার হয়ে সে পৌঁছে গেল এক গোরস্থানে। সেখানে এক ঝোপের মধ্যে ঢুকে হাঁপাতে লাগল কানা।

ওদিকে ঘরের মধ্যে তখন রাগে, দুঃখে, অপমানে আহত পশুর মত গজরাচ্ছে রহিম বাই, 'আমি তোকে বিশ্বাস করতাম···মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম···আর তুই আমার সেই বিশ্বাস ভাঙলি···তোকে আমি আস্তাকুঁড় থেকে তুলে এনেছিলাম, আর তুই এমনি করে তার প্রতিদান দিলি···তুই একটা বিদঘুটে বদখত কানা বদমাশকে দিয়ে আমার ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করলি···'

এসব বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রহিম বাই। দুচোখে তার খ্যাপার দৃষ্টি। হাতের কাছে যা পেল তাই আছড়ে ভেঙে ফেলতে লাগল সে, বিছানা-বালিশ-গালিচা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল, তারপর এগিয়ে গেল সিন্দুকের দিকে।

সিন্দুকের ডালার ফাঁকে চোখ রেখে কামিল দেখছিলেন সবকিছু। এবার বিপদের বজ্র মাথায় পড়ছে দেখে আর্তনাদ করে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি সিন্দুক থেকে, পড়লেন রহিম বাই-এর ওপর। ভুঁড়িতে কামিল বেকের মাথার ঢুঁ লাগায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল রহিম বাই। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য কামিল বেক দরজার দিকে না গিয়ে ঝাঁপ দিলেন বন্ধ জানালার ওপর। জানালার চীনা কাঁচের পাল্লা ভেঙে পড়ে গেলেন নিচে বাগানের মধ্যে। মুহূর্তে উঠে গেট খোলা থাকা সত্ত্বেও ছুটে গেলেন বাগানের পাঁচিলের দিকে। ওটা ডিঙাতে গিয়ে পা পিছলে ধপাস করে পড়ে গেলেন। হাউমাউ করে কেঁদে আবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে পাঁচিলটা কোনরকমে ডিঙিয়ে ধুলোকাদা মাখা দেহে ছুটতে লাগলেন পাগলের মত।

তাঁর ভোগান্তির ওখানেই শেষ হল না। ছুটতে ছুটতে তিনি পৌঁছলেন এক কবরস্থানে। আশ্রয় নিলেন একটা কবরের আড়ালে ঝোপের মধ্যে। একটুখানি দম নিয়ে চারদিকে তাকাতেই চোখ দুটো তাঁর স্থির হয়ে গেল। হাত খানেক দূরেই বসে আছে বোঁচা নাক চ্যাপ্টা মুখ একটি মানুষ। লোকটি তার হলদে চোখটি নাচিয়ে প্রশ্ন করল, 'ও বাড়ির খবর কি জনাব? আমি আপনার তলোয়ার, মেডেল আর কিংখাবের পোশাকটি নিয়ে এসেছি। পোশাকটি আমি রাখব, তলোয়ার আর মেডেল নিয়ে যান।'

তলোয়ার, মেডেল? এটা কি তলোয়ার মেডেলের কথা ভাবার সময়? একটা বুনো জানোয়ারের মত গোঙাতে গোঙাতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কোতোয়াল, তারপর হরিণের চাইতেও দ্রুত পায়ে ঝোপঝাড়, কবরের পর কবর মাড়িয়ে কাঁটাগাছ ডিঙিয়ে ছুটে পালালেন তিনি সেখান থেকে।

এদিকে রহিম বাই-এর ঘরে তখন চলছে নাটকের আরেক দৃশ্য। সিন্দুক থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে কোতোয়াল পালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আরজু বিবির মুখের তালা খুলে গেল। স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে তিনি আক্রমণ শুরু করলেন, 'বুড়ো হাঁদা কোথাকার! আমার ওপর হম্বিতম্বি করছ আহাম্মকের মত! নিজের থলেটা আছে কিনা সেই খেয়াল নেই। ওটা কোথায় রেখেছ? তুমি কি এখনও বুঝতে পারোনি যে এরা চোর? আমার ঘুমিয়ে থাকার সুযোগে ঘরে ঢুকে পড়েছিল? কোথায় তোমার থলেটা?'

থলের কথা উল্লেখ করা মাত্রই ঠাণ্ডা হয়ে গেল রহিম বাই-এর মাথা। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল পাশের কামরায় টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখার জায়গায়। আরজু বিবিও ছুটে গেলেন তাঁর অলঙ্কারের খোঁজে।

থলেটি ঠিকই আছে তার জায়গায় কিন্তু অলঙ্কারগুলো উধাও।

আরজু বিবির কথাই সত্য প্রমাণিত হল। চোরই ঢুকেছিল ঘরে। দেখা গেল, আরজু বিবির চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ অমূলক।

অলঙ্কার উধাও হওয়ায় মুখ রক্ষা হয়েছে আরজু বিবির। মনে মনে এই ক্ষতিতে খুশি হলেন তিনি। রহিম বাইকে তিনি বাধ্য করবেন এই ক্ষতি শতগুণে পূরণ করে দিতে।

কিন্তু এ-তো হল মনের কথা। প্রকাশ্যে তিনি জুড়ে দিলেন কান্না। বিলাপ শুরু করলেন রহিম বাইয়ের সকল কটূক্তি, অপমানজনক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে।

অনুশোচনায় মন ভরে গেল রহিম বাই-এর। সে বার বার মাফ চাইল আরজু বিবির কাছে, স্বীকার করল যে আরজু বিবিকে সন্দেহ করা তার ভুল হয়েছে। প্রতিজ্ঞা করল আর কখনও এমন সন্দেহ সে করবে না। তারপর নিজের হাতে রহিম বাই ঘরের বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখল, বিছানাপত্র ঠিক করল, আবর্জনা পরিষ্কার করল এবং অনেক অনুনয়, অনেক স্তুতির পরে আরজু বিবিকে শান্ত করল।

তেরো

গুপ্তধন উঠে এল কোদালের আগায়

রহস্যের কি প্রবল আকর্ষণী শক্তি সেটা হোজা নাসিরুদ্দীন ভাল করেই জানতেন। রহস্যের আকর্ষণে আগা বেক এখন তাঁর মাটির কুঁড়েঘরে নিত্যকার অতিথি।

আগা বেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা প্রসঙ্গে তুলে একটি কথাই কেবল জানতে চায়—গাধার রহস্য। হোজা ধরা দেন না। তিনি শুধু বলেন, 'আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরুন। এখনও আমার সময় হয়নি বলার।'

আগা বেক অগত্যা অন্য দিক থেকে এগোয়। 'আচ্ছা উজাক বাই, হিরাতে চাকরি পাওয়ার আগে তুমি অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েছ, তাই না? তুমি কি খুঁজেছ দেশে দেশে?'

'জ্ঞান, হুজুর, জ্ঞান। দুনিয়ার রহস্যের চাবিকাঠি।'

'তুমি তো মক্কায় গিয়েছ, হজ করোনি? তোমার মাথায় তো হাজীদের সবুজ পাগড়ি নেই!'

'একটা প্রাচীন কেতাব খুঁজতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে হজ করার সময় পাইনি।'

'কি কেতাব?'

'ও কথা জানতে চাইবেন না। এই জাদু-টোনার কেতাব আর কি।'

'ওহ্‌হো, তুমি তাহলে একজন জাদুকর?'

'নাহ, জাদুকর আর হলাম কই। আমি শুধু চেষ্টা করি খারাপ জাদু-টোনার প্রভাব নষ্ট করে দিতে।'

'কোন জাদু-টোনার, বলো না একটু?'

'বলব, বলব, আর ক'টা দিন যাক। এখন একটু ধৈর্য ধরুন।'

এমনি ধরনের প্রশ্ন আর উত্তর চলতে থাকে প্রত্যেক দিন। নিজের উদ্দেশ্যের পক্ষে সহায়ক না হলে এগুলো নিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন সময় নষ্ট করতেন না।

আগা বেকের প্রশ্ন দিয়েই তিনি লোকটার মন-মতলব যাচাই করছিলেন। আগা বেকের প্রত্যেকটি কথা, প্রকাশভঙ্গি, আচরণ ইত্যাদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ ও বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝলেন যে লোকটা উদ্ধত, অহংকারী ও তোষামোদ প্রিয়। তদুপরি সে বোকা, ভোঁতা ও বিক্ষুব্ধ। তার স্বপ্ন ছিল হারান লাভজনক নগর অধিপতির পদ ফিরে পাওয়া। হোজা নাসিরুদ্দীন লোকটার এই দুর্বলতাকে কাজে লাগালেন।

'কর্তা, আল্লাহ আপনার মাথায় কি চমৎকার বিচারবুদ্ধিই না দিয়েছেন! এরকম একজন জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ খোরেজম-এ উপেক্ষিত হয়েছে, এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিভাবে ওরা আপনাকে চাকরি ছাড়তে দিল?'

আগা বেকের হৃদয়ের ক্ষতস্থানে এ কথাগুলো মলমের মত কাজ করল—বিশেষ করে এই কারণে যে অতিরিক্ত ঘুষ-খোরীর দায়েই সে চাকুরিচ্যুত হয়েছিল।

'অবশ্য আমি বুঝি যে নগর অধিকর্তার পদটা ছিল আপনার জন্য অতি সামান্য। আরও উঁচু কোন পদ—যেমন ধরুন, রাজ্যের প্রধান খাজাঞ্চীর পদ, তারা আপনাকে দিতে পারত না? যে-কোন বুদ্ধিমান বাদশাহ এরকম রত্নকে দুই হাতে লুফে নিতেন। তাহলে রাজকীয় কোষাগার পূর্ণ থাকত, সময় মত সকল কর আদায় হত।'

আগা বেক বলে উঠল, 'শুধু তাই নয়, অনেক নতুন করও আমি চালু করতাম। যেমন ধরো, অশ্রু-কর।'

'আহা, কি মহৎ চিন্তা! অশ্রুর ওপর কর বসলে আরও অশ্রু ঝরত এবং আরও অশ্রু মানে আরও বেশি কর। আহা, কি প্রজ্ঞা! শুধু এই চিন্তাটার জন্যই আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রধান উজীর বানিয়ে দেওয়া উচিত হত।'

চাঙ্গা হয়ে উঠে আগা বেক বলল, 'আমি আরও একটা কর বসাতাঁম—হাসির কর।'

'হাসির ওপর কর! আহা, খোরেজমের খান কি উজীরই না হারিয়েছেন!'

এমনি করে কাটল একটা সপ্তাহ। গ্রীষ্মের খরতাপে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মাঠ-ঘাট শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। পর্বত-চূড়ার জমাট বরফ গলে কলকল করে পানি নামছে ঝরনা বেয়ে আগা বেকের হ্রদে। কানায় কানায় ভরে উঠেছে হ্রদ। কিন্তু চোরাকের বাসিন্দারা তাদের জমিতে এক ফোঁটা পানিও দিতে পারছে না। সেচের সময় হয়ে গেছে।

আগা বেক একদিন গর্ব করে হোজা নাসিরুদ্দীনকে জানাল সেই মেয়েটির কথা—যাকে সে শিগগিরই ঘরে নিতে যাচ্ছে।

'মেয়েটি অবশ্য একটি সরল গেঁয়ো বালিকা। কিন্তু উজাক বাই, এক নজর দেখলেই তুমি ওকে মনে মনে একটি গোলাপ-কলির সঙ্গে তুলনা করবে। দু'এক দিনের মধ্যেই কলিটি আমি ফোটাব।'

'কিন্তু ও কি বাগ্‌দত্তা নয়?'

বাগদত্তা? ওই মেয়েটি? আগা বেকের মাথায় ওসব চিন্তা ঢুকতেই পারে না। তার কাছে গাঁয়ের এই লোকগুলো তুচ্ছ কীট-পতঙ্গের মত। নিয়তিই কি ওদেরকে, ওদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুকে তার অধীনে ন্যস্ত করেনি? কাজেই তার ইচ্ছার কাছে ওদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য কি?

হোজা নাসিরুদ্দীন বুঝতে পারলেন আগা বেকের মনোভাব এবং তার নীরবতার অর্থ। তাই আর কোন প্রশ্ন তিনি করলেন না।

সেদিন রাতে দূর পাহাড়ে শুরু হয় ঝড়ের তাণ্ডব। ঝড়ের শোঁ-শোঁ আর মেঘের গর্জন শুনতে শুনতে তিনি ভাবতে লাগলেন কানা চোরের কথা, 'আমার কানা সাথী এখন কোথায় কে জানে! সে কি ফিরছে? ঝড়ের কবলে পড়েছে নির্জন পাহাড়ী পথে? আল্লাহ ওকে রক্ষা করুন!'

কানার কথা সব সময় তাঁর মন জুড়ে আছে। তাঁদের দু'জনের মধ্যে যেন একটা আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। হোজা নাসিরুদ্দীন শুনেছেন যে অতি ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে এক রকম আত্মিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। গত রাতে হঠাৎ এক সময় তাঁর মনে হয় কানা কোকন্দে কোন বিপদে পড়েছে। এতে তাঁর হৃদয়ে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁর ইচ্ছা হয় কানাকে সাহায্য করার জন্য তখনি কোকন্দে ছুটে যেতে। এই সময় তাঁর চিন্তা ও নৈতিক শক্তির একটা অংশ যেন কোকন্দে ছুটে গিয়েছিল। রহিম বাই-এর ঘরে সিন্দুকে বসে এই শক্তিই কানা অনুভব করেছিল এবং এরই সাহায্যে সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। তারপরই হোজা নাসিরুদ্দীনের হৃদয় হাল্কা হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে কানা বিপদ মুক্ত হয়েছে। হোজা মনে মনে এই ভেবে খুশি হয়ে ওঠেন যে কানা ফিরে এসে অনেক মজার কাহিনী বলবে তাঁকে।

অনেক রাতে ঝড় থেমে যাবার পর হোজা নাসিরুদ্দীন বাইরে যাওয়ার জন্য দরজা খুলতেই দেখলেন সাইদ দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। অনুনয়ের সুরে সাইদ বলল, 'প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি বলে আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু দারুণ দুশ্চিন্তা আমাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে। সেচের আর মাত্র তিনদিন বাকী।'

'আমার মনে আছে সাইদ, আমার মনে আছে।'

'জুলফিয়া কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো লাল করে ফেলেছে। খুব হতাশ হয়ে পড়েছে সে।'

'হতাশ হয়েছে? হতাশ হওয়া তো খারাপ।'

'আমাদের কি সময় থাকতে পালিয়ে যাওয়া উচিত নয়?'

'পালাতে হলে আমরা তিনজনই একত্রে পালাব। না, চারজন—কারণ আমার গাধাকে ফেলে আমি কি করে পালাব? আরে, চারজন নয়—আরও একজন আছে, যে-কোন মুহূর্তে তার এখানে এসে হাজির হবার কথা। আমরা একেবারে মিছিল

করে পালাব।'

সাইদের কাঁধে হাত রেখে তিনি আবার বললেন, 'তোমার জুলফিয়াকে গিয়ে বল যে সব কিছু ঠিক আছে—চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'সে বিশ্বাস করবে না।'

'আমার নাম করে বলো।'

'আপনাকে সে চেনে না।'

'কিন্তু তুমি সাইদ, তুমি আমাকে এখনও বিশ্বাস করো তো?'

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন সাইদের চোখে। সাইদ চোখ নত করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি।'

'তুমি করলে সে-ও করবে। তোমার বিশ্বাস তার মধ্যে সঞ্চারিত হবে।'

সাইদ সালাম করে বিদায় নিল।

আরেকটা দিন কাটল, তবু কানা এল না। হোজা নাসিরুদ্দীন মনে মনে বললেন, 'কালও যদি সে ফিরে না আসে তবে সত্যি আমাদেরকে পালাতে হবে। কিন্তু আমার মন বলছে সে কাছাকাছি এসে পড়েছে। পথের দিকে আরেকবার তাকিয়ে ঘরে এসে বসলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। এমন সময় যেন হাওয়া থেকে বেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল কানা। চ্যাপ্টা মুখে তার অনাবিল হাসি। সেই হাসির অর্থ, অভিযান সফল হয়েছে!

হোজা নাসিরুদ্দীন সবিস্তারে শুনলেন কানার কোকন্দ অভিযানের রসঘন কাহিনী। তারপর হাসিমুখে বললেন যে বিধবার অলঙ্কারগুলো রহিম বাই-এর কবল থেকে উদ্ধার হয়েছে এটা খুবই আনন্দের কথা। ওগুলো তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে তার আগে ওগুলোকে আরেকটা ভাল কাজে অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

কানাকে সঙ্গে নিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন পতিত জমি আর গাঁয়ের পেছন দিককার সরু পথ ঘুরে বুড়ো চাষী মোহাম্মদ আলীর ঘরের পেছনে এক ঘন ঝোপের আড়ালে গিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

মোহাম্মদ আলী বাগানের আপেল গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে মাটি আলগা করে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে জুলফিয়া বেরুল ঘর থেকে। চোখে তার অশ্রু টলমল, মুখ থমথমে। বিষণ্ন দৃষ্টিতে সে তাকাল চারদিকে, যেন বিদায় নিল সবার কাছ থেকে।

কানা বলল, 'ওই যে দেখুন, আরেকজন এল।'

হোজা নাসিরুদ্দীন দেখলেন সদর দরজা ঠেলে সাইদ এসে ঢুকল বাড়ির মধ্যে এবং গাছ-পালার আড়ালে জুলফিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। জুলফিয়া ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খবর কি?'

'সবকিছু আজই স্থির হয়ে যাবে। হয়, চার হাজার টাকার জোগাড় হবে, নতুবা আমরা পালিয়ে যাব। তুমি তৈরি হয়েছ তো?'

জুলফিয়া জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল যে সে তৈরি।

মোহাম্মদ আলী পেছনে তাকাতেই দেখতে পেল ওদের দু'জনকে। এগিয়ে গেল সে ওদের দিকে। সাইদকে কাছে ডেকে সে বলল, 'বাবা সাইদ, আমার কথা শোনো, চলে যাও এখান থেকে। আমাকে, জুলফিয়াকে আর নিজেকে কষ্ট দিয়ো না…'

ওর পুরো বক্তব্য শোনার সময় হোজা নাসিরুদ্দীনের ছিল না। তিনি কানাকে বললেন, 'শিগগির যাও, অলঙ্কারগুলো আপেল গাছের গোড়ায় মাটি চাপা দিয়ে সাপের মত, ছায়ার মত, সরে এসো।'

মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে লম্বা ঘাস আর লাতাগুল্মের মধ্যে ঢেউ তুলে অদৃশ্য হল কানা চোর এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাজ সেরে ফিরে এল নিঃশব্দে।

সাইদ জুলফিয়ার দিকে হাত নেড়ে বিদায় নিল। জুলফিয়া কাঁদতে লাগল। ধীর পায়ে বুড়ো মোহাম্মদ আলী ফিরে গেল আপেল গাছের তলায়। কোদাল তুলে নিয়ে আবার মাটি কোপাতে লাগল। কয়েক কোপ দিতেই কি যেন ঠেকল কোদালে। মাথাটা নোয়াতেই সে দেখল একটা চামড়ার থলে। থলের মুখের বাঁধন খুলে উপুড় করার সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারগুলো পড়ল মাটিতে, ঝিকমিক করে উঠল সোনা, পান্না, চুন্নী।

'জুলফিয়া, জুলফিয়া!' চেঁচিয়ে ডাকল বুড়ো।

'কি হয়েছে আব্বু? শরীর খারাপ লাগছে?' ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল জুলফিয়া।

'এগুলো কি? আমি গাছতলায় এগুলো পেলাম। নিশ্চয় আল্লাহর ফেরেশতা রেখে গেছেন।'

জুলফিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডাকতে লাগল সাইদকে। দূর থেকে শুনতে পেয়ে ছুটে এল সে। তারপর সেখানে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। নিঃশব্দে হোজা নাসিরুদ্দীন সরে গেলেন কানাকে নিয়ে

কুঁড়েঘরে ফিরে গিয়ে হোজা কানার হাতে পাঁচটা তন্দুরী রুটি, একখানা পুরানো কম্বল এবং একটা রান্নার হাঁড়ি দিয়ে বললেন, 'তুমি কাছাকাছি কোথাও একটা আস্তানা খুঁজে নাও। এখানে কেউ যেন তোমার উপস্থিতি টের না পায়। আমার ডাক পেলেই ছুটে আসার জন্য তৈরি থাকবে। উঠানে পড়ে থাকা ওই লম্বা খুঁটিটা দেখছ? একটা সাদা রুমাল বেঁধে ওটাকে খাড়া করে রাখলেই বুঝবে আমি তোমাকে ডাকছি এবং মুহূর্তের মধ্যে তোমাকে আসতে হবে।'

'আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।' এই বলে কানা চলে গেল। কাছেই একটা বড় ঝোপের পেছনে একটা ছোট্ট ও চমৎকার গুহা খুঁজে পেয়ে সেখানেই আশ্রয় নিল সে।

ধীরে ধীরে রাত নেমে এল। শ্রান্তদেহে কানা চোর ঘুমিয়ে পড়ল তার গুহার

নিরাপদ আশ্রয়ে। হোজা নাসিরুদ্দীন ঘুমিয়ে পড়লেন সাইদ-জুলফিয়ার হাসিমুখ কল্পনা করতে করতে। আগা বেক জুলফিয়ার সঙ্গে তার সাদির সুখস্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে ঠোঁট চাটতে থাকল।

ওদিকে গভীর রাতে বাগানের মধ্যে সাইদ জুলফিয়াকে বলল, 'এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো?'

'কিন্তু সাইদ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের এই অজানা বন্ধু ও রক্ষাকারীটি কে?'

'আমি জানি না। তিনি নিজের নাম বলেন না।'

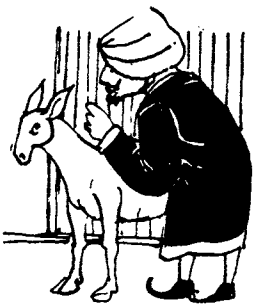

চোদ্দ

গাধা হয়ে গেল শাহজাদা

পরদিন সকালে সেচের নালার কাছে এসে আগা বেক বলল, 'সেচের পানি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। সত্য বটে এবার আমি টাকা পাব না, অন্য কিছু পাব। তবে সামনে তো আরও সেচ আছে, তখন লোকসানটা পুষিয়ে নিতে পারব। আজকের কাজটা তোমাকে একা সামলাতে হবে। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকব। ওরা মেয়েটাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আরে, ওরা যে এসেই পড়েছে।'

হোজা দেখলেন একদল লোক গ্রাম থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগুচ্ছে। তিনি বললেন, 'ওদের সঙ্গে কোন কনে তো দেখছি না।'

'তার মানে?' রাস্তার দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্তভাবে হোজা নাসিরুদ্দীনকে বললেন আগা বেক, 'তুমি ভাল করে দেখো তো উজাক বাই!'

'সব বুড়ো লোক,' বললেন হোজা।

'হুঁ বুঝেছি! আবার কাকুতি-মিনতি কান্নাকাটি করতে আসছে। কিন্তু তাতে আমার মন গলবে না। তুমি দেখো, আমি কিভাবে ব্যাটাদের শায়েস্তা করি।'

গ্রাম-বুড়োরা এগিয়ে এল। সবার আগে মোহাম্মদ আলী। শিরদাঁড়া সোজা।

সালাম করে সে বলল, 'সেচের সময় হয়ে গেছে, আমরা পানি চাই।'

'পানি চাও? কিন্তু কিসের বিনিময়ে? আমার শর্ত তো তুমি জানো বুড়ো মিঞা—তোমার মেয়ে।'

'আমার মেয়ে ব্যবসার পণ্য নয়।'

বিস্মিত হয়ে আগা বেক বলল, 'তাহলে কি দিয়ে পানির মূল্য শোধ করবে?'

কোমরবন্ধ থেকে একটা চামড়ার থলে বের করে মোহাম্মদ আলী বলল, 'এটা দিয়ে।'

আগা বেক থলেটা নিয়ে মুখ খুলল, সোনা আর চুনী-পান্না দেখার সাথে সাথে তার চোখ-মুখের ভাব বদলে গেল।

'কোথায় পেয়েছ এসব?'

'পেয়েছি, আপেল গাছের নিচে, মাটির তলায়।'

'অদ্ভুত···সন্দেহজনক···আচ্ছা ঠিক আছে, আমি রাজি। উজাক বাই, পানি ছাড়।'

সারা দিন সারা রাত পানি দেয়া হল। আশপাশের সকল খেত-খামার বাগানে পানি গেল। তৃষ্ণা মিটিয়ে গাছপালা লতাগুল্ম তৃপ্তিতে যেন হেসে উঠল। সেই হাসির জবাবে হোজা নাসিরুদ্দীনও হাসলেন।

সফরের চা-খানা সারাদিন খালি। সবাই মাঠে ব্যস্ত। সন্ধ্যায়ও তেমন ভিড় জমল না। দিনের পরিশ্রম শেষে গ্রামবাসী ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে চা-খানার দিকে আর পা বাড়াল না। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। মোহাম্মদ আলী চা-খানায় গিয়ে দেখল মাত্র চারজন বুড়ো বসে বসে গল্প করছে। মোহাম্মদ আলী ওদের কাছে না গিয়ে বসে পড়ল এক কোণে। অলঙ্কারগুলো কোথায় কেমন করে পেয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে মুখ ব্যথা করছে তার। আর বকতে পারবে না। এক কথা কতবার বলা যায়?

'ওই মণিরত্নের অলঙ্কার তো আর আপেল গাছের তলায় জন্মায়নি, কি বল?' মন্তব্য করল সফর আলী—সাইদের পালক-বাপ।

'ওগুলো নিশ্চয়ই অনেক কাল ধরে লুকান ছিল মাটির নিচে,' বলল এক বুড়ো।

মোহাম্মদ আলী জবাব না দিয়ে পারল না। অনেক কাল না কচু! প্রতি বছরই তো সে আপেল গাছের নিচের মাটি খুঁড়ছে। কই, আগে তো পায়নি! থাকলে কি পেত না?

'তোমার নজরে পড়েনি।'

রাগ হল মোহাম্মদ আলীর। সে কি অন্ধ বা কানা নাকি যে অমন একটা ব্যাগ তার নজর এড়িয়ে যাবে বছরের পর বছর?

'তোমরা অত মাথা ঘামাচ্ছ কেন ওগুলো নিয়ে? ধরে নাও এটা একটা অলৌকিক ঘটনা। ধরে নাও ওগুলো আল্লাহ রেখে গেছেন,' বলল মোহাম্মদ আলী।

আঁৎকে উঠল সফর আলী। 'আল্লাহ রেখে গেছেন? তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? বলতে চাও গতকাল তোমার বাগানে আল্লাহ এসেছিলেন?'

'নিজে আসবেন কেন? হয়ত তাঁর কোন অলিকে, ধর—বাবা তোরা খানকে পাঠিয়েছিলেন।'

ঠিক তাই! বাবা তোরা খান। ক'দিন আগেই তাঁর উৎসব গেল। গোটা অঞ্চলের লোক জানে তাঁর বার্ষিক উৎসবের রাতে শিশুদের জন্য তিনি উপহার রেখে যান।

'হ্যাঁ,বাবা তোরা খানই হবেন। তিনিই হয়ত রেখে গেছেন ওগুলো,' বলল বুড়োদের একজন।

আরেকজন সন্দেহ প্রকাশ করল, 'কিন্তু মোহাম্মদ আলীর ঘরে শিশু কোথায়?'

'তাতে কি হয়েছে?' গলা চড়িয়ে বলল মোহাম্মদ আলী। 'আমার জুলফিয়া যখন ছোট্ট ছিল তখন যদি ওকে তিনি ভালবাসতে পারেন এখন পারবেন না কেন?'

শেষ পর্যন্ত বুড়োরা মেনে নিল যে মোহাম্মদ আলীর কথাই ঠিক। অলঙ্কারগুলো বাবা তোরা খানই রেখে গিয়েছেন।

রাত গভীর হল। বুড়োরা চলে গেল। মোহাম্মদ আলীও উঠল। চলল গাছপালার ছায়াঢাকা হ্রদের তীর ধরে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। আগা বেক আর তার চৌকিদার কথা বলছে।

আগা বেকঃ উজাক বাই, আগামী কাল তাহলে তুমি মহা রহস্যের গোপন কথাটা আমাকে জানাবে?

চৌকিদারঃ হ্যাঁ, কর্তা, আগামী কাল মাঝরাতে।

আগা বেকঃ মনে থাকে যেন কথাটা।

চৌকিদারঃ থাকবে হুজুর।

মোহাম্মদ আলী দেখল ওরা এগিয়ে আসছে সোজা তার দিকে। সামনে পড়ে গেল সে।

ছায়ায় দাঁড়ান মোহাম্মদ আলীর ওপর নজর পড়তেই আগা বেক জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে?'

'আমি, মোহাম্মদ আলী।'

'আহ্, মোহাম্মদ আলী। বেশ বেশ। মেয়েকে হেফাজতে রেখ। এই সেচের পরে আরেক সেচ আছে।'

মাথায় আগুন ধরে গেল বুড়োর। তবু অতি কষ্টে রাগ দমন করল। জবাব দিল না।

চলে গেল ওরা দু'জন। মোহাম্মদ আলী বসে পড়ল এক-খণ্ড পাথরের ওপর। মাথায় হাত চেপে ভাবতে লাগল আগা বেক আবার সেচের বদলে তার মেয়েকে দাবি করে বসলে সে কি করবে।

'এ সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ আছে এবং পথটা খুবই সোজা।' চমকে উঠল মোহাম্মদ আলী কথাগুলো শুনে। চোখ তুলে দেখল, হ্রদের চৌকিদার দাঁড়ান তার সামনে। আগা বেক নেই।

'কোন্ পথ? কিসের থেকে মুক্তির পথ?'

'যা নিয়ে ভাবছিলে তা থেকে মুক্তির।'

'আমি ভাবছিলাম না, ঝিমাচ্ছিলাম।'

'যা নিয়ে ঝিমাচ্ছিলে তা থেকে। তোমার জুলফিয়াকে বিয়ে দাও সাইদের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি। বিয়েটা হয়ে গেলে কার সাধ্য ওদেরকে আলাদা করার!'

ঘাবড়ে গেল বুড়ো। তার মনের ভাবনা জানল কি করে লোকটা?

'আশ্চর্য হয়ো না। আমি জাদুকর নই। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে তুমি নিজেই বিড়বিড় করে বলছিলে মনের কথা।'

'তোমার পথে তুমি যাও। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে আসছ কেন? আমার বাচ্চাদের কি হবে তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কি?' বলল মোহাম্মদ আলী রেগেমেগে।

'আহা! আমার বাচ্চাদের! বলে ফেললে তো? তার মানে, মনে মনে তুমি জুলফিয়া আর সাইদের বিয়ে দিয়ে ফেলেছ।'

'এহ্ হে, আরেক ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছে সে। না, এ বড় সাংঘাতিক লোক। কেটে পড়াই উচিত,' ভাবল মোহাম্মদ আলী।

কিন্তু চৌকিদার তাকে ছাড়ল না। 'আচ্ছা, অলঙ্কার কোথায় পেলে বলো তো? আমি কাউকে জানাব না তোমার গোপন কথা।'

আগা বেকের গোয়েন্দা! গোপন কথা জানতে চাচ্ছে। হুঁশিয়ার হল সে।

'আমার বাগানে আপেল গাছের নিচে পেয়েছি। আর ক'বার বলব?'

'কিন্তু ওখানে ওগুলো রাখল কে?'

'যে রেখেছে সে তোমার এবং তোমার প্রভু আগা বেকের মত নয়,' বলল মোহাম্মদ আলী ক্রুদ্ধভাবে।

চৌকিদারটি মোহাম্মদ আলীর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'আরে তাই তো! কি আশ্চর্য! এ কাজ নিশ্চয়ই বাবা তোরা খানের।

এর পরই লোকটা মোহাম্মদ আলীর পথ ছেড়ে চলে গেল হন হন করে।

'পাগল নাকি লোকটা?' ভাবল মোহাম্মদ আলী। কিন্তু সে বুঝল না যে তার মনকে শান্ত করার জন্য, জমাট প্রশ্ন আর সন্দেহ দূর করার জন্য হোজা নাসিরুদ্দীন ওই কথাগুলো বলে গেলেন।

*

হোজা নাসিরুদ্দীন ছুটে গেলেন তাঁর কুটিরে। কানা চোর সেখানে একটা ঝোপের মধ্যে বসে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। এটা দু'জনের এক বিশেষ সাক্ষাৎকার।

হোজা তাকে বললেন, 'বাবা তোরা খানের নামে আরও কিছু সাহসের কাজ করতে চাও? ইচ্ছে থাকলে করতে পারো।'

হু-হু করে কেঁদে উঠল কানা। তারপর বুকে কিল মেরে বলল, 'পরের উপকারের জন্য কাজ করার এমন প্রবল ইচ্ছা আমার মধ্যে জেগে উঠেছে যে এখন আমি হোঁৎকা রহিম বাইকে আর তার নষ্টা বিবিকে ওর প্রেমিক সুদ্ধ চুরি করে নিয়ে আসতে পারি। আপনি কেবল হুকুম করুন!'

'আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে গাধায় রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে তুমি কি রাজি হবে?'

'গা···গাধা! থতমত খেয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে তাকাল কানা, প্রশ্ন করল, 'বেশি দিনের জন্য?'

'আরে, না, না, অল্প সময়ের জন্য। শোনো আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে।'

তারপর দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে শলা-পরামর্শ হল। শেষে কানা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। পরের দিনটা কেটে গেল যেন পাখির ডানায় ভর করে। রাতের অন্ধকার নেমে এল হুড়মুড় করে। কুঁড়েঘরের বাইরে একটা পাথরের ওপর বসে হোজা নাসিরুদ্দীন মনে মনে খুঁটিয়ে দেখছিলেন সেই রাতের চূড়ান্ত ঘটনার জন্য তাঁর সকল প্রস্তুতি নিখুঁত হয়েছে কিনা। একটু পরেই শোনা গেল ভারী পদক্ষেপের শব্দ। আগা বেক আসছে রহস্য জানার জন্য।

ধীর গম্ভীরভাবে হোজা নাসিরুদ্দীন আগা বেককে স্বাগত জানালেন। তাঁর সালামের মধ্যে আজ আর দাস্য ভাব নেই। তাঁর গলার স্বর, কথার ভঙ্গি ও আচরণ সংযত, মর্যাদাপূর্ণ।

আগা বেককে নিজের বিছানায় বসিয়ে তিনি একটা চামচ হাতে উবু হয়ে বসলেন জ্বলন্ত উনুনের সামনে। হাঁড়িতে তীব্র গন্ধযুক্ত লতা-পাতা সেদ্ধ হচ্ছিল। হোজা চামচ দিয়ে ওটা নাড়াতে লাগলেন।

'ওটা কি? রান্না করছ কিছু?'

'জ্বি, একটুখানি জাদুর পাঁচন।'

আগুন নিভে যাওয়ার পর হাঁড়িটা নামিয়ে হোজা বললেন, 'এটা ঠাণ্ডা হোক ধীরে ধীরে। ততক্ষণ আমরা কথা বলি। ভয়ে আর অতিরিক্ত বিস্ময়ে যাতে আপনার হৃদযন্ত্র বিকল না হয় তার জন্য আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে তো?'

'কেন, কেন, এটা কি খুব ভয়ের ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, যারা নতুন তাদের জন্য ভয়ের তো বটেই, বিপজ্জনকও।'

একটা কুপি জ্বালিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন দেয়ালে ঝুলিয়ে দিলেন। কুপির ক্ষীণ

আলোয় অন্ধকার কোণে দাঁড়ান গাধার শরীর আবছা ভেসে উঠল—প্রথমে দেখা গেল তার ক্রুদ্ধ চোখ দু'টি। তারপরে কান, লেজ ইত্যাদি। গাধার ক্রুদ্ধ হবার কারণ ছিল বৈকি। সেদিন মাত্র আধ ঝুড়ি রুটি পেয়েছে সে। বাকি আধ ঝুড়ি ঘরের আরেক কোণে তার নাগালের বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে। ওগুলো পাওয়ার জন্য সে অস্থির, চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছে না।

'হুং! রাহ্! কাবাহাস! খারামা!' অদ্ভুত কর্কশ কণ্ঠে, হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। চমকে ভয়ে লাফিয়ে উঠল আগা বেক।

'টুং শা! হিং স্রা! দ্রিং মাঘা!' বলতে বলতে দুই হাত ওপরে তুলে ঘুরতে লাগলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। ঘরের প্রত্যেক কোণায় গিয়ে দাঁড়ালেন একবার করে। তারপর সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসলেন আগা বেকের পাশে।

'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম। বাইরে থেকে কেউ আর এখন শুনতে পাবে না আমাদের কথা।'

'কে শুনবে? আমরা দু'জন আর ওই গাধাটা ছাড়া আর কে আছে এখানে?'

'আহ্, চুপ করুন কর্তা! কতবার বলেছি যে আপনার ওই বাজারী অশ্লীল শব্দটা এখানে উচ্চারণ করবেন না।'

কথাগুলো বলে হোজা উঠে দাঁড়ালেন এবং মাথা নুইয়ে গাধাকে কুর্নিশ করলেন। রুটি পাওয়ার আশা করে গাধা লেজ দুলিয়ে সাড়া দিল। এবার আগা বেকের দিকে ফিরে হোজা বললেন, 'না কর্তা, এখানে আমরা দু'জন নই, তিনজন। ওই ওঁকে দেখছেন না? তাছাড়া আরও আছে। আপনি কি জানেন না যে দৃশ্যমান প্রাণীর পাশাপাশি অদৃশ্য প্রাণীতে দুনিয়াটা ভর্তি? ওরা অদৃশ্য হলেও মানুষের ভাষা ঠিকই বোঝে।'

'অদৃশ্য প্রাণী? মানুষের ভাষা বোঝে? এসব কি বলছ?'

'হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে পাপী লোকদের এবং বিশেষত বিনা দোষে যাদের ফাঁসি হয়েছে সেই সব মানুষদের আত্মা। মৃত্যুর পরে কিছুকালের জন্য ওরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, জীবিতদের পেছনে লেগে থাকে, সুযোগ পেলে উত্যক্ত করে। আপনাকে তো ওদের বিশেষভাবে উত্যক্ত করার কথা।'

শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করলেন আগা বেক। 'আমাকে? কেন?'

'আচ্ছা আমাকে বলুন তো, খোরেজম শহরের শাসনকর্তা থাকা কালে আপনি কি কাউকে ফাঁসি দেননি?'

প্রশ্নটা যেন কুঠারের আঘাতের মত পড়ল আগা বেকের মাথায়। তোতলাতে তোতলাতে সে বলল, 'ইয়ে···হ্যাঁ, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে···'

'তবেই দেখুন! কিন্তু ফাঁসির পরে ওদের জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা করেছিলেন কি?'

'খোরেজমে এত দুষ্ট লোককে ফাঁসি দিতে হয়েছে যে ওদের জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে গেলে আমি ফতুর হয়ে যেতাম।'

'সেজন্যই তাদের অদৃশ্য আত্মারা আপনাকে অত বিরক্ত করছে।'

'তুমি কি করে বুঝলে যে ওরা আমাকে বিরক্ত করছে?'

'অভিজ্ঞ চোখে মাঝে মাঝে ওদেরকে কিছুটা—এই একটু ছায়ার মত, বাতাসে ভাসমান স্বচ্ছ কীটের মত দেখা যায়। আপনার মাথার চারপাশে আমি অনেক আগেই ওদেরকে দেখেছি। আপনিও হয়ত দেখেছেন, কিন্তু বুঝতে পারেননি।'

অতি স্থূলকায় আগা বেক প্রায়ই তার চোখের সামনে স্বচ্ছ কীটের মত কি সব দেখেছে বাতাসে ভেসে বেড়াতে, বিশেষ করে মাথা নোয়ানর পর আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালে।

'হ্যাঁ, দেখেছি! কিন্তু আমি ভেবেছি রক্তচাপের দরুন ওরকম হয়।'

'রক্তের চাপে হলে ওদেরকে লাল দেখাত, স্বচ্ছ দেখাত না।'

হোজা নাসিরুদ্দীনের এ রকম অকাট্য যুক্তির সামনে কিছুই বলতে পারল না আগা বেক। সে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মাথা তুলে তাকাল কীট দেখার জন্য এবং দেখল অগণিত। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'দেখ, দেখ, উজাক বাই! ওই যে, ওই যে ওরা! ওরা যায়নি!'

'শান্ত হোন, এগুলো অন্য রকমের, বেশি বিপজ্জনক নয়।'

'শান্ত হব? কিন্তু বিপজ্জনকগুলো যখন আসবে তখন? কেন তুমি আমাকে জানালে? আমি এখন কি করব?'

'কর্তা, আপনি সহজেই ওদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। গাঁয়ের গরীবদেরকে কিছু দান করুন, ওরা তখন আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না।'

এইভাবে আগা বেককে মানসিকভাবে তৈরি করে হোজা নাসিরুদ্দীন আসল কাজ—অর্থাৎ আগা বেককে মহা রহস্যের সাথে পরিচিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আর কি বিস্ময়কর, কি হতবুদ্ধিকরই না রহস্যটা! ওই কোণায় দাঁড়ান গাধাটি আসলে মোটেই গাধা নয়, মিশরের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, মিশরের দোর্দণ্ড-প্রতাপ সুলতান হোসেইন আল-আরাবীর একমাত্র সন্তান। জাদুমন্ত্র দ্বারা তাঁকে গাধায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

'এই কারণেই অন্য উপাদেয় খানা এখানে জোগাড় করতে না পেরে আমি ওঁকে খোবানি আর রুটি খেতে দিই। আহা, আমি যদি এক ঝুড়ি গোলাপের পাপড়ি মধুতে ডুবিয়ে ওঁকে দিতে পারতাম।'

আগা বেকের মাথা ঘুরতে লাগল। স্বচ্ছ কীটের কথা বিশ্বাস করেছে, কিন্তু এটা সে বিশ্বাস করতে পারল না।

'পাগল হয়ো না, উজাক বাই! এটা কেমন শাহজাদা? একটা সাধারণ গাধা ছাড়া আর কিছুই না!'

'স্‌স···! আপনি কথাটা অন্যভাবে বলতে পারেন না? যেমন, "ওই চতুষ্পদটা", কিংবা "ওই লাঙ্গুলধারীটা", অথবা "ওই লম্বকর্ণটা"?'

'ওই চতুষ্পদ, লাঙ্গুলধারী, লম্বকর্ণ গাধাটা।' সংশোধন করে বলল আগা বেক।

'আঃ ওই শব্দটা উচ্চারণ না করে পারেন না? না পারলে আপনি চুপ করে থাকুন।'

'কি বললে? আমি চুপ করে থাকব? আমার জমিতে, একটা নচ্ছার গাধার খাতিরে?'

হোজা নাসিরুদ্দীন গায়ের পিরানটা খুলে গাধার কামরার ফাঁকা দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'এবার আরেকটু সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পারব। তবে ওই শব্দটা বলতে হলে একটু চাপা গলায় বলবেন।'

'ঠিক আছে, কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, আমি বুঝতে পারছি না···'

'সহসাই বুঝতে পারবেন। আপনার মাথায় এটা ঢুকছে না যে ওই ধূসর চামড়া, লেজ, লম্বা কানের আবরণে একজন মানুষ—শাহী বংশের মানুষ কেমন করে থাকতে পারে। আপনি রূপান্তরের গল্প কাহিনী শোনেননি কখনও?'

'শুনেছি, তবে ওগুলো আমার কাছে আষাঢ়ে গল্প বলে মনে হয়েছে।'

'এখন আপনি স্বচক্ষে দেখছেন।'

'কিন্তু প্রমাণ কোথায়?'

'কেন, লেজের সাদা লোম?'

'ওরকম সাদা লোমওয়ালা শত শত গাধা পাওয়া যায়।'

'আস্তে, কর্তা, আস্তে। আপনি আরও প্রমাণ চান?'

'চাই বৈ কি! গাধাটা যদি বাদশাজাদা হয় তবে ওকে আমার সামনে মানুষ বানিয়ে দেখাও, নতুবা একটা মানুষকে গাধা বানিয়ে দেখাও। তবে বিশ্বাস করব।'

'তাই করতে যাচ্ছি আমি আজ—কিছুক্ষণের জন্য আমি তাঁকে তাঁর শাহী আকারে রূপান্তরিত করব। আর অন্য কোন লোককে গাধায় রূপান্তরিত করা—সেটাও সম্ভবত করা যাবে।'

'শুরু করো তাহলে, মাঝরাত হয়ে গেছে।'

শুরু করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। ঘুরতে লাগলেন সারা ঘরময়। কর্কশ স্বরে মন্ত্র আউড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেয়ালের ওপর। ছিটকে এলেন দেয়ালে থেকে ধাক্কা খাওয়া বলের মত। মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন। লাফিয়ে গেলেন ঘরের একদিক থেকে আরেক দিকে। তারপর ছুটে গিয়ে হাঁড়ি থেকে পাঁচন ছিটিয়ে দিলেন গাধার দেহে। মহা বিরক্ত হয়ে গাধা লাফাতে লাগল।

'কাবাহাস! শিমোজা! হুক্কুরু! কালামা!···হিংখ্রা'···অদ্ভুত বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার

করতে করতে তিনি ঢুকে গেলেন গাধার কামরায়। আগা বেকের দৃষ্টির আড়ালে গাধার নাকের নিচে চেপে ধরলেন একটা সুগন্ধী রুটি। রুটির গন্ধে উতলা গাধা ওটা মুখে পুরতে না পেরে খেপে উঠল। কর্কশ ডাক ছেড়ে লাথি ছুঁড়ল বেড়ার ওপর।

'টুট্‌সুগো! লিম্‌সুজা!' শেষবারের মত হুঙ্কার ছাড়লেন হোজা। তারপর ঘর্মাক্ত দেহে ছুটে এলেন আগা বেকের সামনে।

'আসুন, কর্তা, চলে আসুন, এক্ষুণি! রূপান্তরের এই অলৌকিক দৃশ্য দেখা কারও উচিত নয়। দেখলে অন্ধ হয়ে যাবেন! চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে যাবেন আর ভাল হবেন না!'

আগা বেককে একরকম টানা-হেঁচড়া করে বাইরে নিয়ে গেলেন তিনি এবং দরজাটা বন্ধ করলেন যত্নের সঙ্গে।

'আমার সঙ্গে আসুন, হুজুর। আমরা আরও একটু দূরে সরে যাই। এখানে থাকা বিপজ্জনক।'

আগা বেক কিছুটা আচ্ছন্নের মত বিনা বাধায় হোজা নাসিরুদ্দীনকে অনুসরণ করল।

সেচের নালার কাছে গিয়ে হোজার হঠাৎ কাশি শুরু হল। কাশি বন্ধ হতেই একটা পেঁচার ডাক শোনা গেল। এটা ছিল সঙ্কেত। কানা জানাল যে সে তৈরি। নির্দেশ পালনে সে প্রস্তুত।

হোজা নাসিরুদ্দীন ধপাস করে বসে পড়লেন ঘাসের ওপর। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে একটু বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তাঁর। আগা বেকও বসল পাশাপাশি।

আগা বেক স্বভাবতই সন্দেহপ্রবণ লোক। কুঁড়েঘরের ভেতর তার মনে সন্দেহ তেমন প্রবল হয়ে না উঠলেও বাইরের খোলা পরিবেশে এসে তার সন্দেহ হল যে তাকে এতক্ষণ ধরে বোকা বানান হয়েছে। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে মনে মনে। বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করল, 'কৈ উজাক বাই, কোথায় তোমার অলৌকিক ঘটনা?'

হোজা নাসিরুদ্দীন জবাব দিলেন না।

'তোমার জবাব দেবার মত কিছু নাই। আচ্ছা বলো তো, তুমি যদি প্রকৃত জাদুকর হও তাহলে এক টাকা রোজ বেতনে আমার চাকরি করছ কেন? তুমি ভুলে গেছ উজাক বাই যে খোরেজম শহরের সাবেক প্রধানের সঙ্গে তুমি কারবার করছ। তুমি কি ভেবেছিলে শুরুতেই আমি তোমার ধাপ্পাবাজি টের পাইনি? পেয়েছিলাম। কিন্তু এতক্ষণ বলিনি, কারণ আমি দেখতে চেয়েছিলাম তোমার দৌড় কতদূর পর্যন্ত। তোমার চালাকি ধরা পড়ে গেছে! তুমি একটা নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী…'

এই পর্যন্ত এসেই জিহ্বা তার অবশ হয়ে গেল। কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে এক ভয়াবহ অমানুষিক চীৎকার হঠাৎ খান খান করে দিল রাতের জমাট নিস্তব্ধতা।

ভীষণ আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে লাগল আগা বেক।

হোজা নাসিরুদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত ওপরে তুলে বলে উঠলেন, 'ধন্যবাদ তোমাকে, হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ, ধন্যবাদ তোমার মেহেরবানীর জন্য!' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আগা বেককে বললেন, 'আসুন কর্তা, কাজ হয়ে গেছে!'

কুঁড়েঘরের ভেতরে তাকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল আগা বেক। সেখানে গাধার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ! লোকটার গায়ে অসংখ্য মেডেল আর ধাতুর পাত বসানো অতি মূল্যবান কিংখাবের পোশাক! মাথায় মূল্যবান উষ্ণীষ!! কোমরবন্ধে ঝোলানো সোনার হাতলযুক্ত তলোয়ার!!!

হোজা নাসিরুদ্দীন মাথাটা প্রায় মাটির কাছাকাছি নামিয়ে হামাগুড়ি দেয়ার মত করে এগিয়ে গেলেন লোকটার দিকে এবং কুর্নিশ করে বললেন, 'হে জ্যোতির্ময় শাহ্‌জাদা, আপনার আজকের এই শুভ রূপান্তরে আমি অতি আনন্দিত।'

লোকটা কোন জবাব দিল না। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছে মৃগী রোগীর মত, দাঁত কড়মড় করছে। এক চোখের চর্মভেদী দৃষ্টিতে সে বিদ্ধ করছে আগা বেককে! মুখ থেকে তার সাদা ফেনা বেরুচ্ছে।

কথা বলার ভঙ্গিতে একটা কাঁপা হাত সামনে বাড়িয়ে দিল লোকটা, কিন্তু কথার বদলে তার মুখ থেকে বেরুল গাধার কানফাটা ডাক।

হোজা নাসিরুদ্দীন তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে জাদুর পাঁচন ছিটাতে লাগলেন। আস্তে আস্তে লোকটির কাঁপুনি ও খিঁচুনি বন্ধ হয়ে গেল, মুখের ফেনা অদৃশ্য হল। বুড়ো মেয়েমানুষের মত খ্যানখ্যানে সুরে সে বলে উঠল, 'ওরে হতচ্ছাড়া আলসে গোলাম, আর কত কাল তুই তোর এসব অস্থায়ী রূপান্তর নিয়ে আমাকে কষ্ট দিবি? প্রতিটি রূপান্তর আমাকে কি যন্ত্রণা দেয় তা কি তুই জানিস না?'

মাথাটা আরও নত করে হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'হে মহামহিম শাহ্‌জাদা, ভবিষ্যৎ সুলতান, আপনার এ অধম বান্দাকে মাফ করুন। আমি এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী জাদুর পাঁচন তৈরি করতে পারিনি।'

'চার বছর ধরে তো এই কাণ্ডই করে যাচ্ছিস!'

'অবেশেষে এই গাঁয়ের প্রান্তে আমি একটা গুল্ম আবিষ্কার করেছি। এটা আমার পাঁচনকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় শক্তি যোগাবে। মহামান্য শাহ্‌জাদা, আমার কাজ এখন শেষ হল। আপনার চূড়ান্ত ও স্থায়ী রূপান্তার ঘটবে হেমন্তের আগে—আমরা আপনার সূর্য প্রতিম পিতা, মহান ও অজেয় সুলতান হোসেইন আল-আরাবীর দরবারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে।'

'ততদিন পর্যন্ত আমাকে এই ঘৃণ্য গাধার চামড়ার মধ্যে বাস করতে হবে?'

'হায় শাহ্‌জাদা-ই-জামান, এক্ষেত্রে আমি অক্ষম! আপনার চূড়ান্ত রূপান্তর মিশর ছাড়া আর কোথাও এবং আপনার পিতার উপস্থিতি ছাড়া হতে পারবে না।

একমাত্র তাঁর চুম্বনই আমার জাদুকে স্থায়ীত্ব দেবে। ফলে, আপনি চিরকালের জন্য আপনার জন্মগত রাজকীয় আকার-আকৃতি ফিরে পাবেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাহজাদা বললেন, 'এ ছাড়া আর উপায় নাই। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ওখানে কাঠের খুঁটির মত দাঁড়িয়ে থাকিস না। আমার এই উষ্ণীষটা আর তরবারিটা খুলে নে। তরবারিটা কোথাও লুকিয়ে রাখ। রূপান্তরের সময় ওটা আমার দেহের ভেতর ঢুকে যায় এবং আমাকে অহেতুক কষ্ট দেয়।'

হোজা নাসিরুদ্দীন আদেশ পালন করলেন।

'তুই এ চার বছর যাবত আমার কাজ করছিস, কিন্তু আজও কিচ্ছু শিখলি না! শাহী মহলের লোকদের সামনে কেমন আচরণ করতে হয় তুই তা মোটেও জানিস না। আমার ভয় হয়, তুই যখন উজীর এবং মিশর রাজ্যের প্রধান খাজাঞ্চী হবি তখন খুব মুশকিলে পড়ে যাবি। আমার আব্বা মিশরের মহা পরাক্রমশালী সুলতান, তাঁর উজীর ও অমাত্যদের আদব-কায়দা সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর।'

'হে মহামান্য বাদশাহজাদা! আমার গোস্তাকি মাফ করুন!'

'তুই ঠিকমত দাঁড়াতেও পারিস না। শাহী পরিবারের লোকের সামনে ওভাবে কেউ দাঁড়ায়? তোর চোখে সেই ভক্তিভাব কই? পিঠের বাঁকে সেই দাস্যভাব কই?'

'হে দয়ার সাগর! আমার বে-আদবি মাফ করুন।'

'চুপ! কোন্ সাহসে আমার কথার মধ্যে কথা বলছিস? আজকের রুটিগুলো পোড়া পোড়া ছিল কেন? খোবানিগুলো কেন অর্ধেক কাঁচা আর অর্ধেক বেশি পাকা? গতবার রূপান্তরের সময় আমি খেজুরের কথা বলেছিলাম। খেজুর আনাসনি কেন ব্যাটা পাজি? তুই কি বুঝিস না যে আমি—মিশরের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। যখন বলি খেজুর খাব, তখন গোটা কারাভাঁ পাঠিয়ে মিশর থেকে হলেও খেজুর আনাতে হবে?'

এই পর্যন্ত বলে কানা চোর (জমকাল পোশাক পরা শাহজাদাটি) আগা বেকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'এটা আবার কে? কোত্থেকে এসেছে, কি চায় এখানে?'

'এখানকার স্থানীয় লোক। জাদুর গুল্ম খুঁজতে সে আমাকে সাহায্য করেছে।'

'নাম?'

ভয়ে মৃতপ্রায় আগা বেক দরজার খুঁটিতে ভর দিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়েছিল। আচমকা প্রশ্নে আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠল, 'তা···তা···ব···দ···বেক।'

'কি? শুনতে পাচ্ছি না।' মহা ভারিক্কি চালে বলল কানা, 'তাতা বেক, নাকি তারা বেক?'

'ছা···ভা···কা···বেক···'

'কি? ছাতাবেক? মাগাবেক?'

হোজা নাসিরুদ্দীন বিনম্র স্বরে বললেন, 'আগা বেক।'

'ও, আগাবেক। বেশ, বেশ,আগাবেক হলে আগাবেক। এগিয়ে এসো, ভয় করো না।'

আগা বেক এগিয়ে গিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং নিজের দাড়ি দিয়ে কানার পা মুছিয়ে দিল।

হোজা নাসিরুদ্দীন বলল কানা, 'এই তো, দেখ্ ভাল করে। গ্রামে থাকলেও এই লোকটা শাহী বংশের উপযুক্ত আদব-কায়দা জানে। দেখ্, মেরুদণ্ডটা সে কিভাবে বাঁকিয়েছে, মোটা হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। আর তুই?...'

'হে দুনিয়ার আলো, হে মিশরের তাজ, এই লোকটা এক সময় উঁচু পদে চাকরি করেছে। কাজেই বড় ঘরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে, পক্ষান্তরে আমি...'

'উঁচু পদে চাকরি করেছে? সেটা দেখলেই বুঝা যায়। তুই ওর কাছে শিখে নে।'

এবার আগা বেককে লক্ষ করে কানা বলল, 'উঠে দাঁড়াও। তোমাকে দেখে আস্থা হয়। আমার এই মূর্খটাকে দরবারী কায়দা-কানুন কিছু কিছু শিখিয়ে দিও। আমি মিশর থেকে তোমাকে পুরস্কার পাঠাব...আ...ঈ! ওহ্! আউ-উ-উ! উ-উ-উ!'

হঠাৎ চীৎকার করে দাঁত কড়মড় করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল কানা, হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, মুখে ফেনা দেখা দিল।

আগা বেককে ধাক্কা দিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন বললেন, 'শুরু হয়ে গেছে, উল্টা রূপান্তর শুরু হয়ে গেছে। শিগ্‌গির, অন্ধ হবার আগেই আমাদেরকে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

আগা বেকের পা অবশ। সে কাঁপছিল থরথর করে। দরদর করে ঘামছিল তার সারা দেহ। হোজা তাকে ময়দার বস্তার মত টেনে বাইরে নিয়ে ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ পরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে আগা বেক জানতে চাইল, 'শাহজাদা এখন কেমন আছেন...তিনি কি এরই মধ্যে...'

হোজা নাসিরুদ্দীন নিশ্চিত ছিলেন যে কুঁড়েঘরের পেছনের নতুন কাটা দরজা দিয়ে কানা এতক্ষণ গাধাকে ভেতরে এনে নিজে সটকে পড়েছে। কাজেই নির্ভয়ে তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় তাই। চলুন না, দেখে আসি।'

'না, আগে তুমি যাও।'

সামনের দরজা খুলে ঘরে উঁকি দিয়ে হোজা জানালেন যে রূপান্তর হয়ে গেছে। এবার আগা বেকও গিয়ে দেখল। মিশরের শাহজাদার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আগের সেই ধূসর রঙের গাধাটি। কি আশ্চর্য, ভাবল আগা বেক, বাইরের

চেহারায় আর দশটা গাধার মত, কিন্তু ভেতরে লুকিয়ে আছে···ওরে বাপ্‌রে! কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আবারও কুর্নিশ করল সে।

ঘরের পেছন দিকের জমাট অন্ধকারে নতুন কাটা দরজাটা তার চোখে পড়ল না। পরদিনই হোজা নাসিরুদ্দীন শুকনো খড়, লতাপাতা জড়ো করে ওটাকে ভেতরে বাইরে এমন ভাবে আড়াল করে দিলেন যে দিনের বেলাতেও আগা বেক কিছু টের পেল না।

পনেরো

আগা বেকের কূট চাল

হোজা নসিরুদ্দীন গাধাকে রুটি আর খোবানি খাওয়াচ্ছিলেন। আগা বেক তা দেখছিল দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে ভয় আর বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠেছে সে। তার অভিজ্ঞ শেয়ানা বুদ্ধি কাজ শুরু করেছে। তার চিন্তার গতি আঁচ করা তেমন কঠিন নয়। সে ভাবছে, 'এই তো একজন রাজপুত্র তার সামনে। ভাগ্যক্রমে এরইমধ্যে সে এই মহামহিম শাহজাদার কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। তিনি তাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন। অবিলম্বে এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শাহজদাকে আরও সন্তুষ্ট করতে হবে। অন্য সব বড় লোকদের মত আগা বেকেরও ছিল চরম ভীত অবস্থা থেকে মুহূর্তে অতি সাহসী হয়ে ওঠার নির্লজ্জ ক্ষমতা। চট করে ঘরে ঢুকে গাধার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। এবং কুর্নিশ করে বলল, 'বে-আদবি মাফ করুন, মহামান্য শাহজাদা! আপনার রাজকীয় আহারের সময় বিরক্ত করছি বলে। কিন্তু আপনার এই লোকটির অশোভন আনাড়ীপনা দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। শাহী খান্দানের মানুষকে খানা পরিবেশনের এ-ই কি রীতি?' আগা বেক এবার হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে ফিরে গম্ভীর স্বরে হুকুম দিল, 'রুটিগুলো আমাকে দাও, খোবানিগুলোও দাও। দেখো, কিভাবে কি করতে হয়।'

তারপর সে যা করল সেটা সত্যি দেখার মত। পিঠটা ধনুকের মত বাঁকিয়ে,

দুই হাতের তালুতে রুটি রেখে গাধাকে খাওয়াল। খোবানিগুলো সযত্নে ধুয়ে মুছে কেটে কেটে বীচি ফেলে দিয়ে গাধার মুখে তুলে দিল। মধুমাখা চাটুবাক্য আর স্তুতিতে গাধাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করল। এমন সম্মান দুনিয়ার আর কোন গাধার—এমনকি যে গাধাটিতে চড়ে একদিন ঈসা নবী (আঃ) জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন তার কপালেও জোটেনি।

ঝুড়ি দুটো খালি হবার পর আগা বেক একটা তোয়ালে চেয়ে নিয়ে গাধার থুতনিটা সযত্নে মুছিয়ে দিল। গাধা তোয়ালেটাকে নতুন কোন খাবার মনে করে মুখে পুরে চিবিয়ে শেষে হতাশ হয়ে উগরে ফেলল।

এতক্ষণে হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে আগা বেক ঘোষণা করল, 'মহামহিম শাহজাদার নৈশ আহার সমাপ্ত হয়েছে!'

এরপর আগা বেক হোজা নাসিরুদ্দীনসহ বাইরে গিয়ে হ্রদের ধারে বসে রইল অনেকক্ষণ ধরে। তার মনে অবদমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ আর ক্ষমতার মোহ সব একসঙ্গে জেগে উঠল। সে বুঝল, এই অজ পাড়া গাঁ থেকে বেরুবার সোজা পথ মিশরের পথ। কাজেই এঁটুলির মত লেগে রইল সে হোজা নাসিরুদ্দীনের গায়ে। শাহজাদা সম্পর্কে সব কিছু সে জানতে চায়—কিভাবে কোন্ অবস্থায় তাঁকে গাধায় রূপান্তরিত করা হয়েছে, হোজা নাসিরুদ্দীন তখন কোথায় ছিলেন, তিনি কেমন করে ওই দুঃসংবাদ শুনলেন, ইত্যাদি।

এসবের জবাবে তাকে এক দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়ে হোজা বললেন, 'চারটি বছর ধরে কষ্ট করছি তাঁকে নিয়ে। এবার আল্লাহর রহমতে আমার কষ্টের শেষ হবে—জাদুর পাঁচন তৈরি হয়েছে। আর দুই এক সপ্তাহ এখানে থাকব। জাদুর লতাগুল্ম সংগ্রহ করব। এগুলো অন্যত্র পাওয়া যায় না। তারপর চলে যাব মিশরে। মহান সুলতানকে তাঁর সন্তান ফিরিয়ে দেব। আমার জীবনে সেটাই হবে আনন্দের দিন।'

'বিনিময়ে তুমি উজীরের পদ আর প্রধান খাজাঞ্চীর পদ লাভ করবে।'

'আপনাকে কে বলেছে যে আমি ওই সব পদ চাই? সুলতান হয়ত দিতে চাইবেন, কিন্তু আমি নেব না।'

'কেন, উজীরের পদ নেবে না কেন?'

'আমি ওসবের জন্য লালায়িত নই। আমি চাই স্বাধীনতা আর নির্জনতা। তাছাড়া আমার বিশ্বাস, শাহজাদাকে আমি যেমন জেনেছি সে রকম জানলে অন্য যে কেউ ওই পদ নিতে অস্বীকার করবে।'

এরপর ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে দরজা বন্ধ করে এসে হোজা বললেন, 'শাহজাদা ঘুমাচ্ছেন, কাজেই নির্ভয়ে আমরা কথা বলতে পারি। তিনি সকল দ্বিপদ-চতুষ্পদের মধ্যে সব চেয়ে অসহ্য প্রাণী। গাধার মতই একগুঁয়ে। বাদশাহ্‌র ছেলে না হলে আমি তাঁর পূর্বরূপ ফিরিয়ে দিতাম না—কারণ বর্তমান রূপই তাঁর উপযুক্ত। মানুষ আর গাধার সব বদগুণই তাঁর মধ্যে রয়েছে। তাঁর প্রবল

প্রতাপান্বিত পিতা নাকি এর চেয়েও খারাপ। এখন আপনিই বিচার করুন—আমার মত লোক, যে কিনা দরবারী কূটনীতি আর চক্রান্তের কিছুই জানে না, কি করে সেই উজিরী পদ নেবে? আজকে উজীর হয়ে কাল গর্দান হারাবার জন্য?'

দম বন্ধ করে আগা বেক শুনল হোজা নাসিরুদ্দীনের কথাগুলো। নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাগ্য তাহলে সত্যি সাঁতরে এসে উঠছে তার হাতের তালুতে!

হোজা বলে গেলেন, 'ক্ষমতার জন্য আমার জন্ম হয়নি। আমার জন্ম হয়েছে নির্জনে চিন্তা করার জন্য, রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। বিশটা বছর কাটিয়েছি জাদু-বিদ্যা নিয়ে—যার ফলাফল তো নিজেই দেখলেন। এখন আমি সে সব ছেড়ে দেব? কেন, গর্দান হারাবার জন্য?'

জ্যোতির্বিদ, পণ্ডিত, কবি, অমৃতরসের সন্ধানকারী, সীসাকে সোনা বানাবার চেষ্টায় রত রসায়নবিদ, দার্শনিক—এদেরকে আগা বেক উন্মাদ বলে মনে করত। এদের বাস্তব জ্ঞান, সাধারণ বিচারবুদ্ধি থাকে না। এরকম মানুষদের বোকা বানানো তার মতে খুব সহজ। হোজা নাসিরুদ্দীনকেও ওইরকম একজন বোকা ভেবে সে বিশ্বাস করল তাঁর কথাগুলো। গভীর গাম্ভীর্য নিয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। উজীরের পদ সামাল দেয়া তোমার ক্ষমতার বাইরে।'

'আমি সেটা জানি। তাই ঠিক করেছি, সুলতানকে তাঁর ছেলে ফিরিয়ে দেব। সব পদ আর সম্মান প্রত্যাখ্যান করব। এবং পুরস্কার হিসাবে কোন নির্জন জায়গায় একটা ছোট্ট ঘর আর বাকি জীবনের জন্য একটা মাসিক ভাতা চেয়ে নেব।'

আগা বেকের হৃদয়ে লোভ আর ঈর্ষার প্লাবন লক্ষ্য করে হোজা নাসিরুদ্দীন আবার বললেন, 'প্রকৃতির সব রহস্য আমি এখনও পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি। আমি মানুষকে মশা, মাছি, পিঁপড়ে, মৌমাছি ইত্যাদি বানাতে পারি। বড় জীব-জন্তুকে রূপান্তরের কাজ তো আপনি আজই সচক্ষেই দেখলেন। কিন্তু মানুষকে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জলচর প্রাণী বানানর কৌশল এখনও আয়ত্ত করতে পারিনি।'

'মানুষকে মশা-মাছি বানানোও সম্ভব?'

'এর চাইতে সহজ কিছু হতে পারে না। আসুন না, আপনার ওপরই পরীক্ষা চালাই।'

'না, না, দরকার নাই।'

'আপনি টেরই পাবেন না। কোন ব্যথাও পাবেন না। মাত্র একদিনের জন্য বানাব। কালই আপনাকে আবার মানুষের রূপে ফিরিয়ে আনব। দাঁড়ান, পাঁচনটা নিয়ে আসি।'

'না, থাক আজকে। অন্য কোন দিন দেখা যাবে। আজ ক্লান্ত আমরা দুজনেই। যাই এবার।'

চট করে উঠে দাঁড়াল আগা বেক। মিশরের রাজপ্রাসাদ হাতছানি দিয়ে তাকে

ডাকছে। এখন মশা-মাছি হবার ঝুঁকি সে নিতে চায় না। এখন তার মাথায় একটি মাত্র চিন্তা—কি করে কোন চালাকীর দ্বারা মহামান্য শাহজাদাকে (গাধাকে) নিজের বাড়িতে সরানো যায়।

দু'দিন পরেই আগা বেক কথাটা পাড়ল বোকা উজাক বাই-এর কাছে। আগা বেকের বাড়িতে শাহজাদার বেশি আরাম হবে—এ যুক্তি বোকারামটি মেনে নিল। ফলে সঙ্গে সঙ্গে গাধা স্থানান্তরিত হল আগা বেকের বাড়িতে।

গাধার আনন্দের আর অন্ত নেই। এমন সুখ, এমন খাবার, এমন সৌভাগ্য সে জীবনে দেখেনি। আগা বেকের সবচেয়ে ভাল ঘরটাতে সে থাকে। মেঝেতে মূল্যবান কার্পেট পাতা, চীনেমাটির বাসনে নানা রকমের রুটি, পিঠা, খোবানি, তরমুজ, গাজর ইত্যাদি সাজানো। সিঁড়ি বেয়ে সোজা চলে যাওয়া যায় বাগানে, ফুল-পাতা যা ইচ্ছে খাওয়া যায়। আগা বেক গাধার মনকে উজাক বাই-এর (হোজা নাসিরুদ্দীনের) দিক থেকে নিজের দিকে ফেরাবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি। হোজা নাসিরুদ্দীনকে সে গাধার কাছে বেশিক্ষণ থাকতে দেয় না। কখনও বলে, 'মহান শাহজাদা এখন ক্লান্ত', কিংবা 'তিনি এখন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত'। মনে মনে হেসে হোজা নাসিরুদ্দীন নীরবে মেনে নেন তার কথা, চলে যান নিঃশব্দে।

আগা বেকের এখন একটাই মাত্র চিন্তা—কেমন করে মহামান্য শাহজাদার মনকে উজাক বাই-এর প্রতি বিরূপ করে তোলা যায়। এই উদ্দেশ্যে সে তার সকল বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, ধূর্ততা ও কূটবুদ্ধিকে অবিলম্বে কাজে লাগাল। একদিন হোজা নাসিরুদ্দীন আড়াল থেকে দেখলেন আগা বেক গাধাকে বাগানে নিয়ে গেছে। ফুলের বিছানায় দাঁড়িয়ে গাধা মহা আনন্দে আগা বেকের দেয়া তরমুজের টুকরোগুলো চিবোচ্ছে, আর আগা বেক গাধার লম্বা কানের মধ্যে উজাক বাই-এর বিরুদ্ধে কুৎসার বিষ ঢালছে। ফিসফিস করে সে বলছে, 'তারপরে হে মহামান্য শাহজাদা, ওই বদমাশটা আপনার এবং আপনার মহামান্য পিতার রাজকীয় স্বভাব সম্পর্কেও বিশ্রী বদনাম করল। সে এমন সব কথা বলল যা উচ্চারণ করতে আমার জিহ্বা অক্ষম। সে বলল, শাহজাদা বোকা, একগুঁয়ে, নীচমনা, বদমেজাজী। সে বলেছে এসব কথা, আমি না। সে বলল, শাহজাদার স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে তাঁর বাহ্যিক রূপের পুরোপুরি মিল রয়েছে। এসব কথা যে বলতে পারে সে কি আপনার সঙ্গে বে-ঈমানী করতে পারে না? কায়রোর পথে সে কি সামান্য টাকার বিনিময়ে আপনাকে কারও মাল বহনের জন্য একটা সাধারণ গাধা···মানে···অর্থাৎ একটা সাধারণ লম্বা কান ও চার-পা ওয়ালা প্রাণীর মত বেচে দিতে পারে না? এইভাবে সে কি মিশরের সিংহাসনকে তার একমাত্র ও বৈধ উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত করতে পারে না? তারপরে সে আরও বলেছে···

এ পর্যন্ত শুনেই হোজা নাসিরুদ্দীন নিঃশব্দে সরে গেলেন সেখান থেকে।

সেই রাতে কানাকে ডেকে তিনি জানালেন যে তাঁদের ফলটি পেকে গেছে। এখন ওটা পাড়তে হবে।

কানা জানতে চাইল ওর আর কি করার আছে। হোজা বললেন, 'এখানে তোমার আর কিছু করার নেই। কোকন্দে ফেরার জন্য তৈরি থেক।'

পরদিন আগা বেকের বাগানে গেলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। বললেন, 'কর্তা, আপনি শাহজাদার ইচ্ছা পূরণ করছেন না। আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ উজীর আর খাজাঞ্চীর পদ গ্রহণের জন্য আমাকে আপনি এখনও তৈরি করেননি।'

'কেন এত তাড়া কিসের? তুমি কি এখনি বিদায়ের কথা ভাবছ?'

'কায়রোর পথ তো অনেক দূরের পথ, হুজুর।'

'কিন্তু, এই সেদিনই না তুমি বললে যে উজীরের পদ তুমি চাও না? এরইমধ্যে মত বদলালে?'

'না, মত বদলাইনি। কিন্তু সুলতান যদি বলেন—হয় উজীরের পদ নাও, নতুবা ফাঁসিতে যাও—তখন আমি কি করব? তাঁর সঙ্গে তো তর্ক চলে না। কাজেই, আমাকে তৈরি থাকতে হবে।'

আগা বেকের মুখ কালো হয়ে গেল। দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে সে বলল, 'গর্দান বাঁচাবে কিভাবে? তুমি শাহজাদা আর সুলতানের মেজাজের কথা তো জানো।'

'আরে সেই বিষয়েই তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আপনার অভিজ্ঞতা আছে, জ্ঞান আছে, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। পুরস্কার হিসাবে, কসম করে বলছি, মিশর থেকে আপনার জন্য সোনার কাজ করা একটা হুক্কা আর মদের সোরাহী পাঠাব।'

হুক্কা আর সোরাহী!—এ যে মরুভূমিকে দুই ফোঁটা পানি দেয়ার প্রতিশ্রুতির মত। আগা বেকের স্বপ্ন হচ্ছে কায়রোর প্রাসাদে সোনাদানা ভর্তি সিন্দুক, সম্মান, ক্ষমতা—হুক্কা আর সোরাহী নয়।

'উজাক বাই, নিজে অত ঝুঁকি না নিয়ে শাহজাদাকে দিয়ে দাও না আমার হাতে?'

হোজা ভাবলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হওয়া ঠিক হবে না। তাই বললেন, 'কি? আপনাকে দিয়ে দেব? আরও অনেক বড় বড় লোক তা-ই চেয়েছেন। কিন্তু প্রথমত শাহজাদা কায়রোর পথে আমাকে ছাড়া আর কোন সঙ্গী চান না, দ্বিতীয়ত…'

'শাহজাদাকে বুঝিয়ে রাজি করানো যেতে পারে। তাছাড়া, তাঁর বর্তমান রূপ ও আকারে…অর্থাৎ গাধা থাকা অবস্থায়…'

'তাঁর সঙ্গে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করা যায়—এই তো বলতে চান?'

'না, না, আমি সেকথা বলতে চাইনি। আমি বলতে চাচ্ছি যে তাঁর জবাবকে, কান নাচানো বা লেজ নাড়াকে ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করা যায়।'

'আরে সত্যিই তো! মালিক, ঠিকই শাহী দরবারী পদের জন্যই আপনার জন্ম হয়েছে। কিন্তু, এর জন্য আপনি আমাকে কি পুরস্কার দেবেন?'

'তুমি না নির্জনতা চাও? এখানকার চাইতে নির্জন আর চমৎকার জায়গা তুমি কোথায় পাবে? তুমি জীবনের জন্য স্থায়ী আয় চাও। আমার হ্রদ থেকে তুমি তা পাবে।'

'কিন্তু হ্রদ নিয়ে, পানি দেয়া নিয়ে ঝামেলা কম নয়। এতে আমার জ্ঞানচর্চার সময় নষ্ট হবে যে!'

'অল্প বেতনে একজন লোক রেখে দিয়ো, সে-ই সবকিছু করবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক কথা! আমি যে একটা লোক রেখে দিতে পারি এ কথা আমার মনেই আসেনি।'

'ওই লোকটার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে তুমি তোমার জাদুর লতাগুল্ম সংগ্রহে মেতে থাকতে পারবে।'

'জাদুর লতাগুল্ম! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাই আমার আসল কাজ!'

'সে কথাই তো বলতে চাচ্ছি। এখানে জাদুর লতাগুল্মের শেষ নেই। আমি জানতাম, কিন্তু তোমাকে আগে বলিনি। প্রতি ঝোপের মধ্যেই তুমি কোন না কোন জাদুর লতা পাবে।'

'তাই নাকি!' বিস্ময়ের ভান করে দুই চোখ কপালে তুলে বললেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'হাজার হাজার, লাখ লাখ জাদুর লতাগুল্ম এখানে জন্মায়। বছর দু'য়েক আগে এক জাদুকর এসে এখান থেকে অনেক লতা নিয়ে গেছে। সে আমাকে বলেছে যে এখানকার লতাপাতাই শুধু নয়, মাটি পাথর পানি সবই নাকি জাদুময়...' হোজা নাসিরুদ্দীনকে শিশুর মত সরল আর বোকা ভেবে বাকপটু হয়ে উঠল আগা বেক।

এমন প্রলোভন হোজা নাসিরুদ্দীন কি করে ঠেকান! তাঁকে হার মানতেই হল। হ্রদ, হ্রদের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সম্পত্তি অর্থাৎ আগা বেকের বাড়ি, বাগান এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি শাহজাদাকে ছাড়তে পারেন।

আগা বেক রাজি হল। এখন একটা কাজ বাকি রইল—জঙ্গী মাজার গ্রাম থেকে বুড়ো কাজী আবদুর রহমানকে ডেকে আনা। আগা বেক বলল, 'কাজী আবদুর রহমানের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে আনতে হবে এবং দলিলটা পাকা করে নিতে হবে। আমি তার ব্যবস্থা করছি। তুমি, উজাকবাই, ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জাদুর পাঁচন বানিয়ে ফেলো। আর মন্ত্রগুলো সুন্দর করে কাগজে লিখে ফেলো, যাতে মিশরের দরবারে গিয়ে আমি ওগুলো পড়ে শাহজাদাকে মানুষ বানাতে পারি।'

ষোলো

কাজীর মুনশীয়ানা ও হ্রদ উদ্ধারের কাহিনী

সেই দিন থেকে আগা বেক আর আগের দিনের আগা বেক রইল না। কল্পনার ডানায় ভর করে সে তখন চলে গেছে মিশরের শাহী দরবারে। নিজেকে সে ভাবছে মিশরের উজীরে-খাজানা আগা বেক ইবনে মুরতাজ আল-খোজেমী বলে। তার চলনে বলনে ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে এক গর্বিত উজীরি ভাব। তার ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কার চরমে উঠেছে। নিজের একমাত্র বুড়ো চাকরটাকে সে বাধ্য করেছে প্রতিদিন সকাল-বিকাল মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাকে কুর্নিশ করতে। হোজা নাসিরুদ্দীনকে এখন সে গাধার কাছেই আর ঘেঁষতে দেয় না।

এদিকে গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রা চলছে গতানুগতিক ধারায়। হ্রদের নতুন চৌকিদারের পাগলামি কাণ্ড নিয়ে তারা আর মাথা ঘামায় না। তবে আগা বেকের ভয়ঙ্কর কালো ছায়া তাদেরকে ঢেকে রেখেছে সর্বক্ষণ। আরেকটি সেচের সময় হয়ে এল প্রায়। এবার সে কি দাবি করে বসবে কে জানে। ভয় আর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন তাদের সকলের মন।

এমন অবস্থায় একের পর এক চমকপ্রদ খবর যেন ওদেরকে হতচকিত করে দিতে লাগল।

গাঁয়ের মোল্লা একদিন সফরের চা-খানায় জাঁকিয়ে বসে বলল, 'শুনেছ মিঞারা, আগা বেক সাহেবের মন এতদিন পরে ধর্মের দিকে ঝুঁকেছে। তিনি মসজিদকে পনেরো শ' টাকা দান করেছেন এবং মুর্দাদের জন্য সারা বছর দোয়া করতে বলেছেন।'

পনেরো শ' টাকা! সেচের আগে? তাহলে আগামী সেচের জন্য সে কত টাকা নেবে? মুর্দাদের জন্য সে দোয়া করাচ্ছে? কোন মুর্দা? কাঁচের মত স্বচ্ছ ভাসমান কীটের কথা তো গ্রামবাসীরা জানত না, তাই খবরটা তাদেরকে শঙ্কিত করে

তুলল। সফল মাথা নেড়ে বলল, 'মুর্দাদের জন্য আগা বেকের দরদ? ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে লাগছে। নিশ্চয় তার অন্য কোন গোপন মতলব আছে। আমরা যারা এখনও বেঁচে আছি, আমাদেরকে ভাতে মারার মতলবেই হয়ত সে দোয়া করাচ্ছে।'

করম আলী বলল, 'আমার মনে হচ্ছে সেচের পানির দাম বাড়িয়ে সে এ টাকা তুলে নেবে।'

গ্রামবাসীদের মধ্যে দ্বিতীয়বার আলোড়ন সৃষ্টি করল আগা বেক নিজে। দাবা খেলতে এসে একদিন সে জানাল যে দিন কয়েকের মধ্যেই সে হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাবে। মিশর যাওয়ার কথাটা গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই সে হজে যাওয়ার কথা বলল।

শুনে চা-খানায় উপস্থিত লোকদের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি হলঃ হজের খরচ সেচের পানির দাম বাড়িয়ে উসুল করে নেবে নাকি সে?

তৃতীয় খবরটা গ্রামবাসীদের একেবারে হতভম্ব করে দিল। কি ব্যাপার? না, আগা বেক বুড়ো কাজী আবদুর রহমানকে আনতে লোক পাঠিয়েছে। কেন? কার বিরুদ্ধে মামলা করতে চায় লোকটা? কোন জাল দলীল পাকা করতে চায়?

সন্দেহে, আতঙ্কে, উত্তেজনায় অস্থির হল চোরাক। পথে-ঘাটে, মাঠে, চা-খানায় কেবল এই আলোচনা।

এই উপলক্ষ্যে সফরের চা-খানায় এক বড় মজলিস বসল। খেত-খামার কাজকর্ম ফেলে গাঁয়ের লোক সবাই এসে জড়ো হল সেখানে। সফর বলল, 'তোমরা দেখো, যাবার আগে আমাদের সবাইকে পথে বসাবে আগা বেক।'

একমাত্র বুড়ো মোহাম্মদ আলী খুশি হল মনে মনে। যা কিছুই ঘটুক, জুলফিয়াকে বিয়ে করার দাবি আগা বেক আর করবে না।

সকলে মিলে ঠিক করল যে আগামী সেচের জন্য আগা বেক কত চায় সেটা জানার জন্য আগেভাগেই তাকে জিজ্ঞেস করা উচতি। চারজন বুড়োকে তারা পাঠাল আগা বেকের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

কিন্তু ব্যর্থ হল বুড়োরা। আগা বেক রাজি হল না ওদের সঙ্গে কথা বলতে। তার নতুন চৌকিদার প্রভুর পক্ষে ওদের সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু তার কথাগুলো অদ্ভুত ধরনের এবং ওতে বিশ্বাস করা যায় না।

লোকটা বলল, 'পানি তোমরা পাবে। আগাম কোন কিছু বিক্রি করার দরকার নেই। তোমাদের হাতে যা আছে তাতেই যথেষ্ট হবে।'

কিন্তু ওদের হাতে কতই বা আছে? গোটা গ্রামের লোকের কাছে খুঁজে বড়জোর শ' দেড়েক টাকা যোগাড় করা যাবে। বুড়োরা চৌকিদারকে তাই বলল। শুনে চৌকিদার মন্তব্য করল, 'আমি জানি তোমাদের ট্যাকের অবস্থা। তবু বলছি, কিছু বিক্রি করো না। যাও, সবাইকে জানিয়ে দাও আমার কথা।'

এ রকম সময়ে খবর এল যে বুড়ো কাজী আবদুর রহমান কাছের এক গাঁয়ে একটা কাজ সেরে পরদিন সন্ধ্যায় এখানে আসবেন। এই খবরে গ্রামবাসীদের কৌতূহল আর উত্তেজনা চরমে উঠল। শুধু অচঞ্চল রইল দুজন—সাইদ আর জুলফিয়া, কারণ ওদের মন তখন শঙ্কামুক্ত।

যথাসময়ে কাজী এলেন আধমরা এক গাধায় চেপে, ধূর্ত চেহারার একজন কেরানিকে সঙ্গে নিয়ে। জাঁকিয়ে বসলেন সফরের চা-খানায়, সফরের বিছানো অনেকগুলো কম্বলের মোটা গদীর ওপর। সারা জীবন বাঁকা পথে চলে বাঁকা বিচার এবং বাঁকা চিন্তা করে শেষকালে সত্যিকার অর্থে বাঁকা হয়ে গেছেন কাজী আবদুর রহমান—দেহে, অন্তরে, চেহারা সুরতে। তাঁর চোখ বাঁকা, মুখ বাঁকা, চাহনিটাও বাঁকা।

আগা বেকের চাকর এসে কাজীকে তার প্রভুর মেহমান হবার আমন্ত্রণ জানাল। কাজী রাজি হলেন না তাঁর নিরপেক্ষতার খোলস বজায় রাখার খাতিরে। হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে এক চোখে, ডান চোখে, তিনি তাকালেন তাঁর কেরানির দিকে। একটি কথাও না বলে উঠে দাঁড়াল কেরানি। চলে গেল আগা বেকের বাড়ির উদ্দেশ্যে। ফিরে এল রাতে এবং এবারও কোন কথা না বলে কাজীকে প্রথমে সে দেখাল দুই বুড়ো আঙুল, পরে এক আঙুলের অর্ধেক। এর মানে হল, আড়াই শ'। একটি নিঃশ্বাস ফেলে কাজী এবার ডান চোখ বন্ধ করে বাঁ চোখ খুললেন এবং বাঁ-হাত বাড়ালেন। যথাসময়ে বাঁ-হাতটা মুঠো হয়ে ঢুকে গেল তাঁর লম্বা আলখেল্লার গভীর পকেটে। তারপর তিনি কেরানিকে প্রশ্ন করলেন, 'মামলাটা কিসের?'

'মামলা নয়, সম্পত্তি বদলের ব্যাপার।'

'সম্পত্তি বদল? তার জন্য এত টাকা?'

কেরানি ফিসফিস করে বলল, 'মনে হয় লোকটা দাঁও মারছে, ভাগ্যের লেজ চেপে ধরেছে।'

'দাঁওটা বৈধই হবে আশা করি। ঠিক আছে, কাল শুনব ব্যাপারটা।'

পরদিন আগা বেক সবিস্তারে কাজীকে বোঝাল সে কি করতে চায়। আগা বেকের বক্তব্য শুনে কাজী বুঝলেন যে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। একটা লাভজনক হ্রদ, বাড়ি ও বাগান বিনিময় করা হবে একটা তুচ্ছ সামান্য গাধার সঙ্গে। এখানে নিশ্চয়ই কোন গোপন মতলব রয়েছে। এরকম গোপন মতলব নিয়ে বিনিময় চুক্তি বা দলীল করা বে-আইনী। তা হোক গে গোলমেলে। কাজী আবদুর রহমান ঘাবড়াবার পাত্র নন। তাছাড়া আগা বেকের দেয়া আড়াই শ' টাকা তো তিনি ফেরত দিতে পারেন না। জীবনে অনেক ধোঁকাবাজির দলিল তিনি তৈরি করেছেন। এমন কায়দা করে এ দলিলটা তিনি তৈরি করবেন যাতে তাঁর ওপরওয়ালারা কোন সন্দেহই করতে পারবে না। দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে

কাজী আগা বেককে নির্দেশ দিলেন উপস্থিত সকলের সামনে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে।

আগা বেক দাঁড়িয়ে জোর গলায় ঘোষণা করল যে চৌকিদার উজাক বাই-এর গাধার বিনিময়ে সে উজাক বাইকে তার হ্রদ, বাড়ি ও বাগান লিখে দিচ্ছে।

তার এই ঘোষণা এক প্রকাণ্ড মৌচাকে ঢিল মারার মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল উপস্থিত সকলের মধ্যে। বলে কি লোকটা! পাগল হয়ে গেল নাকি? এত বড় হ্রদ, বাগান, বাড়ি লিখে দিচ্ছে একটা গাধার জন্য! কলগুঞ্জনে মুখর হল চা-খানা, ঝড়ো বাতাসের মত ছড়িয়ে পড়ল কথাটা সারা গাঁয়ে, পথে-ঘাটে, ঘরে ঘরে। আগা বেক হ্রদ দিয়ে দিচ্ছে একটা গাধার বদলে! বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল চোরাকের লোকেরা।

বিস্মত ও হতভম্ব হলেন না শুধু কাজী আবদুর রহমান ও তাঁর কেরানি। কম্বলের উঁচু আসনে বসে কাজী গম্ভীরমুখে লক্ষ্য করতে লাগলেন জনতার প্রতিক্রিয়া, আর তাঁর কেরানি নির্বিকারভাবে নথি বই খুলে বসে রইলেন কলম হাতে নির্দেশের অপেক্ষায়।

গুঞ্জন একটু স্তিমিত হবার পর কাজী আবদুর রহমান চড়া গলায় বললেন, 'বাবাজানের পুত্র উজাক বাই, সামনে এসে দাঁড়াও।'

গাধার লাগাম ধরে হোজা নাসিরুদ্দীন এগিয়ে গেলেন কাজীর সামনে।

'মুরতাজের পুত্র আগা বেকের প্রস্তাব সম্পর্কে তোমার কি বলার আছে? তুমি কি এই বিনিময়ে রাজি আছ?'

'রাজি আছি।'

আবার গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে—শুনছ ভাই, সে রাজি! আরে রাজি তো হবেই! তিরিশ টাকার গাধার বদলে এমন সম্পত্তি পেতে কে রাজি হবে না?

অনেকে সন্দেহ করল যে ভয়ঙ্কর কোন একটা চক্রান্ত বা বদমাইশি এখানে ঘটতে যাচ্ছে। চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা।

কাজী নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন, 'দুই পক্ষই এই বিনিময়ে রাজি। এখন এই গ্রামের কারও যদি এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তিগ্রাহ্য আপত্তি থাকে তবে সে তা বলতে পারে।'

কেউ কোন আপত্তি জানাতে এগিয়ে গেল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কাজী ঘোষণা করলেন, 'আমি এতদ্বারা রায় দিচ্ছি যে চুক্তি সম্পাদনের পথে কোন বাধা বিপত্তি নেই।'

এতক্ষণে কাজী আবদুর রহমান দলিল মুসাবিদায় তাঁর অপূর্ব মুনশীয়ানা দেখাবার সুযোগ পেলেন। কোরানিকে তিনি বললেন, 'ক্রেতা-বিক্রেতা অর্থাৎ বিনিময়কারী দুই পক্ষের নাম লিখে ফেলো। লিখেছ? এবার লেখ—বাড়ি ও বাগান সহ একটা লাভজনক হ্রদ···না, হল না। এভাবে লেখ—একটি জলাশয় সহ বাড়ি

ও বাগান···। এটাই ঠিক হবে, কারণ হ্রদ যে জলাশয় নয় এমন কথা কে বলতে পারবে?'

এটা একটা চমৎকার চালাকি। এই এক কলমের খোঁচায় তিনি সমস্যার অর্ধেক সমাধা করে ফেললেন। শুধু একটি শব্দের হেরফের করায় অর্থাৎ হ্রদকে 'জলাশয়' লেখায় এতবড় হ্রদটি যেন জাদুমন্ত্রে কোন বাড়ির সামনেকার বাগানের লাগোয়া সামান্য পুকুরে পরিণত হল। এতে আগা বেকের সম্পত্তির মূল্য কম বলে মনে হবে ঠিকই, কিন্তু তবুও সমস্যা কিছু রয়ে গেল। একটা গাধার সঙ্গে এর বিনিময় কারও কাছে যুক্তি সঙ্গত মনে হবে না।

এবার কাজী তাঁর আসল ওস্তাদি চাল দিলেন, 'বাবাজানের পুত্র উজাক বাই, তুমি যে গাধাটি বিনিময় করতে চাও ওটাকে কি নামে ডাক?'

'আমি ওটাকে হাঁদারাম বলে ডাকি।'

'হাঁদারাম! এমন মূল্যবান গাধা, যার বিনিময়ে তুমি এত বড় সম্পত্তি পেতে যাচ্ছ তার এই বিশ্রী অশোভন নাম! তাকে আরেকটা ভাল, সম্মানজনক নাম দেয়াই কি উচিত নয়? যেমন ধরো "সোনাধন" না হলেও অন্তত "রূপাধন"?'

হোজা নাসিরুদ্দীন বুঝে ফেললেন কাজীর মতলব। তিনি বললেন, 'আমার কোন আপত্তি নেই এবং আমার মনে হয় গাধারও এতে কিছু যায় আসে না।'

এবার কাজী কেরানিকে বললেন, 'লেখ, মুরতাজের পুত্র আগা বেক তার উপরোক্ত সম্পত্তি, অর্থাৎ বাড়ি এবং জলাশয় সহ বাগান বাবাজানের পুত্র উজাক বাই-এর···এই মিঞা উজাক বাই, তোমার গাধার ওজন কত?'

'এক শ' চল্লিশ কে.জি. তিন শ' গ্রাম···সাদা রুটি খেয়ে ওজন বেড়ে গেছে তো···'

'লেখ, এক শ' চল্লিশ কে. জি. তিন শ' গ্রাম ওজনের "রূপার" বিনিময়ে উজাক বাই-এর নিকট হস্তান্তর করল এবং আমি মোহাম্মদ আবদুর রসুলের পুত্র কাজী আবদুর রহমান প্রচলিত আইন ও শাহী আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক এই বিনিময় দলিলটি সরকারী নথিভূক্ত ও সীল-মোহরাঙ্কিত করলাম।'

বিনিময় হয়ে গেল। হ্রদ এখন হোজা নাসিরুদ্দীনের এবং গাধা আগা বেকের। কাজী দুই পক্ষের হাতে দলিলের দুটি কপি তুলে দিলেন।

বিস্মিত, বিমূঢ় চোরাকবাসীরা চলে গেল যে যার বাড়ি এই অবিশ্বাস্য ঘটনা আলোচনা করতে করতে। কাজীও তৈরি হলেন বিদায়ের জন্য। হোজা নাসিরুদ্দীন কাজীকে জিজ্ঞেস করলেন সহসা তাঁর এদিকে ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে কিনা। কাজী জানালেন যে ভিন গাঁয়ে কাজ সেরে দিন চারেক পরে এ পথেই তিনি ফিরবেন।

সতেরো

ফকিরের ইচ্ছা পূরণ করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন

সেই রাতে হোজা নাসিরুদ্দীন আর আগা বেক দু'জনের কারও ঘুম হল না। মিশরের শাহী দরবারের জমকাল পোশাক পরার জন্য এতই উতলা হয়ে উঠেছিল আগা বেক যে মুহূর্তের দেরিও সহ্য করতে পারছিল না সে। রাতের মধ্যে সে তার জিনিসপত্র জাদুর পাঁচন ভর্তি দুটো সোরাহী, সোনাদানা, হোজা নাসিরুদ্দীনের লেখা মন্ত্রের কাগজ, সব বাঁধাছাদা করে তৈরি হয়ে গেল। ভোর হয়ে উঠতেই সে বলল, 'সময় হয়ে গেছে, উজাক বাই! বিদায়। তোমার জন্য মিশর থেকে আমি সোনার কাজ করা হুক্কা আর শরাবদানি পাঠাব।'

মাথা নিচু করে সেলাম জানিয়ে হোজা বললেন, 'মিশর দেশের মহামান্য ও পরাক্রমশালী উজির আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।'

এরপর পাশের ঘর থেকে অনিচ্ছুক গাধাকে লাগাম ধরে টেনে এনে তিনি পোটলা-পুঁটলিগুলো গাধার পিঠে চাপাতে লাগলেন।

আগা বেক চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে করো কি! করো কি তুমি! শাহজাদার পিঠে বোঝা চাপাচ্ছ! তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে উজাক বাই।' এই বলে সব পোটলা-পুঁটলি নিজের ঘাড়ে তুলে নিল।

অতি কষ্টে হাসি দমন করে হোজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কায়রো পর্যন্ত সারাটা পথ কি আপনি এভাবে যেতে চান?'

'কোকন্দে গিয়ে মাল বহনের জন্য একটা গাধা কিনে নেব। আমি হেঁটে যাব, কারণ শাহজাদা হেঁটে যাবেন। আমি গাধায় চেপে গেলে বেমানান দেখাবে।'

বিদায়কালে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হোজা শেষ উপদেশ দিলেন আগা বেককে, 'ভ্রমণকালে সঙ্গে কিছু আরবী দিনার থাকা ভাল। কোকন্দে গিয়ে কিছু আরবী দিনার জোগাড় করতে পারবেন। কিন্তু সাবধান! ওখানকার মুদ্রা বিনিময়-

কারীরা অনেকেই ঠকবাজ। ওদের পাল্লায় পড়বেন না। বাজারের বাঁ পাশে বড় খালের ধারে রহিম বাই নামে এক মহাজন আছে, ওর দোকানে যাবেন, খাঁটি দিনার পাবেন।'

'আমার অলঙ্কারগুলো রহিম বাই-এর কাছে বিক্রি করতে পারব তো?'

'নিশ্চয়ই। তার চেয়ে ভাল দাম আর কেউ দেবে না।'

'ঠিক আছে, বিদায় উজাক বাই!'

'বিদায় মহামান্য উজির!'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন হোজা আগা বেকের গমন পথের দিকে তাকিয়ে। গাধা যেতে চাচ্ছে না, বারে বারে থেমে ফিরে তাকাচ্ছে মনিবের দিকে। চোখে পানি জমে গেল হোজার। অস্ফুটস্বরে বললেন, 'ওরে আমার প্রিয় সাথী, তুই কি সত্যি ভেবেছিস তোকে আমি আগা বেকের হাতে ছেড়ে দিতে পারি? না, ওরকম ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারি না। আরও বহুদিন আমরা একত্রে কাটাব।'

ঘরে ফিরে হোজা দেখলেন কানা বসে আছে। ওকে কিছু রূপোর টাকা দিয়ে তিনি বললেন, 'যাও, আগা বেককে চোখে চোখে রাখো। কোকন্দে সে দিন সাতেক থাকবে। এই সময়ের মধ্যে আমিও পৌঁছে যাব।'

'এখানে যদি দেরি না করেন।'

'আমার গাধার দিকে খেয়াল রেখ। গাধা হারানর দুঃখ আমি সইতে পরব না।'

'হারাবেন না। আমি আছি কিসের জন্য?'

কানাকেও বিদায় দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

আগা বেক, গাধা ও কানাকে বিদায় দিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁর নতুন বাড়িতে গিয়ে ভাবনায় ডুবে গেলেন। হ্রদ তো উদ্ধার হল। খোজেন্ত-এর বুড়ো ফকিরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। এখন তিনি হ্রদটা নিয়ে কি করবেন? দুই দিন ভেবে শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তিনি। খুশি মনে গিয়ে হাজির হলেন সফরের চা-খানায়। চা-খানা ভর্তি লোক। হ্রদের নতুন মালিককে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম করল তারা। তিনি একে একে সকলের কুশল জানতে চাইলেন। হাসিমুখে খোশগল্প করলেন অনেকক্ষণ।

চা-খানার চালের ফোকরে একজোড়া চড়ুই থাকত। চড়ুইগুলো এত পোষ মেনে গিয়েছিল যে নির্ভয়ে ওরা খদ্দেরদের হাতে, কাঁধে এসে বসত, খদ্দেরদের দেয়া রুটির টুকরো ঠুকরে খেত। হোজা জানতে চাইলেন চড়ুই দুটোর মালিক কে।

সফর বলল, 'মালিক আবার কে? ওরা স্বাধীন। আপন ইচ্ছায় এসেছে, আপন ইচ্ছায় থাকে। তবে সবাই যখন ওদের স্নেহ করে, খাবার দেয়, তখন বলা যায় যে

সবাই ওদের মালিক।'

হোজা নাসিরুদ্দীন খুশি হয়ে বললেন, 'খুব ভাল। ওহে সাইদ, চড়ুই দুটোকে ধরে একটা খাঁচায় ভরে রেখো তো! কাল এসে আমি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ওগুলো কিনে নেব। চড়ুই পাখি আমি খুব পছন্দ করি কিনা!'

সাইদ বলল, 'কিনবেন কেন? আমি এমনিই ধরে দেব। সামান্য চড়ুই, ওগুলোর দাম আছে নাকি?'

'আছে, আছে, ওগুলো মহামূল্যবান চড়ুই। আমি ওদেরকে কিনেই নেব।'

চা-খানার লোকেরা বিস্ময়ে একে অন্যের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল, মুখ ফিরিয়ে হাসল, কেউ কেউ কপালে আঙুল ঠেকিয়ে ইঙ্গিত করল যে লোকটার মাথায় হয়ত ঠিকই কোন গোলমাল আছে।

কাজী আবদুর রহমান তার কথা মত পাশের গাঁয়ে এক বিচারের কাজ শেষ করে ফেরার পথে আবার এসে উঠলেন সফরের চা-খানায়। তাঁর লম্বা পকেটে পাঁচ শ' টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে হোজা নাসিরুদ্দীন তাঁকে আগের মত আরেকটি অদ্ভুত দলিল তৈরি করতে বললেন। এই দলিলে লেখা হল যে বাবাজানের পুত্র উজাক বাই তার খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত হ্রদটি ২০০ গ্রাম ওজনের জোড়া 'হীরার' (চড়ুইকে দেয়া নাম) বদলে চোরাক গ্রামের বাসিন্দাদের নিকট বিক্রি করলেন।

এরপর হোজা নাসিরুদ্দীনের অনুরোধে আরেকটি দলিল লেখা হল। এই দলিল দ্বারা উজাক বাই তাঁর বাড়ি ও বাগানটি সফরের পুত্র সাইদ আর মোহাম্মদ আলীর মেয়ে জুলফিয়াকে বিনামূল্যে তাদের আসন্ন বিয়েতে যৌতুক হিসাবে দান করে দিলেন।

চোরাকের বাসিন্দারা—বিস্মিত বিমূঢ় শেরমত, ইয়ারমত, ইউনুস, রসুল, দাদাবাই, জুরাবাই, বাবাজান, আমিরজানেরা—হাঁ করে এই সব অদ্ভুত কাণ্ড দেখল আর শুনল।

দলিল দুটোতে সীল-মোহর হয়ে যাবার পর হোজা নাসিরুদ্দীন খাঁচার দরজা খুলে চড়ুই দুটোকে ছেড়ে দিলেন।

মনের আনন্দে ওরা কিচির-মিচির করতে করতে উড়ে গিয়ে বসল চা-খানার চালে।

এরপর সাইদকে হ্রদের অভিভাবক নিয়োগ করে তিনি বললেন, 'সাইদ, তোমার ওপর এই হ্রদের তত্ত্বাবধানের ভার রইল। এর পানিতে সকলের সমান অধিকার। দেখবে, পানি দেয়ার সময় যেন কোন পক্ষপাতিত্ব না হয়।'

গ্রামবাসীদের উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'চোরাকবাসী ভাইয়েরা, তোমরা এখন পানি পাবে, ক্ষুধা এবং চিরস্থায়ী ভীতি থেকে মুক্ত থাকবে। মানুষের এটা দরকার, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বার্থপরতার বিষাক্ত মাকড়সা ওঁৎ পেতে রয়েছে। ওটাকে ঝেঁটিয়ে বের করো, ধ্বংস করে দাও, নতুবা

তোমরা কখনও সৃষ্টির সেরা মানুষ নামের উপযুক্ত হতে পারবে না। তোমাদের মুখে যেন স্বার্থপরতার প্রতীক 'আমি' শব্দের পরিবর্তে সবসময় 'আমরা' শব্দই ধ্বনিত হয়। বিদায়, বিদায় আমার প্রিয় বন্ধুরা!'

আবেগে চেঁচিয়ে উঠল চোরাকবাসীরা, 'যাবেন না, যাবেন না আপনি, থাকুন আমাদের মধ্যে। বলুন, আপনি কে।' কেঁদে ফেলল অনেকে হুহু করে। তাদের কৃতজ্ঞতার বুঝি সীমা-পরিসীমা নেই।

মোহাম্মদ আলী, সফর, সাইদ ও জুলফিয়া একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'থাকার উপায় নেই। আমাকে যেতে হবে। তোমরা আমাকে এতদিন উজাক বাই বলে জেনেছ এবং ডেকেছ। ওই নাম আমি দায়ে পড়ে নিয়েছিলাম। ওটা একটা ঘৃণ্য নাম। কোন দিন যদি মনে পড়ে আমাকে, তবে অন্য যে-কোন নামে ডেকো।'

'কিন্তু কি নামে ডাকব, বলুন না?'

'ভেবে দেখো, হয়ত আন্দাজ করতে পারবে।'

শেষ সালাম বিনিময়ের পর কাউকে অনুসরণের সুযোগ না দিয়ে তিনি দ্রুত পায়ে হ্রদের ধার দিয়ে চলে গেলেন। বিস্মিত বিমুগ্ধ চোরাকবাসী অনেকক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে রইল সামনের পাহাড়টার দিকে, যার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তাদের এই অদ্ভুত ও চির-স্মরণীয় মেহমানটি!

এক সময় স্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল সাইদ, 'আমি জানি, আমি জানি, আমি বুঝতে পেরেছি!'

'কি, কি বুঝেছ তুমি?'

'হোজা নাসিরুদ্দীন! ওটাই তাঁর আসল নাম!'

মুহূর্তের মধ্যে সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। আরে, তাই তো! হোজা নাসিরুদ্দীন ছাড়া আর কে হতে পারে? কথাটা আগে কেন মনে হয়নি এটা ভেবে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। অথচ সকলের মনেই এরকম একটা আবছা সন্দেহ জেগেছিল প্রথম থেকেই।

'হোজা নাসিরুদ্দীন! হোজা নাসিরুদ্দীন!' বলে চীৎকার করতে করতে সাইদ ছুটে গেল সামনের দিকে, কিন্তু প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কেউ তাকে জবাব দিল না।

আঠারো

দুই ষাঁড়ের লড়াই

নিরাপদে কোকন্দে পৌছে আগা বেক সিদ্ধান্ত নিল যে সঙ্গে অত টাকাকড়ি নিয়ে একাকী দূর পথে যাত্রা করা উচিত নয়। বুদ্ধিমানের কাজ হল কোন কারাভাঁর সাথে যাওয়া। এই কারণে সে কয়েকদিন দেরি করল কোকন্দে। ফলে সে কোকন্দে থাকতেই হোজা নাসিরুদ্দীন সেখানে এসে পৌছলেন। কানা তাঁকে বলল, 'আর একদিন দেরি করলেই আগা বেককে পেতেন না। আগামী কাল রাতেই সে এক কারাভাঁর সঙ্গে ইস্তাম্বুল রওয়ানা হবে।'

'আগামী কাল তাহলে আমাদের অনেক কাজ। ভাল কথা, আমার প্রিয় গাধাটি কেমন আছে?'

'খুব ভাল, তবে একটু মনমরা। আপনাকে দেখছে না তো?'

'এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এমন ছাড়াছাড়ি! যাকগে, কালই আমরা আবার মিলিত হব। আগা বেক কি এখনও রহিম বাইর সঙ্গে দেখা করেনি?'

'এখনও করেনি। আমি তার ওপর কড়া নজর রেখেছি, তার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করেছি।'

'আল্লাহ স্বয়ং আমাদেরকে সাহায্য করছেন!'

আগা বেক উঠেছে এক অভিজাত চা-খানায়। কানা হোজা নাসিরুদ্দীনকে চা-খানাটি দেখিয়ে দিল। হোজা বললেন, 'সে এখন মনে মনে একজন উজীর, বুঝলে না? অন্য কোন চা-খানা তো তার উপযুক্ত নয়।'

পরদিন সকাল থেকেই হোজা নাসিরুদ্দীন কানা চোরকে নিয়ে আগা বেকের চা-খানার কাছে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন সে বের হয়। আগা বেক তখন নরম গদীওয়ালা আসনে আরামে বসে চা খাচ্ছে। পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। চা-খানার মালিককে বলল, 'তোমার পাওনা বুঝে নাও,

আর আমার লম্বা কানওয়ালা সঙ্গীটাকে বের করে আনো।'

সে এখন গাধার অনুপস্থিতিতেও ওকে 'গাধা' বলতে সাহস করে না বেয়াদবির ভয়ে।

পাওনা মিটিয়ে গাধার লাগাম ধরে গটমট করে রাস্তায় নামল মিশরের হবু, উজীর। গাধাটির চেহারা বিষণ্ন, মুখটা মাটির কাছে নোয়ানো, কান দুটো নেতিয়ে পড়েছে, লেজটা দড়ির মত ঝুলছে।

কানা বলল, 'দেখুন, আপনার অদর্শনে ও কেমন মুষড়ে পড়েছে। ও হল এক প্রকৃত বন্ধু। ওর কাছ থেকে অনেকেই শিক্ষা নিতে পারে।'

জনতার ভীড়ে মিশে হোজা নাসিরুদ্দীন ও কানা আগা বেককে অনুসরণ করলেন। নানা অলি-গলি ঘুরে, আগা বেক চলে গেল রহিম বাই-এর দোকানের সামনে।

হোঁৎকা রহিম বাই বসেছিল তার দোকানে। তখনও তার বউনি হয়নি। বিরক্ত হয়ে সে বার বার হাই তুলছে।

জীবনটা তার তখন মোটামুটি ঝামেলা মুক্ত। সেই সিন্দুক-ঘটনার পরে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তার জীবনে। বিবির মেজাজও শান্ত। আরবী ঘোড়া দুটো কড়া পাহারায় আস্তাবলে রয়েছে এবং পরবর্তী প্রতিযোগিতার জন্য অপেক্ষা করছে। কোতোয়ালের সঙ্গেও মোটামুটি সদ্ভাব আবার গড়ে উঠেছে।

দোকানে ঢুকে দু'পা এগিয়ে সালাম দিয়ে আগা বেক বলল, 'মাফ করবেন, আপনার নামই কি রহিম বাই?'

'হ্যাঁ জনাব, আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। লোকে আমাকে ওই নামেই ডাকে। আপনি কি কোন দরকারে এসেছেন আমার কাছে?'

'একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে আপনার সুনাম শুনেছি। তাই আর কারও কাছে না গিয়ে আপনার কাছেই এলাম।'

'হে মুসাফির, আল্লাহর মেহেরবানিতে ফারগানা ও তার আশপাশের সবাই আমাকে একজন সৎ লোক বলেই জানে এবং আমি তাই থাকতে চাই আজীবন।' জবাব দিল রহিম বাই একগাল হেসে। মনে মনে ভাবল, 'আরেকজন বেকুফ পাওয়া গেছে, ব্যাটাকে ঠকাতে হবে।'

আগা বেক জবাব দিল, 'সুনাম হচ্ছে ধনের চেয়ে ভাল।'

রহিম বাই মাথা নুইয়ে কথাটা মেনে নিয়ে বলল, 'তার চাইতেও ভাল একজন জ্ঞানী ও যোগ্য লোকের দেখা পাওয়া।'

'আপনি সত্য কথাই বলেছেন। ওই রকম একজনের দেখাই আজ আমি পেলাম,' উচ্ছ্বাসভরে জবাব দিল আগা বেক।

রহিম বাই সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'একমাত্র শরীফ খান্দানের মানুষের মুখেই এমন ভাষা শোনা যায়।'

'জ্ঞানী লোকেরা আয়নার মত, যা দেখে তাই প্রতিফলিত করে,' বলল আগা

বেক।

এইভাবে অনেকক্ষণ তারা পরস্পরের পিঠ চাপড়াল ও প্রশংসা করল। তারপর শুরু হল আসল কাজ। আগাবেক একটা থলে থেকে কিছু সোনার মোহর রূপোর টাকা বের করে দিল আরবী দিনারে বদলে দেয়ার জন্য। রহিম বাই বাজার দরের চাইতে শতকরা পাঁচ ভাগ চড়া বাট্টায় দিনার গুণে দিল। আগা বেক টের পেল প্রতারণাটা, কিন্তু রহিম বাইকে সেটা বুঝতে দিল না।

দিনারগুলো থলেতে পুরে কোমরে গুঁজে আরেকটি থলে বের করল সে। থলেটি রহিম বাইকে দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে কিছু জহরত—একটা হার, বাজুবন্দ, মাকড়ি, আংটি রয়েছে। আপনি কিনবেন?'

'চুপ করুন, চুপ করুন,' বলে সামনে ঝুঁকে, ডাইনে-বাঁয়ে চকিতে তাকিয়ে কোথাও কোন প্রহরী আছে কিনা দেখে নিয়ে রহিম বাই বলল, 'মুসাফির, আপনি কি শোনেননি যে কর্তৃপক্ষকে আগে না জানিয়ে এসব জিনিস কেনা-বেচা কোকন্দে নিষিদ্ধ? আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি। আপনি আপনার অলঙ্কার হারাবেন, আর আমি যাব জিন্দানখানায়।'

'শুনেছি, তবে আমি ভাবলাম দু'জন বুঝদার লোক…'

'এবং সৎ লোক…' যোগ করল রহিম বাই।

'সব চেয়ে বড় কথা—হুঁশিয়ার লোক,' বলল আগা বেক।

দু'জন মুখভরা হাসি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর রহিম ধীরে ধীরে থলের মুখ খুলল।

রাস্তার ওপাশে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন ও কানা। তাঁরা দেখলেন যে অলঙ্কারগুলোর ওপর নজর পড়তেই রহিম বাই-এর চোখমুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল, দাড়ি কাঁপতে লাগল, চাপা হঙ্কার দিয়ে বলল সে, 'মুসাফির, বলুন কিভাবে, কোথা থেকে, এবং কখন এ অলঙ্কার আপনার হাতে গেল?'

আগা বেক জবাব দিল, 'মহাজন সাহেব, ওসব প্রশ্ন কর্তৃপক্ষের জন্য ছেড়ে দেন। কোথা থেকে, কেমন করে, কখন, এসব জেনে আপনার লাভ কি? আপনার কাজ হচ্ছে ওগুলো কেনা অথবা না কেনা। কিনতে হলে আমাকে ছয় হাজার টাকা দেবেন।'

'ছয় হাজার টাকা দেব? আপনাকে? চুরি হয়ে যাওয়া আমার নিজের জিনিসের জন্য?'

কথাটা শুনেই হুঁশিয়ার হয়ে গেল আগা বেক। 'ভাবছে কি এই লোকটা? ন্যাকামি করে তার অলঙ্কারগুলো হাতিয়ে নিতে চায় সে?'

খপ করে থলেটা ধরে হেঁচকা টানে ওটা রহিম বাই-এর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেল সে। কিন্তু রহিম বাইও ঘুমিয়ে নেই। শক্ত মুঠিতে সে ধরে রাখল থলেটা। ফলে, বেধে গেল দু'জনের মধ্যে টানাটানি। ঘৃণা ও ক্রোধ মিশ্রিত দৃষ্টির

আগুনে পরস্পরকে দগ্ধ করতে লাগল তারা। দু'জনের গলা থেকে বেরুতে লাগল হিসহিস শব্দ।

'ছেড়ে দাও!' গর্জে উঠল আগা বেক।

'আমার জিনিস ফিরিয়ে দাও!' খেঁকিয়ে উঠল রহিম বাই।

'জোচ্চোর!'

'চোর কাঁহাকা!'

দু'জনের মধ্যে বেধে গেল ষাঁড়ের লড়াই—সংক্ষিপ্ত, তীব্র, নীরব লড়াই। কিন্তু বাইরে থেকে সেটা কারও নজরে পড়বার মত নয়। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে যেন কাঠের বাক্সের দু'দিকে বসা দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে ঝুঁকে কোন গোপন আলাপ করছে।

টানাটানিতে দু'জনেই সমানে সমান প্রমাণিত হল। প্রাণপণ শক্তিতে থলে আঁকড়ে ধরে মুখোমুখি, প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে তারা দাঁড়িয়ে গেল এবার, হাঁফাতে লাগল, দাঁত কড়মড় করতে লাগল।

'ব্যাটা শয়তানের বাচ্চা, বোঁটকাগন্ধী খেঁকশিয়াল, এই বুঝি তোর সততা! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি!'

'বাপের লাশখেকো পাষণ্ড বদমাশ, আমার জিনিস ফিরিয়ে দে।'

মিনিট কয়েক আগে এরা কতভাবেই না পরস্পরের প্রশংসা করছিল, কত মধুর বাক্য বিনিময় করছিল, আর এখন জঘন্যতম ভাষায় একে অপরকে গাল দিচ্ছে। এই পচা সমাজে টাকার থলে মাঝখানে এলে মানুষের মধ্যে এরকমই ঘটে।

দুই চোখ পাগলের মত ঘুরিয়ে রহিম বাই বলল 'মাজার-মসজিদ নাপাককারী শয়তানের চেলা, হারামীর বাচ্চা…'

'চুপ, বেটা বেজন্মা, ব্যভিচারী, লুচ্চা কোথাকার…' গর্জে উঠল আগা বেক।

আচমকা সে এমন জোরে থলেতে টান দিল যে রহিম বাই উপুড় হয়ে পড়ে গেল বাক্সের ওপর। কিন্তু থলে ছাড়ল না রহিম বাই। দুই পা জোড়া করে বাক্সের সঙ্গে ঠেকিয়ে আবার সে থলেটাকে নিজের পেটের তলায় টেনে নেয়ার চেষ্টা করল। আগা বেকের জোর একটু করে কমতে লাগল

রাস্তার ওপাশে কানা বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন, রহিম বাই থুথু দিল আগা বেকের চোখে।…আগা বেক কামড়ে ধরেছে রহিম বাই-এর দাড়ি…ওই দেখুন… এক গোছা উপড়ে ফেলেছে…দেখুন…রহিম বাই আগা বেকের নাক কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে…পারল না…পারল না নাকটা কামড়াতে।'

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল কানা চোর, হোজা নাসিরুদ্দীনকে বলল, 'আমাদের সময় হয়ে গেছে হুজুর, দেরি করছেন কেন আর?'

হোজা বললেন, 'দাঁড়াও, ওরা আরও কিছুক্ষণ লড়াই করুক।'

লড়াই ইতিমধ্যে আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। বেশি অপেক্ষা করা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বাজারের প্রহরীরা যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে হয়ত। হোজা

নাসিরুদ্দীন আস্তে করে একটা শিস দিলেন। গাধাটা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে নির্বিকার-ভাবে দেখছিল আগা বেক আর রহিম বাই-এর তুমুল লড়াই। হোজা নাসিরুদ্দীনের শিস শুনে চমকে মাথা উঁচু করল গাধা। এই শিস তার কাছে বন্ধুর আহ্বান, প্রভুর আদেশ, পীরের নির্দেশ। আবার শোনা গেল সেই শিস! এবার আর কোন সন্দেহ নেই, নেই কোন দ্বিধার অবকাশ। তার প্রভু তাকে ডাকছেন! লেজ তুলে, কান উঁচিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল গাধা, তারপর কানফাটা এক ডাক ছেড়ে সে ছুট দিল শিসটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে।

সেই মুহূর্তে আগা বেক হাঁপাতে হাঁপাতে চেষ্টা করছিল থলেটাকে রহিম বাই-এর পেটের নিচে থেকে টেনে বের করতে। এমন সময় তার বাঁ হাতে ধরা গাধার লাগামে হঠাৎ টান পড়ল। সে ভাবল তার 'শাহজাদা' স্বয়ং তাকে সাহায্য করছেন! গাধার টানের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও দিল থলেতে টান। দু'জনের মিলিত টান ঠেকাতে পারল না রহিম বাই। টানের চোটে থলে সুদ্ধ সে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে রহিম বাই চেঁচিয়ে উঠল, 'ডাকাত···বাঁচাও···বাঁচাও···'

আগা এবার পড়ল মুশকিলে। তাকে রহিম বাই টানছে পেছনের দিকে, গাধা টানছে সামনের দিকে। গাধার পাশব শক্তির জোর রহিম বাই-এর চাইতে অনেক বেশি। ফলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল রাস্তায়। আগে রয়েছে একটা গাধা। মাথা নিচু করে পেছনের দু'পায়ে শূন্যে লাথি ছুঁড়ে প্রাণপণে ছুটছে। গাধার পেছনে আগা বেক, ক্রুশে বিদ্ধ মানুষের মত দুই হাত দুদিকে ছড়ানো। এক হাতে সে ধরে রেখেছে গাধার শক্ত লম্বা লাগাম, আর অন্য হাতে অলঙ্কারের থলে। সবার পেছনে রয়েছে হোঁৎকা রহিম—দুই হাতে আঁকড়ে রেখেছে থলেটা। গাধার প্রচণ্ড টানে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে আগা বেক একই ভঙ্গিতে, সঙ্গে সঙ্গে রহিম বাই-এর দেহের অর্ধেক গড়িয়ে চলেছে রাস্তার ধুলোর ওপর দিয়ে—বাকি অর্ধেক অর্থাৎ মাথা থেকে কোমর তক রয়েছে শূন্যে।

হোজা নাসিরুদ্দীন দেখলেন গাধাকে উদ্ধারের জন্য সাহায্য দরকার। দু'জন মানুষকে সে কতক্ষণ টানবে? তিনি আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই যেন একেবারে খেপে গেল গাধা। চীৎকার করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এমন জোরে সে ছুট দিল সামনের দিকে যে সেই টানে লাগামের দড়িটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। রহিম বাই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে, আগা বেক পড়ল তার ওপর। দু'জনে গড়াগড়ি খেতে লাগল কুমড়োর মত

ইতিমধ্যে ঢাল-তলোয়ার, বর্শা, কুঠারের ঝনঝনা ও শোরগোল তুলে প্রহরীরা ছুটে এল চারদিক থেকে।

'শাহজাদাকে' হারাবার ভয়ে আগা বেক থলে ছেড়ে দৌড়াতে লাগল গাধার পিছে, কিন্তু প্রহরীরা তাকে ধরে ফেলল।

'ছেড়ে দে আমাকে!' চীৎকার করে উঠল আগা বেক। 'ছেড়ে দে, নীচ

বদমাশের দল। জানিস, আমি কে? আমি মিশরের উজীর। শুনছিস, কুত্তার বাচ্চারা! তোদেরকে আমি পিষে ধুলোয় মিলিয়ে দেব!'

রহিম বাই চেঁচাতে লাগল, 'ব্যাটা চোর, চোর, আমি প্রমাণ করে দেব। মাননীয় কামিল বেক এই অলঙ্কারগুলো দেখেছেন, তিনি এগুলো চেনেন।'

আগা বেক দেখল যে তার 'শাহজাদা' এবং সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় গৌরব দুই-ই হারিয়ে যাচ্ছে। হিংস্র চিতা বাঘের মত দাঁত বের করে গর্জে উঠল সে, 'আমাকে ছেড়ে দে বলছি, ভাগ আমার সামনে থেকে। নইলে, এই মুহূর্তে তোদের সবাইকে আমি গাধা বানিয়ে ফেলব!'

আরেকজন প্রহরী লাফিয়ে তার পিঠে চড়ে ঘাড়টা চেপে ধরল। রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আগা বেক তার কোমরবন্ধে ঝোলানো যাদুর পাঁচন ভরা ছোট্ট লাউয়ের খোলটি বের করে কিছুটা পাঁচন ছিটিয়ে দিল প্রহরীদের গায়ে, তারপর ভীষণ চীৎকার করে আওড়াতে লাগল, 'লিমসিজু! পুৎজুগু, জোমনিহোজ, কালামাই, শিমোজা···!'

প্রহরীরা পাল্টা চেঁচাল, 'মাটিতে ফেলে চেপে ধর্, বেঁধে ফেল্ হারামজাদাকে, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চল্ ব্যাটাকে।'

দেখা গেল যে আগা বেকের মন্ত্রের চেয়ে প্রহরীদের মন্ত্রই বেশি কার্যকর। তার বাঁধা হাত-পায়ের মাঝখানে একটা ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দিয়ে তারা ওকে শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। বৃথাই আগা বেক চেঁচামেচি করল, অভিশাপ দিল, কেউ সেসবে কান দিল না। শিকার করা পশুর মত ঝুলিয়ে আগা বেককে—মিশরের হবু উজীরকে, প্রহরীরা নিয়ে চলল কামিল বেকের দফতরের দিকে। তাদের পেছনে গেল কৌতূহলী জনতার বিরাট এক মিছিল। রহিম বাই-এর দোকানের সামনেটা জনশূন্য হয়ে গেল।

হোজা নাসিরুদ্দীন গাধাটা চোরের হাতে দিয়ে বললেন, 'ওকে সাবধানে কোথাও লুকিয়ে রাখো। তারপর বিধবাটিকে খুঁজে বের করে বিচারের জায়গায় আসো।'

উনিশ

কামিল বেকের বিচার

কামিল বেকের দফতরের সামনে খোলা মাঠটি লোকে লোকারণ্য! উঁচু মঞ্চের ওপর রেশমী চাঁদোয়ার নিচে বিচারকের আসনে বসে আছেন কামিল বেক। গায়ে কিংখাবের দামী পিরান, বুকে নতুন এক সারি ঝকঝকে মেডেল, কোমরে সোনার বাঁটওয়ালা তলোয়ার (সিন্দুক দুর্ঘটনার পর এসব তিনি নতুন বানিয়ে নিয়েছেন)। বাতাসে ভেসে আসছে ঘাম আর রসুনের কটু গন্ধ। বিরক্তিতে বারে বারে নাক কুঁচকাচ্ছেন কামিল বেক। আসামী আগা বেককে বসানো হয়েছে মঞ্চের সামনে একটা গোলাকার গর্তের মধ্যে। বাইরে থেকে কেবল তার নেড়া মাথাটাই দেখা যাচ্ছে। পাগড়িটা খসে পড়েছে কোথায় কে জানে। তার কাছাকাছি একজন প্রহরী কাঠের লম্বা হাতলযুক্ত হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়ানো। হাতুড়ির মাথাটা নেকড়া জড়িয়ে নরম করা হয়েছে যাতে ঠোক্কর দিলেই আসামীর ঘিলু বেরিয়ে না যায়। বিচারকের মঞ্চ আর আসামীর মাঝখানে বসেছে খাতাপত্র নিয়ে কেরানিরা বিচারকার্যের বিবরণ নথিভুক্ত করার জন্য। মঞ্চের সিঁড়ির কাছে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে রহিম বাই একজন বিশেষ রক্ষীর পাহারায়। অন্য প্রহরী আর ঘোড়সওয়ার রক্ষীরা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে মঞ্চটাকে যাতে জনতা সেদিকে ভিড় করতে না পারে। যে-সব অতি উৎসাহী দর্শক কাছে ঘেঁষতে চাচ্ছে তাদের ঘাড়ে পড়ছে প্রহরীদের চাবুক।

হোজা নাসিরুদ্দীন অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে সামনে এগুতেই মাথার ওপর উদ্যত চাবুক দেখে পিছু হটলেন। তারপর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দূরত্বে এক বিশালদেহী লোকের পেছনে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে নিজেকে কামিল বেকের দৃষ্টির আড়ালে রেখে সব কিছু দেখা ও শোনা যায়।

কামিল বেক বললেন, 'মুরতাজের পুত্র আগা বেক বলে পরিচয় দানকারী আসামী, তুমি দাবি করছ এই অলঙ্কারগুলো তুমি সেচের পানির দাম হিসেবে

চোরাক গ্রামের চাষী মোহাম্মদ আলীর কাছ থেকে পেয়েছ। এখন ব্যাখ্যা করে বলো, মোহাম্মদ আলী কোথা থেকে এবং কিভাবে ওগুলোর মালিক হয়েছিল! এবং টাকাকড়ির বদলে অলঙ্কার দিয়েই বা সে কেন পানির মূল্য পরিশোধ করল?'

'সে গরীব, অত নগদ টাকাকড়ি কোথায় পাবে?' বিড়বিড় করে জবাব দিল আগা বেক।

'গরীব?' নাক সিটকালেন কামিল বেক। 'গরীব, তবু গোটা গ্রামবাসী সকলের হয়ে একাই পানির দাম দেয়? গরীব হয়েও সে টাকাকড়ির বদলে সোনাদানা মণিরত্ন দিয়ে সেচের পানি কেনে? ওহে কেরানিরা, এই নির্লজ্জ মিথ্যাটা লিখে নাও, এটা আসামীর বিরুদ্ধে একটা বাড়তি প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে!'

'এটা মিথ্যা নয়, মহামান্য প্রভু!' বলতে বলতে আগা বেক স্থান-কাল ভুলে মাথা উঁচু করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় ঠকাস করে পড়ল প্রহরীর হাতুড়ির ঘা। মুখে ফেনা তুলে, চোখ উল্টে, জিভ বের করে একদিকে নেতিয়ে পড়ল সে।

কিছুক্ষণ পরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে আবার বলল, 'এটা মিথ্যা নয়! মোহাম্মদ আলী সত্যি গরীব, কপর্দকহীন। বাগানে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তার আপেল গাছের শেকড়ের নিচে সে অলঙ্কারগুলো পেয়ে যায়।'

'চুপ, বদমাশ মিথ্যুক!' গোঁফ কাঁপিয়ে গর্জে উঠলেন কামিল বেক। 'তোমার কথার একবর্ণও সত্য নয়। আপেল গাছের শেকড়ের নিচে পেয়ে গেছে, না? তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও যে সোনা আর চুনিপান্না ব্যাঙের ছাতার মত মাটিতে জন্মায়?'

'হে মহাজ্ঞানী বিচারক, হে ন্যায়বিচারের মহাজ্যোতি, আমি কোরানের নামে শপথ করতে পারি।'

'কোরানের নামে শপথ! কি আস্পর্ধা! এই মিথ্যাটাও লিখে রাখো কেরানিরা।'

কেরানিরা লিখল। কামিল বেক পরবর্তী প্রশ্নে গেলেন

'তোমার আগের কথায় বোঝা গেল তুমি একটি লাভজনক হ্রদের মালিক ছিলে। তাহলে কিসের জন্য ওটা ছেড়ে মিশর যেতে চাও? তোমার হ্রদের কি হল?'

'আমি ওটা বিনিময় করে দিয়েছি।'

'বিনিময় করেছ? কিসের এবং কার সঙ্গে?'

'আমি মিশরের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী···মানে,··· একটা গাধা··· মানে, যিনি আসলে একজন শাহজাদা···অর্থাৎ গাধারূপী একজন শাহজাদার বিনিময়ে হ্রদটা ছেড়ে দিয়েছি।'

'কি বললে?' লাফিয়ে উঠলেন কামিল বেক, 'আবার বলো, না, আবার ও কথা মুখে উচ্চারণ কোরো না। আমার সামনে শাহী বংশের একজন লোককে একটি ঘৃণ্য চারপেয়ে জীবের সঙ্গে যুক্ত করার সাহস তোমার কি করে হল?'

আগা বেক উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'এতক্ষণে মনে পড়েছে কথাগুলো—একজন

লম্বকর্ণ, চর্মাবৃত, চতুষ্পদ শাহজাদা।'

কামিল বেক গর্জন করে বললেন, 'এটা হচ্ছে একটি নতুন অপরাধ! সে কর্তৃপক্ষের সামনে একজন শাহী বংশের মানুষকে অপমান করল। কেরানিরা, লিখে রাখো উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে।'

'আমি কোন অপমান করিনি! "শাহজাদাকে" তাঁর মানুষের রূপ ফিরিয়ে দেয়ার পুরস্কার হিসাবে উজীরের পদ এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আমি মিশর যাচ্ছিলাম।'

'চুপ! মিথ্যা কুৎসা রটনাকারী, চুপ করে থাকো। এ রকম জঘন্য ও পোড় খাওয়া অপরাধী আমি অনেক দিন দেখিনি। তার দীর্ঘ অপরাধ তালিকায় সে আরেকটি অপরাধ যোগ করেছে—উজীরের উচ্চ পদমর্যাদার ওপর মিথ্যা দাবি জানিয়েছে। লিখে নাও কেরানিরা, প্রথম অপরাধ—চুরি, দ্বিতীয় অপরাধ—অশোভন আচরণ ও বাজারের মধ্যে মারামারি, তৃতীয় অপরাধ—শাহী পুরুষদের নামে মিথ্যা অপবাধ রটনা, চতুর্থ—উজীর পদমর্যাদার ওপর মিথ্যা দাবি পেশ…'

কেরানিরা খসখস করে লিখে চলল। আগা বেকের সকল অনুরোধ, আবেদন-নিবেদন, কাকুতি-মিনতি ব্যর্থ হল। কামিল বেক তার কোন কথাই কানে নিলেন না।

আতঙ্কিত, অসহায়, ক্লান্ত আগা বেক নীরব হয়ে গেল। এখানে এসে ভূতপূর্ব নগর প্রশাসক শেষ পর্যন্ত নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পারল একটা খাঁটি সত্যও কিভাবে একজন বিচারকের দৃষ্টিতে কু-উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যারূপে প্রতিভাত হতে পারে।

বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল। প্রহরীরা তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল জিন্দানখানায়।

আদালতের কাজ চলতে লাগল। রহিম বাই তার অলঙ্কার ফেরত পাওয়ার দাবি করল।

কামিল বেক ঠিক করলেন অলঙ্কারগুলো যদিও সহজে বাজেয়াফত করা যায় তবুও তিনি রহিম বাইকে, অর্থাৎ রহিম বাই-এর মারফতে আরজু বিবিকে ওগুলো উপহার হিসেবে দেবেন। আরজু বিবির কাছে তিনি দোষী হয়ে আছেন। অলঙ্কার ফেরত পেলে বেচারী কিছুটা শান্ত হবে।

গম্ভীর স্বরে তিনি কেরানিদের বললেন, 'লেখো, উপরে বর্ণিত মূল্যবান অলঙ্কার-গুলো মুদ্রা ব্যবসায়ী, কাদিরের পুত্র রহিম বাইয়ের বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায়…'

এমন সময় জনতার মধ্য থেকে এক চীৎকার শোনা গেল, 'ইনসাফ চাই, ন্যায় বিচার চাই!'

প্রহরীরা চাবুক তুলে ছুটে গেল জনতার দিকে। বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে কামিল বেক তাকিয়ে রইলেন। হাতের ইঙ্গিতে তিনি থামালেন প্রহরীদের। তারপর চেঁচিয়ে

বললেন, 'কার কি বক্তব্য আছে সামনে এসে বলুক।'

জনতার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে হোজা নাসিরুদ্দীন দাঁড়ালেন কামিল বেকের সামনে।

বিস্মিত কামিল বেক বলে উঠলেন, 'এ কি তুমি, জ্যোতিষী? কোথায় ছিলে এতদিন? আমরা তোমাকে সারা শহরময় কত খুঁজেছি!'

তিনি বলতে পারতেন, 'তোমার গর্দান নেবার জন্য খুঁজেছি।' কারণ ওরকমই মতলব ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি তা বললেন না।

তবে তাঁর গোপন ইঙ্গিত পেয়ে প্রহরীরা পেছন দিক থেকে হোজা নাসিরুদ্দীনের দিকে এগিয়ে গেল।

হোজা নাসিরুদ্দীন এসব লক্ষ্য করেও স্থির রইলেন, কারণ কোতোয়ালের কুমতলব ঠেকাবার মত শক্ত রক্ষা-কবচ তাঁর হাতে আছে। রহিম বাই-এর উদ্দেশ্যে হোজা বললেন, 'আপনাকে সালাম জানাচ্ছি রহিম বাই সাহেব, আল্লাহ আপনার শ্রীবৃদ্ধি করুন।'

রহিম বাই জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। দশ হাজার টাকা গচ্চা দেয়ার দুঃখ সে তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

'তুমি ছিলে কোথায়?' আবার প্রশ্ন করলেন কামিল বেক।

'হে মহামান্য প্রভু, আমি একটা কাজে শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। এইমাত্র ফিরে এসেছি এবং ঠিক সময় মত। ন্যায় বিচারের সুবিধার্থে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী দিতে চাই।'

'সাক্ষী দিতে চাও? কি ধরনের সাক্ষী?'

'অলঙ্কারগুলো সম্পর্কে এবং সেগুলোর প্রকৃত মালিক সম্পর্কে।'

রহিম বাইকে দেখিয়ে কামিল বেক বললেন, 'মালিক আমাদের চেনা, ওই ওখানে দাঁড়ানো।'

'সেখানেই রয়ে গেছে গলদ। আমি নিশ্চিত জানি যে মান্যবর রহিম বাই ওই অলঙ্কারগুলোর বৈধ মালিক নন। ওগুলো আরেকজনের।' জবাব দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

ক্ষিপ্ত রহিম বাই চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা কেমন কথা হল? তুমি কি বলতে চাও আমি মালিক নই? তাহলে মালিক কে? তুমি?'

'আমিও নই, আপনিও নন—একজন তৃতীয় ব্যক্তি।'

'এখানে তৃতীয় ব্যক্তি আবার কে হতে পারে? এসব ভবঘুরে বাউণ্ডুলে লোকদের কেন আদালতে আসতে দেয়া হয়েছে?' চীৎকার করে জানতে চাইল রহিম বাই।

হাত তুলে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিয়ে কোতোয়াল কামিল বেক বললেন, 'জ্যোতিষী, তোমার ধাঁধা এখানে বেমানান। তুমি কি বলতে চাও? আমি ওই অলঙ্কারের মালিককে ভাল করেই জানি, কারণ আজ থেকে কিছুদিন আগে

আমার পরিচিত মানুষের দেহে ওই অলঙ্কারগুলো দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল…'

হোজা নাসিরুদ্দীন জবাব দিলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন! কিন্তু তার আগে, আজ হতে অনেকদিন আগে, আমার মহামান্য প্রভু ওগুলো তাঁর পরিচিত—তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত জনের দেহে স্বচক্ষে দেখারও আগে, রহিম বাই অলঙ্কারগুলোর মালিক ছিল না। তখন ওগুলোর মালিক ছিল আরেকজন—যার কাছ থেকে রহিম বাই ওগুলো বেআইনীভাবে এবং বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে!'

চীৎকার করে প্রতিবাদ করল রহিম বাই, 'মিথ্যা কথা! জঘন্য মিথ্যা কথা!'

একটুও না দমে হোজা নাসিরুদ্দীন বলে গেলেন, 'সেই তৃতীয় ব্যক্তি এখানে হাজির আছে। বিধবা! মঞ্চের সামনে এগিয়ে এসো, দাঁড়াও মহান বিচারকের সামনে।'

জনতার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বিধবাটি দাঁড়াল হোজা নাসিরুদ্দীনের পাশে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন কামিল বেক। জ্যোতিষীর হঠাৎ আবির্ভাব, তার সাক্ষ্য, ওই বিধবা, এই সবকিছুই তাঁর কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত।

এদিকে জনতার মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, সেটা এখনি স্তিমিত করা দরকার। হোজাকে লক্ষ্য করে তিনি ধমক দিলেন, 'জ্যোতিষী, তোমার কথার মধ্যে কুৎসার কালিমা লেপে ব্যবসায়ী রহিম বাই-এর সুনাম নষ্ট করার মতলব ছাড়া আর কিছুই আমি দেখছি না। তুমি কি করে আসল সত্য জানলে? তোমার কথার প্রমাণ কই? তোমার কথা আমি কেন বিশ্বাস করব? এই মেয়ে লোকটিই বা কোত্থেকে এসেছে?'

নিচে থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রহিম বাই, 'এটা মিথ্যা, বানোয়াট! জনসাধারণের শান্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে এই বানোয়াট কাহিনীটা তৈরি করা হয়েছে।'

কেরানিদের প্রতি এবং প্রহরীদের প্রতি ইশারা করলেন কামিল বেক। কেরানিরা লেখার জন্য তৈরি হল, প্রহরীরা নিজ নিজ পিরানের ভেতর থেকে দড়ি বের করে হোজা নাসিরুদ্দীনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

কামিল বেক রায় দিতে লাগলেন, 'জ্যোতিষীর বক্তব্যের কু-উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে…'

'আমার কথার প্রমাণ চান? আমি কেমন করে এসব জেনেছি তা বলতে হবে?' এক পা সামনে এগিয়ে উচ্চ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন হোজা নাসিরুদ্দীন। তারপর বললেন, 'আমার গণনার মাধ্যমে আমি এসব জেনেছি! আমার গণনা কেমন নির্ভুল তার প্রমাণ মহামান্য বিচারক নিজে এবং মান্যবর ব্যবসায়ী সাহেব ইতিপূর্বেই পেয়েছেন। আমার যাদুর কেতাব এখন সঙ্গে নেই, তবে ওটা ছাড়াও আমার চলে।'

কোতোয়ালকে ভাববার সময় না দিয়ে ভ্রূ কাঁপিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস

টেনে তীক্ষ্ণ খ্যানখ্যানে আওয়াজে চীৎকার করে উঠলেন তিনি, 'ওই, ওই দেখছি আমি, একটা সিন্দুক! সিন্দুকের ভেতর দু'জন মানুষ বসে আছে! এ কি? আমার চোখ কি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে? হে মহামান্য ক্ষমতাশালী পুরুষ, এ কি দুরবস্থা আপনার? কোথায় আপনার জমকালো পিরান, মেডেল, তলোয়ার? সিন্দুকের ভেতরে আপনি বসে আছেন কার সঙ্গে···?'

কোতোয়াল হাঁ করে রইলেন, মুখটা তাঁর মৃতের মুখের মত রক্তহীন হয়ে গেল। সেই প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও হাত-পা-শরীর তাঁর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরেকটা মুহূর্ত দেরি হলে, আর দু'চারটা শব্দ উচ্চারিত হলেই তাঁর সর্বনাশ হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য। এই অভিশপ্ত জ্যোতিষীর মুখ বন্ধ করতে হবে এবং তা করতে হবে মুহূর্তের মধ্যে, যে-কোন মূল্যে!'

ঘটনাক্রমে জ্যোতিষী নিজেই নীরব হয়ে সামনে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই সুযোগ হারালেন না কোতোয়াল। হঠাৎ হেসে হৃদ্যতার সুরে তিনি বললেন, 'আরে জ্যোতিষী, তুমি প্রথমেই বললে না কেন যে গণনা করে অলৌকিক দৃষ্টি দ্বারা অলঙ্কারগুলোর ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য জেনেছ? তোমার প্রথমেই তা বলা উচিত ছিল। তাহলে এতসব কথাবার্তার দরকার হত না। তোমার গণনার নির্ভুলতা সম্পর্কে সবাই জানে। ওতে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'আমার আরও প্রমাণ আছে। মহামান্য প্রভু দয়া করে জনতার বাঁ দিকটায় একটু তাকান।'

হোজা নাসিরুদ্দীনের কথামত বাঁ দিকে তাকিয়েই ভয়ে পাথর হয়ে গেলেন কামিল বেক। হায় আল্লাহ! সেখানে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে একটা জ্বলজ্বলে হলদে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে এবং মিটিমিটি হাসছে গোরস্থানের কবরের পাশের ঝোপের মধ্যে দেখা সেই ভয়ঙ্কর বিদ্‌ঘুটে লোকটি! পিরানের নিচে থেকে তাঁর নিজের তলোয়ারের সোনার হাতলটি সে বের করে তাঁকে দেখাচ্ছে!

কামিল বেকের দম প্রায় বন্ধ হবার অবস্থা। মুখটা সাদা হয়ে গেছে। চোখ আটকে রয়েছে কানা চোরের শয়তানি হাসি আর তলোয়ারের বাঁটের ওপর।

হোজা নাসিরুদ্দীনের কথায় তাঁর সংবিৎ ফিরে এল। 'হে মাননীয় প্রভু, প্রয়োজন হলে আরও প্রমাণ দিতে পারি।'

'না, এগুলোই যথেষ্ট! মামলা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি এখনি রায় দিচ্ছি।'

'কেরানিরা, এই অলঙ্কারগুলোর বিষয়ে এতক্ষণ যা লিখেছ সব কেটে দাও না, ওই পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লেখো, মূল্যবান অলঙ্কারগুলো বিধবা···

'সাদত,' কথা যুগিয়ে দিলেন হোজা নাসিরুদ্দীন।

'···বিধবা সাদতের বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় আইন ও ন্যায়ের বিধান অনুযায়ী সেগুলো তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে···'

সেই মুহূর্তে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ব্যবসায়ী রহিম বাই, 'এর মানে কি হল'

অলঙ্কারগুলো আমার, কোন বিধবা-টিধবার নয়! এটা কোন্ ধরনের আদালত? কোথায় সেসব অকাট্য প্রমাণ? আমি তো একটা প্রমাণও দেখছি না।' এবার জনতার দিকে ফিরে সে বলল, 'ভাইসব! দেখছ তোমরা? তোমাদের চোখের সামনে একজন সৎ লোককে ঠকানো হচ্ছে। তোমরা সাক্ষী থেকো!'

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন কামিল বেক, 'ব্যবসায়ী রহিম বাই, চুপ করুন! আপনি কর্তৃপক্ষের সামনে আইন ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনতাকে উস্কানি দিচ্ছেন।'

জনতার মধ্যে তীব্র গুঞ্জন উঠল। তার সাথে তাল মিলিয়ে রহিম বাই চেঁচাতে লাগল, 'আমি চুপ করব না, আমি মহান খানের কাছে বিচার চাইব।'

এরপরেই কপালে চাঁদির ওপর হাতুড়ির ঠোকা খেয়ে জবান বন্ধ হল তার, চোখ দুটো গোল ও স্থির হয়ে গেল, জিহ্বা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। সে টলতে লাগল সামনে পেছনে। প্রহরীরা তাকে টেনে নিয়ে চলল।

শান্তি ফিরে এলে কোতোয়াল রায় দান শেষ করে অলঙ্কারগুলো নিজ হাতে তুলে দিলেন বিধবার হাতে।

রহিম বাইকে তার বাড়ির সামনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রেখে প্রহরীরা চলে গেল। জ্ঞান ফিরে আসতেই সে দেখল যে তার কোমরে ঝোলানো থলেটা নেই। ওটা পড়ে আছে কিছু দূরে। ভেতরে বালি ঠাসা। পাগলের মত বিলাপ করতে লাগল রহিম বাই, 'আমার মোহর! আমার দিনার, আমার টাকা···।'

বিশ

ঘরে ফিরল গুলজানের বোকা মানুষটি

এবার ঘরে ফেরার পালা। খুব ভোরে হোজা নাসিরুদ্দীন কানাকে নিয়ে ছাড়লেন ব্যস্ত ও কোলাহলময় নগরী কোকন্দ। শহরের বাইরে এসে হোজা নাসিরুদ্দীন গাধার পিঠ থেকে নেমে তাঁর সফরসাথী কানা চোরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

'এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি পরস্পরের কাছ থেকে। আমি দোয়া করছি, বাবা তোরা খানের দোয়ায় তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখী হোক, সুন্দর হোক।'

অশ্রুভরা চোখে কাঁপা গলায় কানা জানতে চাইল, 'আবার কবে আপনাদের দু'জনের দেখা পাব?'

'আমি জানি না। তবে মনে রেখো, দুনিয়াটা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তোমার জন্য খোলা, উন্মুক্ত। আমার জন্যও। হয়ত আবার আমাদের দেখা হবে। প্রত্যেক বিদায়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নতুন সাক্ষাতের বীজ।'

গুলজান বিবি যেদিন ফিরলেন তার আগের রাতে হোজা নাসিরুদ্দীন বাড়ি পৌছলেন। ক্লান্ত দেহে সরাসরি ছাদে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে জেগে উঠেই তিনি দেখলেন যে রাতে বাগানের গেট বন্ধ না করায় গাধা গাছ-পালা ফল সব খেয়ে তছনছ করে ফেলেছে। রেগে আগুন হয়ে তিনি বললেন গাধাকে, 'করেছিস কি হতভাগা নানরুটি খোর রাক্ষস! তুই কি ঠিক করেছিস যে এবার থেকে আপেল আঙ্গুর খাবি?'

গোটা সকাল বেলাটা তাঁর কাটল বাগানের ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন লুকানর কাজে। তারপর গেলেন কাঁসার হাঁড়ি মেরামত ও কসাই-এর দেনা শোধ করতে। তারপর লেগে গেলেন আঙ্গুর ঝাড়ের নিচেকার মাটি আলগা করতে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিতে—বাগানের ভাঙা দেয়াল মেরামতের কাজে হাত দেয়ার সময় তিনি পেলেন না। ঘটর ঘটর ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল গেটে। সাতটা তরুণ-তাজা কণ্ঠের মিলিত ঐকতান মধুবর্ষণ করল তাঁর কানে। এই ঐকতানের সঙ্গে মিলিত হল গুলজানের কাংস্য বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, 'সালাম, আমার পিয়ারা স্বামী। আমাকে ছাড়া সময় তোমার কেমন কাটল?'

'ভাল, আমি তোমাদের পথ চেয়ে দিন কাটিয়েছি,' জবাব দিলেন হোজা।

গাড়ি থেকে নামতেই গুলজানের প্রথম নজর পড়ল বাগানের দেয়ালের ভাঙা জায়গাটার ওপর।

'দেয়ালের কি হল?' বিব্রতভাবে চোখ নামিয়ে হোজা আমতা আমতা করে বললেন, 'কেন জানি না, একদম সময় পাইনি। এটা, ওটা, নানান কাজে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে...'

'কাণ্ড দেখো এই মানুষটার! তিন তিনটা মাস গেল, লোকটা দেয়ালের এই সামান্য ভাঙা জায়গাটুকু মেরামতের সময় পায়নি! হায় আমার কপাল!...'

ঃ শেষ ঃ

হোজা নাসিরুদ্দীন

এক দুঃসাহসিক অভিযানের রসঘন কাহিনী

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

যাদের হৃদয় আছে অনুভবের, কান আছে শোনার,
আর আছে দেখার মত চোখ, তাদের জন্যই এ কাহিনী।

অনেক অদ্ভুত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মানুষ ছিলেন
হোজা নাসিরুদ্দীন। তাঁকে ঘিরে জগৎ জুড়ে অসংখ্য
গল্প কৌতুক উপকথা আর কিংবদন্তী।

ঐ নামে সত্যি কেউ ছিলেন কিনা আজ আর জবাব
মিলবে না সে প্রশ্নের। তবে মধ্য এশিয়া ও
আরবের নিপীড়িত গণমানুষের হৃদয় জুড়ে
তাদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, ক্রোধ ও বেদনার প্রতীক
হয়ে তিনি যে বেঁচে থাকবেন আরও বহুকাল
তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পোষা দরবারী বিদুষক বা ভাঁড় ছিলেন না তিনি
স্বৈরাচার, দুঃশাসন, ধর্মীয় বুজরুকি, সামাজিক গোঁড়ামি
আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঝলসে উঠেছিলেন
তিনি নাঙ্গা তলোয়ারের মত।
তাঁর প্রতিটি ব্যঙ্গ ছিল তারই তীক্ষ্ণ ফলক!

সবা
প্রকাশনা